প্রেমের গল্প

প্রতিভা বসু

গ্রন্থম্
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৬

প্রকাশক
প্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

একমাত্র পরিবেশক
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ
১২।১, লিণ্ড্সে স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মুদ্রক
শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ
বিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক ও মুদ্রণ
রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট

দাম: চার টাকা

মুক্তি

মেয়ের উপযুক্ত পাত্র সন্ধান ক'রে ক'রে অনাদিবাবুর স্ত্রী প্রায় পাগল হ'য়ে উঠেছিলেন। এতদিনে তার অবসান হ'লো। মেয়ে তাঁর সুন্দরী, শিক্ষিতা, গায়িকা, গুণের অন্ত নেই—আর সব চেয়ে বড় গুণ—বড়লোক, বাপের একমাত্র সন্তান সে। এমন মেয়েরও কি পাত্রের অভাব হয়? কিন্তু হয়েছিলো। মেয়ের না-হ'লেও মায়ের বিচারে বাংলা দেশে পাত্রের বড়ই অকাল লেগেছিলো। অবশেষে ভাবনা তাঁর ঘুচলো।

অবিশ্যি এ বিয়েতে সবিতার যে সম্মতি ছিলো না তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যেতো, কিন্তু ওর কি বুদ্ধি আছে যে হেমলতার মতো একজন বিচক্ষণ মহিলা তার উপর এক তিলও গুরুত্ব আরোপ করবেন? আসলে যেমন বাপের মেয়ে তেমন তো হবে। স্বামীর বুদ্ধির উপর চিরদিনই হেমলতা দেবীর দারুণ অবজ্ঞা, অথচ একটা মাত্র সন্তান সেটাও ঠিক তাঁরই প্রতিমূর্তি। যাক্, বাপে-মেয়েতে মিলে শেষ পর্যন্ত যে কোনো কেলেংকারি না ক'রে ভালোয়-ভালোয় রাজি হ'লো এই যথেষ্ট। এখন দু'হাত এক করতে পারলেই শান্তি।

চারটা না-বাজতেই তিনি মেয়েকে তাড়া দিলেন, 'যা, যা, এক্ষুণি প্রস্তুত হ'য়ে নে গিয়ে, প্রতাপ এসে ব'সে থাকবে নাকি?'

সবিতার সমস্ত মুখে একটা দারুণ অনিচ্ছা ও অসন্তোষের চেহারা ফুটে উঠলো, কিন্তু মায়ের উপর কথা বলা তার অভ্যেস নেই, এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে সুইচ্ টেপা কলের মতো সে বই রেখে তোয়ালে নিয়ে ঢুকলো এসে বাথরুমে। বাথরুমে তো সে স্বাধীন, দরজা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলো দেয়াল ঘেঁষে।

এই প্রতাপকে নিয়ে ঠিক ক'জন হ'লো? মনে মনে সে হিসেব করলো। মনে পড়লো প্রথম বারের কথা। তখন কিন্তু তার ভালোই লেগেছিলো। সবে ষোলোয় পা দিয়েছে। বাইশ বছর বয়সের সুন্দর সুবেশ ছিপছিপে যুবক

সুধীরকে সে সরল অন্তঃকরণেই ভালোবেসেছিলো। ভাবতে এখনো ভালো লাগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা'র পছন্দ হ'লো না, স্পষ্ট মনে আছে মা'র শিক্ষামতো প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তার চোখ জলে ভ'রে গিয়েছিলো, কথা বলতে বলতে গলা ভেঙে গিয়েছিলো! তবু সে মা'র ইচ্ছার বাইরে পা বাড়াতে পারেনি—জোর ক'রে বলতে পারেনি নিজের কথা।

আর তার ঠিক ছ'মাস পরেই অবনী পালিত আর নলিনাক্ষ রুদ্র একসঙ্গে। দু'জনেই মা'র চোখে সমান প্রতিযোগী। অবনী পালিতের বাপের টাকার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত আর নলিনাক্ষ স্বয়ং আই. সি. এস্.। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি খসলো দু'জনেই কেননা দু'নৌকোয় পা রাখা আর খাটলো না। কিন্তু চিহ্ন রইলো অনেক, শরীরে মনে আর দামি দামি উপহারে। উপহার গুলোই শেষ পর্যন্ত মা'র সান্ত্বনা হ'লো। এর পরে সেই চির-লম্পট পান্না সেন! উঃ—সবিতা শিহরিত হ'য়ে উঠলো সে-লোকটার কথা ভেবে। মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলো সে-সব কথা, তারপর ঝরণা খুলে দাঁড়ালো নীচে। সমস্ত শরীর বেয়ে নামলো শান্তির ধারা।

টাকা! টাকা! টাকা! হেমলতা দেবীর আর যথেষ্ট মনে হয় না কিছুতেই। কিছুতেই তাঁর সুখ নেই, শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই। অবশেষে এই প্রতাপ। অনেক বার তিনি বঁড়শিতে মেয়েকে গেঁথে টোপ ফেলেছেন, কিন্তু টোপ যতই শাঁসালো হোক্ না, ঠুক্‌রেছে সব চুনোপুঁটি, অন্তত তাঁর তাই ধারণা। কিন্তু এই প্রতাপ—কে হিসেব করবে সে কত টাকার মালিক! দুষ্টু লোকে রটায় বটে ওটা অমানুষ—অমানুষ আবার কী। টাকাই পুরুষ মানুষের মনুষ্যত্ব—টাকাই স্ত্রীলোকের সুখ-শান্তি। হ্যাঁ, বলবার মতো বটে তাঁর জামাই। কে না চেনে প্রতাপ সিংহের বাপ অমর সিংহ আর তার বাপ দীন দয়াল সিংহকে? কে কবে তল পেয়েছে তাদের তিন পুরুষের টাকার?

হেমলতার এতদিনের প্রতীক্ষা সত্যিই সফল হ'লো।

অনাদিবাবু চোখে চশমা এঁটে ভাবতে বসলেন এটা ঠিক হ'লো কিনা, এ-বিয়েতে সবিতার সম্মতি আছে কিনা। জিজ্ঞেস করতে হবে, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস তো করাই উচিত—বিয়ে হচ্ছে তার—ইচ্ছা অনিচ্ছা তো তারই—হেমলতার

কী! সভয়ে তিনি একবার চারদিকে তাকালেন—কে জানে, হেমলতা আবার মনের কথাও শুনে ফেলেন।

স্নান ক'রে বেরিয়ে এলো সবিতা। মন তার শান্ত হয়েছে, এতক্ষণ ব'সে ব'সে সে চিন্তা ক'রে দেখেছে সুখ-দুঃখ ব'লে সংসারে কিছুই নাই—সমস্তই মেনে নেয়া না নেয়ার প্রশ্ন। প্রতাপকে তাঁর ভালো মনে হয় না—বেশ তো, নাই বা হ'লো ভালো, তাতে তার কী এসে যায়? বিয়ের পরে মুঠো-মুঠো টাকা সে মাকে এনে দেবে—ব্যস্। সুখ কী? সে কী রকম? আর দুঃখটাই বা কিসের? যত সব মনের বিকার। মৃদু হেসে সে লম্বা চুল মেলে দিয়ে অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে অনাদিবাবুর ঘরে এসে দাঁড়াতেই হেমলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'এখনো তোর হয়নি, কী আশ্চর্য! প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে প্রতাপ এসে ব'সে আছে।'

সবিতার মন এতক্ষণের চেষ্টাকৃত সংযমের বাঁধ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো, কিন্তু হেমলতার চোখের দিকে তাকিয়ে বাঘের ভয়ে ভীরু হরিণের চকিত গতিতে সে ফিরে এলো প্রস্তুত হ'তে।

প্রতাপ একেবারেই স্বাধীন। মা-বাপের বালাই তার অনেক দিন আগেই চুকেছিলো, এক পিসি বেঁচেছিলেন আপদ হ'য়ে তিনিও প্রায় মাস ছয়েক যাবৎ গত হয়েছেন। (এটাও হেমলতার একটা আকর্ষণ, তিনি পছন্দ করেন না মেয়ের স্বাধীনতায় অন্য কোনো গুরুজন অন্তরায় থাকেন।) বিবাহের যা কিছু সমস্ত প্রতাপকে একাই করতে হবে। সবিতাকে ব'লে গিয়েছিলো কী কী তার জন্য কিনতে হবে তার একটা লিষ্টি ক'রে রাখতে। কথাটা হেমলতার অগোচর ছিলো, কাজেই গাড়ীতে উঠেই দেখা গেলো সবিতা সেটা করেনি। আর প্রতাপের এত তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে আসবার কারণই ছিলো এটা। একটু বিরক্ত হ'য়ে বললো, 'তোমার দেখছি কিছুই মনে থাকে না।'

'স্মরণশক্তিটা বোধহয় দুর্বল।' হেমলতার অসাক্ষাতে সবিতা একটু-আধটু স্বাধীন ইচ্ছায় কথা বলতে চেষ্টা করতো। অবিশ্যি মায়ের প্রভাব সে সর্বদাই অনুভব করতো তার ভীরু মনের মধ্যে। আর তার নির্দেশও সে পালন করতো যথাযথভাবে—এবং এ-সব ক্ষেত্রে মনোরঞ্জনের নির্দেশটাই

যে মূখ্য সেটাও সে জানতো, তবু মাঝে মাঝে মন তার শক্ত খুঁটী আলগা করবার চেষ্টায় ছট্‌ফট্ ক'রে উঠতো।

এবার প্রতাপ একটু রসিকতার চেষ্টা ক'রে বললো, 'তবে তো তোমার একটু চিকিৎসার দরকার দেখছি। বলা যায় না, মনে না-রাখাটা যদি শেষে এই অভাগার উপর এসে পড়ে'—চকিত চোখে তাকালো সে সবিতার মুখের দিকে। সবিতা রসিকতাটা হয়তো হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না অথবা ইচ্ছে ক'রেই অন্যমনস্কতার ভান ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

প্রতাপ বললো—'চুপ ক'রে রইলে যে? কী হয়েছে?'

সবিতা মুখ ফিরিয়ে বললো, 'কী আবার হবে।'

'কী জানি তোমার মনের কথা জানবার সৌভাগ্য তো আমার হয়নি কোনদিন'—অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে এলো সে, চেষ্টা করলো হাত ধরবার।

সবিতা তক্ষুণি সরে ব'সে বললো, 'আচ্ছা প্রতাপ, ক'টা দিনই বা আর আছে—অতো অধীর হওয়া কি ভালো?'

অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে প্রতাপ বললো, 'এ কথারও কোনো মানে হয় না সবিতা, এ রকম নিয়ম মাফিক সাধ্বী থাকাও নেহাৎ হাস্যকর।'

কথাটা ঠিক বিদ্রূপের মতো শোনালো। সাধ্বী বলতে সাধারণত যা বোঝায় সত্যিই তো সবিতা তা নয়—এ-হাত কি আর কাউকেই সে ছুঁতে দেয়নি? এই শরীরে কি তার অনেক বিষ লুকিয়ে নেই? না কি এই প্রণয়-ভাষণই সে আর কারো মুখ থেকে শোনেনি? অনেক অসংযম, অনেক অন্যায়—যা করা সত্যিই উচিত নয় তাও সে অনেক বার করেছে মায়ের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়ে। তবে প্রতাপের বেলাতেই কেন এই হাস্যকর বিতৃষ্ণা? ভাবতে গেলে একমাত্র প্রতাপেরই এ-সব প্রাপ্য—সে ফাঁকি দেয়নি—সে লাম্পট্য করেনি, সত্যিই তার টাকা আছে, সত্যিই মা তাকে নির্বাচন করেছেন, বিয়ে তাদের সত্যিই হবে। কিন্তু তবু—তবু কেন ভালো লাগে না, কেন আর ভালো লাগে না এই অভিনয়? সহসা হাসিমুখে সে নিজের হাত প্রতাপের হাতের উপর রেখে বললো, 'নাও, হ'লো? কী আছে হাতের মধ্যে বলতে পারো?'

'তুমি বোঝো না?'

'না।'

'আশ্চর্য!' প্রতাপ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'আমার এক-এক সময় মনে হয় কী জানো? মনে হয় তোমার কোনো উত্তাপই নেই—তুমি যেন কলের মানুষ, কে চাবি টিপলো আর অভ্যেস মতো চলতে লাগলে তুমি।'

'হয়তো সেটাই সত্যি।'

'তবে—তবে কী চাও তুমি আমার কাছে?' প্রতাপ উত্তেজিত হ'য়ে তাকালো চোখে চোখে।

সবিতার ঠোঁট পর্যন্ত একটা জবাব ঠেলে উঠে আবার বুকের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মায়ের দুই চোখ ভেসে উঠলো তার চোখে, মনে হ'লো সে-চোখ যেন এক্ষুণি ফেটে যাবে ভর্ৎসনার ভারে—ভয়ে সংকোচে সে এতটুকু হ'য়ে গেলো, ভেবে পেলো না প্রতাপের মন রাখবার জন্য এর পর তার কী করা উচিত।

হু হু ক'রে ছুটলো গাড়ি, প্রতাপ আর একটি কথাও বললো না তার পর। নির্দ্দিষ্ট জুয়েলারের দোকানে এসে গাড়ি থামতেই সে লাফিয়ে নেমে দুম্ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো দরজাটা। সঙ্গে-সঙ্গে সবিতার বুকের মধ্যে ধ্বক্ ক'রে উঠলো। প্রতাপ কি রাগ করলো? ষোলো থেকে তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত কতো গেল কতো এলো সিনেমার ছায়ার মতো। রীলে গাঁথা সব ছবি মনের মধ্যে তার কিল বিল ক'রে ফুটে উঠলো। একেকটা সম্পর্ক কত কষ্ট ক'রে সে গ'ড়ে তুলেছে, আর কতো সহজে তারা ভেঙেছে! প্রতাপ যদি এখন বিয়ে না করে তবে আবার ভাঙবে। আবার ভাঙবে? ভাবতেই সবিতার কান্না পেলো। না, না সে আর-কিছু চায় না, চায় এর থেকে মুক্তি। আর সে-মুক্তির দূত একমাত্র প্রতাপই তো, প্রতাপই তো তাকে বিয়ে ক'রে মুক্তি দেবে, আর একমাত্র প্রতাপেরই এত টাকা আছে, যা তার মায়ের আকাঙ্ক্ষাকেও ছাপিয়ে যায়। ছল ছল ক'রে উঠলো সবিতার চোখ, বাধা দিলো না সে। মোটা মোটা ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো দুই গাল বেয়ে।

হঠাৎ লজ্জিত ভাবে চোখে রুমাল ঘ'সে হাসবার চেষ্টা ক'রে বললো, 'হয়ে গেলো?' প্রতাপ কখন এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির দরজা ধ'রে।

একটু পরেই একটা লোক প্রকাণ্ড এক মখমলের কেস্ এনে উঠিয়ে দিলো গাড়ির মধ্যে, তারপর মাথা নিচু ক'রে প্রতাপকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত।

গাড়ি ছাড়তেই সবিতা বললো, 'প্রতাপ, আমার যেন কেমন স্বভাব, ঝগড়া না করেই পারি না, তাই ব'লে কি তুমি আমার উপর রাগ করবে?'

'না, রাগ কিসের।'

সবিতা এবার তার সমস্ত শরীর এলায়িত ক'রে (এটি তার অব্যর্থ ভঙ্গি) আবদারের স্বরে বললো, 'কক্ষণো তুমি রাগ করতে পারবে না—' সঙ্গে-সঙ্গে সে প্রতাপের কাঁধে মাথা ছোঁয়ালো।

'ছাখো, সবিতা,' প্রতাপ গম্ভীর ভাবে বললো, 'মেয়েদের সমস্ত ভঙ্গি আমি চিনি, একমাত্র মেয়ে তো তুমিই নও যাকে প্রতাপ সিংহ আজই প্রতক্ষ্য করলো। তেরো থেকে তেত্রিশ—এই কুড়ি বছর যাবৎ তোমাকে বলাই ভালো কী যে আমি করেছি আর কী যে করিনি তার হিসেব দিতে গেলে একেবারে মহাকাব্য হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রীলোক আমি খুব ভালো ক'রেই চিনি।'

লজ্জায় অপমানে সবিতার সমস্ত শরীরে আগুনের স্রোত বয়ে গেলো। তীক্ষ্ণস্বরে বল্ল, 'এ সব তাহ'লে গোপন করেছিলে?'

প্রতাপ হাসলো, 'ছাখো, গোপনতা আমার স্বভাবে নেই। আকারে প্রকারে তোমার মাকে আমি সমস্ত কথাই জানাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি অত্যন্ত উদার মতের স্ত্রীলোক পুরুষের নৈতিকতা সম্বন্ধে।'

'হুঁ', সবিতা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তাই বলছি', প্রতাপ আগের কথার জের টেনে বললো, 'আমার মনে হয় আমার সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারে তোমার নিজের ব্যক্তিগত কোনো মতামত তুমি খাটাচ্ছো না।'

অত্যন্ত শান্তভাবে সবিতা মুখ ফিরিয়ে বললো, 'এতখানি অগ্রসর হবার আগেই সুবুদ্ধিটা কাজে লাগালে কি ভালো হ'তো না?

'অগ্রসর কী? কোনো অন্যায় ব্যবহার আমি তোমার সঙ্গে আজ পর্যন্ত তো করিনি। তা আমি তোমার সঙ্গে করতে পারি না।' একটু থেমে—'শোনো সবিতা', বলতে বলতে প্রতাপের গলার স্বর হঠাৎ অদ্ভুত বদলে এলো,

'আমি এখন শান্তি চাই, আর সে-শান্তি আমার তোমার মধ্যে। আমার ভালো নেই, মন্দ নেই, একমাত্র তুমি যদি'—গাড়িটা খচ্ ক'রে থেমে গেলো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রতাপ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। নিজের দুর্বলতা যে কখন কোন পথে আত্মপ্রকাশ করলো একথা ভেবে তার দস্তুরমতো লজ্জা করতে লাগলো। এ তো তার উদ্দেশ্য ছিল না, সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললো, 'রামো, রামো, কী সব বাজে কথায় এতক্ষণ কাটলো? কী নামছো না যে? ও, গয়নার দোকানে নিয়ে যাইনি ব'লে বুঝি অভিমান হয়েছে! না, না, এসো লক্ষীটি। শাড়ি কেনা কি পুরুষের কর্ম!'

সবিতার ইচ্ছা করলো না বাদানুবাদ করতে, নিঃশব্দে নেমে এলো গাড়ি থেকে।

তারপর সবিতার ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পছন্দে-অপছন্দে 'মিলিয়ে এত শাড়ি প্রতাপ কিনলো যে তার উদ্দামতায় দোকানিরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। গাড়িতে উঠে প্রতাপ প্রফুল্ল মুখে বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবলে যে টাকার দম্ভ দেখাচ্ছি, কিন্তু না, সত্যিই তা নয়। এই নিয়ে আরো অনেকবার আমার শাড়ি গয়না কেনবার দরকার হয়েছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর জন্য তো কখনো কিনিনি! এই কেনাতে যে এত আনন্দ লুকিয়ে ছিলো তা কি আমি জানতুম।'

সবিতা কথা বললো না। প্রতাপ আবার বললো, 'স্পষ্ট বুঝতে পারছি তোমার ভালো লাগছে না এসব, তুমি মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছো না, কিন্তু কী করতে পারি তাও তো ভেবে পাই না। নিজের সুখ যাতে হয় তা আমি এ জীবনে ছাড়িনি, অন্যের সুখ-দুঃখ ক্ষয়-ক্ষতি কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। কী করবো বলো, এই আমার স্বভাব, আমি মানুষটাই এমন স্বার্থপর।' একটু থেমে, 'তবে আজকে ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যাতে মনে হচ্ছে কারো জন্যে কিছু করতে পারলে যেন ধন্য হ'য়ে যাই। যদি তুমি ইচ্ছে করো তা হ'লে এক্ষুণি এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি। আমার মনে হচ্ছে এ-বিবাহ একান্তই তোমার মায়ের ইচ্ছায়।'

'প্রতাপ, একটা কথা শোনো', অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে মোটরের পিঠে হেলান দিয়ে ব'সে ততোধিক শান্তভাবে সবিতা বললো, 'আমাকে তোমার অতীত জীবন শুনিয়ে লাভ আছে? এ-কথা আর না-তোলাই ভালো। শুনে

ভাখো, মাত্র আর চার দিন আছে মাঝখানে, এখন আর কোন হাঙ্গামা বাধিয়ো না, দয়া ক'রে আমাকে স্থান দাও তোমার ঘরে, এর বেশি কোনো আকাঙ্খা, কোনো ইচ্ছা আর আমার নেই।'

এর উত্তরে প্রতাপ কিছু বলবার আগেই ড্রাইভার মুখ ফেরালো—'সাব্, চা পিনেকো যায়ে গা?'

'যাবে?'

'তোমার ইচ্ছা হ'লে চলো'—সবিতা বললো।

'থাকগে। নেই তোম যাও আলিপুর।'

অনাদি বাবু আলিপুরে থাকেন। হেমলতা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন—তাদের আসতে দেখেই ঝুঁকে বললেন, 'তোমরা এরই মধ্যে চ'লে এলে?'

প্রতাপ নেমে হাত ধ'রে নামালো সবিতাকে, তারপর হাসিমুখে উপরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ শিগ্‌গিরই হ'য়ে গেলো'—বলতে বলতে সে আবার উঠে বসলো গাড়িতে।

'এ কী, তুমি নামবে না? সবিতা আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো।

'না, ভালো লাগছে না।'

'সে কী কথা!' সবিতার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়লো।

হেমলতা দেবী উপর থেকে ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু বুঝলেন প্রতাপ চলে যেতে চাইছে। ডাকলেন, 'সবি,' উপরের দিকে চোখ তুলতেই তিনি প্রতাপকে ধ'রে রাখার ইঙ্গিত জানালেন। তৎক্ষণাৎ কলের মতো সবিতা বলতে লাগলো, 'না, না, সে হয় না, তোমাকে নামতেই হবে—চা খাবে না?' প্রতাপ হাসলো, দুই চোখে অদ্ভুত এক তিরস্কার বিচ্ছুরিত হ'লো তার। তারপর কিছু না ব'লেই মুখ ফিরিয়ে নিল ঐ জানালায়।—ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিলো, মুহূর্তে গাড়ি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো সবিতার চোখের উপর।

এবার নেমে এলেন হেমলতা দেবী। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বললেন, 'সে কী রে! প্রতাপ চলে গেলো কেন? কিছু বলিসনি তো?' চারদিক তাকিয়ে, 'কই, কিছু যে দেখছিনে? কেনা-কাটা হয়নি?'

'হয়েছে।'

'কোথায় সে-সব ?'

একটু উদ্ধত ভাবে সবিতা ব'লে উঠলো, 'কী জানি, আমি জানিনে', ব'লেই থতমত খেয়ে গেলো—মায়ের সঙ্গে ও-ভাবে কথা বলা তার অভ্যেস নয়। ভয়ে সে চুপ ক'রে গেলো।

'জানিনে মানে ?' হেমলতা ভ্রূকুটি করলেন।

সবিতা ঢোক গিললো, 'ভুলে গেছে বোধহয় রেখে যেতে—মা, কী বলবো'—সহসা সবিতা মায়ের মন জয় করবার পথটা যেন খুঁজে পেলো—'এত কাপড় আর গয়না ও কিনে এনেছে আমার জন্যে যে তা দিয়ে বেশ বড় রকমের ছটো দোকান খোলা যায়।'

চকিতে হেমলতার মুখের ভাব বদলে গেলো, কিন্তু ঠাট বজায় রেখে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন, উপরে চল্।'

পরের দিন সকালবেলা হেমলতা দেবী প্রতাপের আশায় ছট্‌ফট্ ক'রে কাটাতে লাগলেন, জিনিষপত্রগুলো না দেখা পর্যন্ত যেন তাঁর মন শান্ত হ'তে পারছিলো না। সমস্ত প্রতীক্ষা ব্যর্থ ক'রে সারাটি সকাল কাটলো তাঁর, প্রতাপ এলো না। ব্যগ্র হ'য়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, কালও এলো না—আজও এলোনা, রাগটাগ করেনি তো ?'

'না, রাগ করবে কেন, বিকেলে নিশ্চয় আসবে।'

অনাদিবাবু চা খাচ্ছিলেন, (সময়-অসময়ে চা খাওয়া তাঁর অভ্যেস) বলেলন, 'নাইবা এলো একবেলা, অত অস্থির হবার কী হয়েছে ?'

'চুপ করো তো তুমি', হেমলতা অস্বাভাবিক জোরে ধমকে উঠলেন, মনের বেগটা বেরুবার যেন একটা গতি পেলো, 'শরীরের ডাক্তারী ক'রেই তো চুল পাকিয়েছো, মনস্তত্ত্ব জানো কিছু ?'

খুব মৃদু গলায় অনাদিবাবু বললেন, 'আমার তো জানি ব'লেই ধারণা', আড়চোখে তিনি তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

'যদি জানতে তবে নাকে চশমা এঁটে অহোরাত্রি কেবল বই ঘেঁটেই দিন কাটাতে পারতে না। আমি হয়রান হয়ে গেলাম মেয়েটার বিয়ে নিয়ে, আর তুমি কী করেছো ?'

'আমি যে কিছু করিনি সেটাই তো আমার মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয়।'

'যাও, যাও,' হেমলতা বিরক্ত হ'য়ে উঠে গেলেন।

প্রতাপ কিন্তু বিকেলেও এলো না, পরের দিন সকালেও না। বিকেলের দিকে হেমলতা ফোন করলেন। প্রতাপকে পাওয়া গেলো না। সবিতার মনেও যথেষ্ট উদ্বেগের ছায়া পড়েছিলো, তার চোখে মুখেই সে কথা ছড়ানো। পরশু তাদের রেজিস্ট্রেসন অথচ প্রতাপের হ'লো কী! পরের দিন রবিবার। বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনা, শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পালা সমস্তই আরম্ভ হ'য়ে গেলো। কিন্তু প্রতাপ এলো না। বিয়ে হচ্ছিল খুব ঘটা ক'রেই। একমাত্র মেয়ে হেমলতার, বিয়ে হচ্ছে রাজপুত্রের সঙ্গে, একথা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব চেনা-অচেনা কাউকে বলতেই হেমলতা বাদ দেননি।

বাড়ি-ঘর ভ'রে উঠলো কলরবে। অবশেষে অনাদিবাবুও একটু বিচলিত হ'লেন প্রতাপের অনুপস্থিতিতে। তাঁর জীবনে জ্ঞানত এমন রবিবার কখনো যায়নি যেদিন তিনি উপাসনা ভুলে অন্য কাজে মন দিয়েছেন—কিন্তু সেদিন তার ব্যাঘাত হ'লো। তিনি মন্দিরে না গিয়ে গেলেন খিদিরপুর প্রতাপের বাড়ি। বিরাট বাড়ি, কোথা দিয়ে যে কোনখানে ঢুকবেন যেন দিশে পেলেন না। কন্যা আর স্ত্রীর কাছেই এ বাড়ি পরিচিত, তাঁর অভিযান এই প্রথম। কিন্তু কোথায় প্রতাপ? আমলা গোমস্তা, দাস-দাসী, দারোয়ান সেপাই, কুকুর-কাকাতুয়া—বাড়িটি যেন একটি প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা। নানাজনে নানা কথা ব'লে তাঁকে বিদায় দিলো, কিন্তু কোথায় গেলে প্রতাপকে পাওয়া যায় সেটাই জানা গেলো না। হতাশ হ'য়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

এদিকে গর্জাতে লাগলেন হেমলতা, 'দেবো, ওকে নিশ্চয়ই জেলে দেবো, স্কাউণ্ড্রেল হতভাগা'—মেয়ের উপর ও তাঁর কম রাগ হ'লো না। অপদার্থ মেয়েটাই নষ্টের গোড়া, তাঁর অনুপস্থিতিতে কী বলেছে, কী করেছে কে জানে। বাপেরই তো মেয়ে। গন্‌গন্‌ করতে করতে তিনি এলেন মেয়ের ঘরে। সবিতা চুপ ক'রে বসেছিলো জানলার পাশে, উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় লজ্জায় ঘৃণায় ইচ্ছে করছিলো তার ম'রে যেতে—ভয়ে সে তাকাতে পারলো না মায়ের চোখের দিকে। মাথা নিচু ক'রে নিঃশব্দে ব'সে রইলো।

'সবি, সত্যি কথা বল্‌ তুই সেদিন কী বলেছিস্‌ প্রতাপকে।' সেই যে প্রতাপ ওকে নামিয়ে জিনিষপত্র না রেখে চলে গেলো সেই থেকে হেমলতার

মনে কন্যার নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে এক বিষম সন্দেহ আলোড়িত হচ্ছিলো। তিনি তাঁর শ্যেন দৃষ্টিতে এটা খুব লক্ষ্য করতেন যে প্রতাপের যে কোন তুচ্ছতম প্রণয় ভঙ্গিতেও সবিতার মুখে অপরিসীম বিরক্তি ফুটে উঠতো।

মায়ের জেরায় সবিতা বিব্রত হ'য়ে উঠলো। ক্ষীণ গলায় বললে, 'কিছুই তো বলিনি, মা।'

'নিশ্চয়ই বলেছো', মা'র স্বর চ'ড়ে উঠলো, 'তোমাকে আমি চিনি না—সবটাতে তোমার মান যায়, সব জায়গায় তোমার সুনীতি। পুরুষ মানুষকে বিয়ে করতে হ'লে একটু প্রশ্রয় দিতেই হয়—'

সবিতার কান পুড়ে গেলো। মা আর কী বলবেন এরপর?

'মা, চুপ করো, চুপ করো'—সবিতা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

রাত্রিতে অনাদিবাবু চিন্তিত মুখে পায়চারি করছিলেন আর ভাবছিলেন কী করা উচিত।

কিমোনো গায়ে জড়িয়ে সবিতা ঘরে এলো। অনেকক্ষণ আগেই ও শুতে গিয়েছিলো, ওকে দেখে অনাদিবাবু পায়চারি থামিয়ে বললেন, 'তুই ঘুমোসনি মা?'

'না, বাবা।'

'যা, যা, রাত করিসনে।' অনাদিবাবু আবার হাঁটতে লাগলেন।

সবিতা মায়ের দিকে তাকালো, বললো, 'মা, আমার জন্যই তোমাদের যত কষ্ট।'

হেমলতা জবাব দিলেন না।

অনাদিবাবু আবার বললেন, 'যা মা, রাত করিসনে, আমি এক্ষুনি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ব।' তিনি টেবিলের ধারে এগিয়ে এলেন। খুঁজতে লাগলেন চশমার খাপটা। কাগজ পত্রে স্তূপ করা টেবিল, নিজের অগোছালো স্বভাবের জন্য বিরক্ত হ'লেন। দুই হাতে আবোল তাবোল কাগজ সরাতে সরাতে হঠাৎ একখানা খামে ভরা চিঠির উপরকার হাতের লেখা দেখে তাঁর চোখ নিবদ্ধ হ'লো। চিঠিখানা বিকেলের ডাকে এসেছে, চাকররা রেখে গিয়েছিলো অভ্যাস মতো চাপা দিয়ে, কিন্তু চোখে পড়েনি অনাদিবাবুর—কিম্বা কোনো কাগজ খুঁজতে গিয়ে কার তলায়

এটাকে তিনি ফেলেছিলেন তার ঠিক নেই। ফস্ ক'রে খুলে ফেললেন চিঠির মুখ—

শ্রীচরণেষু—

বিশেষ কোনো কারণে আমি এ দু'দিন কলকাতার বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, আজ এইমাত্র এলাম। এ দু'দিন নাওয়া-খাওয়ার সময়ও আমার ছিল না তাই খবর দিতে পারিনি। আসবার আগে আমি ড্রাইভারকে ব'লে এসেছিলাম আপনার কন্যার জন্য যে-সব সামান্য জিনিষপত্র কেনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তা পৌঁছে দিতে। ড্রাইভার আমার পাঁচ বছরের বিশ্বস্ত লোক কিন্তু এসে জানলাম জিনিষপত্র নিয়ে সে ফেরার হয়েছে। হাজার পাঁচেক টাকার গহনা আর শ পাঁচেক টাকার শাড়ি সেখানে ছিল। যা-ই হোক্, যা গেছে তা গেছেই, ভবিষ্যতে আপনাদের দয়ার যে মূল্য আমি পাবো ব'লে আশা করছি তার আনন্দের কাছে এ জিনিষ কেন—আমার সমস্ত জীবনও অতি তুচ্ছ। তবে আমার মতো দুর্ভাগার অদৃষ্টে বিধাতার এত আশীর্বাদ হয়তো নেই। আজকে আমি যে-সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি তার মধ্যে কোনো ছলনা, কোনো আড়াল রেখে আমি আর শান্তি পাচ্ছি না। পাপ-পুণ্য জানিনে, তবে আজ মনে হচ্ছে এ-কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে যে আপনারা আমাকে যা ভেবে কন্যার যোগ্য বিবেচনা করেছেন, আমি তা নই। এমন কি আমার বাড়িটি পর্যন্ত এখন দেনার দায়ে বাঁধা। মায়ের অজস্র গহনা বিক্রি ক'রে-ক'রে এতদিন তবু চলছিল কিন্তু তাঁর শেষ গহনাটির বিনিময়েই সেদিন আমি সবিতার জন্য কিছু কিনেছিলাম। এ গহনাটি আমার মায়ের একান্ত সাধের ছিলো, এটি তিনি তার পুত্রবধূর জন্যই সযত্নে তুলে রেখেছিলেন, আমি তাঁর সেই অন্তিম ইচ্ছাই পূরণ করতে চেয়েছিলাম। বাকি আরো পাঁচ হাজার টাকা ছিল তা থেকে, সে টাকা আমি সবিতাকে দিলুম। যদি আমাকে আপনারা ত্যাগ করেন তবুও এ সামান্য টাকাটা গ্রহণ ক'রে আমাকে চিরবাধিত করবেন।

আপনি মহৎ, আপনি আমাকে দয়া করুন, ক্ষমা করুন, আপনার দয়ার উপর নির্ভর করছে আমার সমস্ত জীবন।

হতভাগ্য প্রতাপ।

চিঠি পড়া শেষ ক'রে অনাদিবাবু কতোক্ষণ স্থির হ'য়ে রইলেন, তারপর যেন ভেঙে দু'খানা হ'য়ে ব'সে পড়লেন চেয়ারের উপর। হেমলতা এতক্ষণ ভদ্রতা ক'রে ধৈর্য ধরেছিলেন, (ভদ্র হবার একটা ভাণ ছিলো তাঁর) এবার প্রায় ছোঁ মেরে স্বামীর শিথিল হাত থেকে টেনে নিলেন চিঠিটা। চোখের দৃষ্টি প্রখর ক'রে উর্ধ্বশ্বাসে পড়তে লাগলেন; পড়তে পড়তে তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফীত হ'য়ে উঠলো, নিশ্বাসের ঘনতা বাড়লো, পাউডারের প্রলেপ ছাপিয়ে বার্দ্ধক্যের রেখাগুলো স্পষ্ট চেহারা নিল। অসম্ভব উত্তেজিত হ'য়ে তিনি খাট থেকে নামলেন, চিঠিটাকে দুমড়ে মুচড়ে এইটুকু ক'রে ফেললেন হাতের মুঠোয়, বেগে হেঁটে গেলেন দরজার কাছে। মনে হ'লো অপরাধীকে বুঝি এখুনি খুন করতে বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু ফিরলেন, ঘরের মাঝামাঝি এসে স্তম্ভিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। ডেলাপাকানো চিঠিটা ছুঁড়ে মারলেন তার দিকে। বোধহয় মেয়ের উপরই এক বিজাতীয় ক্রোধে ফেটে গেলেন তিনি। সবিতা চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে এক পা দু'পা ক'রে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। হেমলতা নিজেকে আছড়ে ফেললেন বিছানায়, আশাভঙ্গের দুঃখে ব্যর্থতায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন রাগে আর কান্নায়, খসখসে গলায় বলতে লাগলেন, 'স্কাউণ্ড্রেল, রোগ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, আমি দেখে নেবো, দেখে নেবো, আমি কেইস করবো, আমি হাজতে দেব তোকে—' গলা তাঁর কেঁপে কেঁপে ক্রমশই উঁচু পর্দায় উঠতে লাগলো।

ততোক্ষণে নিজের ঘরে এসে চিঠিটা আদ্যোপান্ত দু'বার ক'রে পড়লো সবিতা। শেষে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো জানালা ধ'রে। প্রতাপের অনেকদিনের অনেক কথার, অনেক ব্যবহারের অনেক অর্থ যেন মুহূর্তে উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেল তার কাছে। নিজের মনের বিতৃষ্ণা মিশিয়ে যে প্রতাপকে এই তিনমাস ধ'রে দেখছিলো সে, আজকের প্রতাপের সঙ্গে যেন আর মিললো না তার। মনে করতে পারলো না একদিন, এতোটুকুও অশালীন ব্যবহার সে পেয়েছে কিনা তার কাছ থেকে, যার জন্যে সর্বদাই সবিতা শঙ্কিত থেকেছে, বিরক্ত থেকেছে। বরং সবিতাই কোনো কোনোদিন মায়ের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়ে এমন সব ভঙ্গি করেছে, যার একমাত্র জবাব ছিলো,

তাকেই প্রতাপের ভেঙে চুড়ে দুমড়ে মুচড়ে সমস্ত শরীরে অশুচি ক'রে দেয়া। কিন্তু প্রতাপ নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে তাদের নির্জন ড্রইংরুম থেকে, যে ড্রইং-রুমের দরজা ভেজানো থেকেছে, যে ড্রইংরুমে তৃতীয় ব্যক্তিকে ঢুকতে না দিয়ে আড়ালে আড়ি পেতে থেকেছেন হেমলতা।

সহসা একটা অনির্দেশ্য মমতায়, ভালোবাসায়, করুণায়, হৃদয়টা কান্নায় কান্নায় ভ'রে উঠলো। মনে পড়লো প্রতাপের মুখ, সে মুখ চোখে দেখে কোনোদিন এতো সুন্দর মনে হয়নি সবিতার, আজ ভেবে দেখলো অন্তরে যা অঙ্কিত আছে তার কোনো তুলনা নেই। কিন্তু—কিন্তু—সেই মানুষকে তো আর কখনো দেখতে পাবেনা সে। কখনো না, কোনদিন না। আর কোনো দিন হেমলতা দরজা খুলে দেবেন না তাকে। তবে? তবে কি হবে? আবার কি অন্য কেউ আসবে? আবার চলবে অভিনয়? আবার নতুন ক'রে বালির বাঁধ? না। না অসম্ভব। অসম্ভব।

আলো নিবিয়ে শুতে গিয়েও শরীরে মনে অস্থির হ'য়ে সবিতা উঠে দাঁড়ালো, পা দু'টো যেন শক্ত হ'য়ে গেঁথে গেল মাটিতে। কিন্তু এ পা তাকে তুলতেই হবে এখান থেকে, হেমলতার বাড়ি থেকে। এই চার দেওয়ালের দম বন্ধ করা কুৎসিত ঘৃনিত আবহাওয়া থেকে মুক্তি চাই, মুক্তি। একান্ত অশান্ত পদক্ষেপে তারপর কখন সে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রাত দশটার জনহীন পথে কেউ জানতে পারলো না। নিজেও বুঝতে পারলো না। রাত্রির দিকে তাকিয়ে একটু থমকালো, কিন্তু ভয় কী? এই তো আকাশের তলা, বাতাসের গান, আর তারপর, তারপর আলিপুর থেকে খিদিরপুর আর কতটুকু পথ?

দৈবাৎ

গ্রামের মধ্যে ঝুন্টি স্বনামধন্য। তাকে না চেনে এমন কে আছে? তেরো বছরের বাড়ন্ত মেয়ে আঁটো-সাঁটো গড়ন, সরল সুন্দর চোখ। কোমরে কাপড় জড়িয়ে কোঁকড়া কালো বাবড়ি চুল মেলে দিয়ে দিব্যি মনের আনন্দে সে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়। ঘুড়ির দিনে ঘুড়ি ওড়ায়, সারাদিন লাট্টু ঘোরায়, মারবেল খেলে, কড়ি দিয়ে জুয়ো জেতে, আম গাছে আম, পেয়ারা গাছে পেয়ারা, কুলগাছে চ'ড়ে কুল—এমন কোনো দুরূহ কর্ম নেই যা সে করে না।

মা বাবা মারা গেছেন এইটুকু রেখে। নিঃসন্তান কাকা কাকিমার নয়নের মণি। তাঁদেরই গভীর স্নেহচ্ছায়ায় তার এই সরল সদানন্দতা দিনের পর দিন অবাধ প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছিলো। ঝুন্টির কাকা রথীবাবু মেয়ের এই দস্যিপনা এমন সস্নেহ হাসির সঙ্গে উপভোগ করতেন যে সেই সময় তাঁর মুখখানা দেখলে মনে হোত এর চেয়ে সুখ আর কোথাও তাঁর নেই। কিন্তু গ্রামে এ নিয়ে ভয়ানক আলোচনা হ'তে লাগলো। প্রথমে রেখে-ঢেকেই চলছিলো কিন্তু ক্রমে তা প্রকাশ্য শত্রুতায় দাঁড়ালো। একবার উষা এ নিয়ে তার স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করবার একটি ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে মেয়ের শাসন ভার নিজের হাতেই গ্রহণ করলো। প্রথমটায় মিষ্টিমুখে তারপর কিছুদিন চড়-চাপড়টাও চললো বেশ। কাকির এই নিষ্ঠুরতায় ঝুন্টি একটু অবাক হ'লো বটে, কিন্তু ফল হ'লো না কিছুই। বরং গ্রামের লোকের কচায়ন ইন্ধন পেয়ে আগুনের মতো লকলকে হ'য়ে উঠলো।

গ্রামের জমিদার হরিশবাবু, তাঁরই ম্যানেজার ঝুন্টির কাকা। উষা অসহ্য হ'য়ে পরের ঘরে উঁকি দেওয়া নিয়ে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে জমিদারের কাছে নালিশ জানাতে বললো স্বামীকে। তাঁর একটা হুঙ্কারেই হয়তো গ্রামবাসীর মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হবে। রথী চ'টে উঠলো, 'বলছ কী তুমি! কী নিয়ে নালিশ জানাবো আমি? একটা পারিবারিক ব্যক্তিগত ঘটনা, তা নিয়ে আর হরিশবাবুর মাথা-ব্যথার অন্ত নেই, না? আর হরিশবাবু নিজেও এর চেয়ে কিছু কম যান কিনা।'

এর মধ্যেই একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল। কাছারিতে যাবার মুখে রথীর একদিন দেখা হয়ে গেলো গ্রামের পাণ্ডা হরিহর ভট্টাচার্যের সঙ্গে। হাসিমুখে সম্ভাষণ জানিয়ে এগিয়ে গিয়েই রথী থমকে গেলো। ভটচায গম্ভীর মুখ ক'রে ব'লে উঠলেন, 'ছুঁয়ো না বাবাজি, জাত-জন্ম তো এখনও কিছু আছে।'

রথীকে অবাক হ'তে দেখে ভটচায বললেন, 'এটা কি তোমাদের উচিত হচ্ছে, রথী! অত বড় মেয়েটা গাঁয়ের সব ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে অমন দামালি ক'রে বেড়ায় এতে কি তোমাদের একটুও লজ্জা করে না। সমাজকে কি তোমাদের একটুও ভয় নেই? আমি কাল নিজ চোখে দেখেছি ঐ নতুন লেখাপড়া-শেখা অযোধ্যা দাসের বড় ছেলেটার সঙ্গে সে আম-মাখা খাচ্ছে।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'কা হয়েছে! অবাক করলে, রথী! ও মেয়ের কি জাত-জন্ম আর বাকি আছে নাকি? তা বাপু ও-সব বিবিয়ানা তোমরা সমাজের বাইরে ব'সেই চালিয়ো। অযোধ্যা দাস আজই না হয় চাকরি করে, দু'অক্ষর লিখতে শিখে ভদ্দর হয়েছে—চিরদিন তো মাছ ধ'রেই কাটলো। তার সঙ্গে এখনো আমরা প্রকাশ্যে ব'সে খাইনে।'

রথী একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তাহ'লে আপনি কী করতে বলেন?'

'আমি আর বলবো কী বাপু, ঐ সতী-সাবিত্রী মেয়ের একটা গতি করো—আমার মেয়ে হ'লে তো আমি তার গলায় কলসি বেঁধে ডুবিয়ে দিতাম।'

'তা আমি জানি', রথী চড়া স্বরে বললে, 'ডুবিয়ে কি কাউকে আপনি দেননি নাকি? নিজের ঐ একটা এক ফোঁটা মেয়েকে আপনি যদি স্বেচ্ছায় সত্তর বছরের বুড়োর হাতে দিতে পারেন টাকার লোভে, তবে তো আপনি সবই পারেন।' ঘৃণা ভরে রথী পা বাড়ালো যাবার জন্য।

হরিহর ভটচায এবার হুঙ্কার ছাড়লেন, 'বড়ই দেখছি আস্পর্ধা হয়েছে তোমার, রথী! কাকে কী বলছ ঠাহর নেই। এ-গ্রাম থেকে তোমাকে যদি উচ্ছেদ না করি তো আমার নাম হরিহর ভটচায নয় আমার বাপের নাম নরহরি ভটচায নয়, আমার ঠাকুর্দার নাম হরচন্দ্র ভটচায—'

রথী আর না শুনে হন্‌হন্‌ ক'রে চলে গেলো কাছারিতে। মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেলো।

বিকেল বেলা ফিরে এসেই রথী উষার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঝুন্টিকে দিন

কয়েকের জন্য তাঁর মামাবাড়ি ঢাকা রেখে আসা স্থির করলো। রথীর মতো সাদাসিধে একজন মানুষ যে হরিহরের মতো ধূর্ত মানুষের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না এটা উষা ঠিক জানতো। বছর দু'য়েক আগে একটা ঘটনা ঘটেছিলো রায়ের বাড়ি। রায়েদের সঙ্গে প্রায় পুরুষানুক্রমে ভটচাযের শত্রুতা, কিন্তু তার রূপ যে এত বীভৎস, এত হৃদয়-বিদারক হ'তে পারে এটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সেটা যে এই হরিহরের দ্বারাই সাধিত এ কথা গ্রামের সবাই জানে। রায়েদের বড় ছেলে বরদা রায়ের একমাত্র মেয়েকে তিনদিন পরে অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে পূব পাড়ার ধান ক্ষেতে যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো তা স্মরণ ক'রে উষার হৃৎকম্প হ'তে লাগলো।

কাজেকাজেই দুই চক্ষের জলে ভেসে পরের দিন সকালবেলা ছ'টার লঞ্চে ঢাকা যাবার জন্য মেয়েকে সে প্রস্তুত ক'রে দিলো। লঞ্চঘাটে যেতেই ঝুন্টি অবাক হ'য়ে বললে, 'কাকা এখানে কেন এলে ?'

'ঢাকা যাবো যে তোকে নিয়ে।'

'ঢাকা ? কেন ?'

'তোর মামাবাড়ি। সেখানে তোকে রেখে আসবো—লেখাপড়া করবি, ভদ্রলোক হবি।'

'না, আমি যাবো না,' সজোরে ঝুন্টি হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

'সে কী রে ?' রথী স্নেহভরে তাকে কাছে টেনে এনে বললো, 'বেড়াতে যেতে তো তুই ভালোইবাসিস, কী সুন্দর শহর, কত দোকান, কত খেলা—'

'হোক্‌গে, আমি যাবো না,' ঝুন্টি প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়ে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রথী বেগতিক দেখে বললে, 'ও মা, বায়োস্কোপ দেখবি না ? সেইজন্যেই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি, এখানে আর কেউ ছাখেনি—'

ঝুন্টির শক্ত পা একটু নরম হ'লো, নড়েচড়ে বললে, 'তবে কাকিকে আনলে না কেন ?'

'ওঃ কাকি। কাকিকে নেবো কেন ?' সেবার যে যাত্রা হয়েছিল তোকে নিয়েছিলো ? ঘুম পাড়িয়ে রেখে কী রকম লুকিয়ে দেখে এলো।'

'হুঁ,' ঝুন্টির পা চললো এবার, 'ঠিক বলেছো কাকামনি, খুব জব্দ হবে এবার।' ওর টানা চোখ খুশিতে ভ'রে গেলো।

বিনা ঝঞ্ঝাটে এবার ঝুন্টি লঞ্চে উঠলো। শ্রীপুর থেকে ঢাকা মোটে তিন ঘণ্টার রাস্তা, দেখতে দেখতে এসে গেলো তারা।

নদীর কাছাকাছিই ওর মামাবাড়ি। মামা পোস্টমাস্টার, তাঁর দুই মেয়ে সন্ধ্যা আর আরতি ঝুন্টিকে দেখে ভারি খুশি। ঝুন্টি তার কাকার শার্টের কোন আঁকড়ে বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে রইলো শক্ত হ'য়ে। মামিমা আদর করলেন, মামা টানলেন, কিন্তু তার মুঠি আলগা হ'লো না।

রাত বারোটায় একটা গহনার নৌকা ছাড়ে, ঝুন্টি ঘুমুলে রথী সেই নৌকোতে ফিরে এলো দেশে।

পরের দিন সকালে উঠে ঝুন্টি কাকাকে দেখতে না পেয়ে বড়োই ব্যাকুল হ'য়ে পড়লো, অবশেষে কাকার এই বিশ্বাসঘাতকতায় কাতর হ'য়ে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু একদিন গেলো, দু'দিন গেলো, এই ক'রে ক'রে অনেকদিন পরেও যখন কাকা আর এলো না তখন সে একেবারে শান্ত হ'য়ে গেলো। সেই গণ্ডি ঘেরা ছোট্ট বাড়ি—হুকুম নেই বাইরে আসবার। রাস্তায় মুসলমান ছেলে-মেয়েরা খেলা করে; গান গেয়ে চলে যায়—'বো কাট্টা' ঘুড়ি ওড়ায় আর আনন্দধ্বনি করে, জানালায় ব'সে তা দেখে দেখে ঝুন্টির শিক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে। সূর্যালোক যেন নিবে গেছে তার জীবন থেকে। বিকেল বেলা মামাতো বোনেরা নিজেরা সাজে, মুখে পাউডার দেয়, চোখে কাজল মাখে, কপালে দেয় কুমকুমের ফোঁটা—ঘুরিয়ে সুন্দর রঙের শাড়ি পরে তারপর জুতো পায়ে দিয়ে তাকে নিয়ে বেড়াতে যায় নদীর ধারে। যেখান থেকে সব গহনার নৌকো ছাড়ে, লঞ্চ ছাড়ে, সে সব দেখায়—দেখিয়ে দেখিয়ে বলে, 'ঝুন্টি, যাবে নাকি?' ঝুন্টি শব্দ করে না, মন কেমন ক'রে ওঠে, গলা বন্ধ হয়ে আসে।

একদিন দুপুর বেলা মেয়েরা স্কুলে গেছে, মামা আপিশে, মামিমা ঘুমুচ্ছেন নাক ডাকিয়ে। এ-জানালা ও-জানালা ক'রে ক'রে হঠাৎ ঝুন্টির কী দুর্বুদ্ধি হ'লো, নিঃশব্দে এক সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর সোজা একেবারে গহনা ঘাটে।

একখানা গহনা ঘাটে বাঁধা ছিল—গা ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে সে উঠে এলো নৌকোতে। মাঝিরা সব খেতে গেছে পাড়ে। পেছনের গলুইতে কর্ণধার হ'য়ে বছর দশেকের এক ছোকরা ব'সে ছিল, সে দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলো—'এই, তুমি কেন নৌকোয় চড়ছ ?'

'আমি যাবো।'

'ইস্ গেলেই হ'লো! পয়সা আছে ?'

'বাড়ি গিয়ে দেবো।'

'দিয়ো কিন্তু'—খুব চালের মাথায় ছোকরা একেবার জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে গম্ভীর মুখে গান ধরলে, 'নইদের চাঁদ কুম্ভীর হইয়েছে।' আর ঝুন্টি সেই সুযোগে মাঝিদের টাল করা বিছানা বোঁচকা ঠেলে তার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো মাঝিরা, আস্তে লোকজনে ভ'রে উঠলো নৌকো, ভিড় বেশী হ'লো না—যদি বা কেউ আসে এই ভরসায় খানিক দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর নৌকো যখন প্রায় ছাড়ে তখন একুশ-বাইশ বছরের চশমা-পরা সুন্দর একটি ছেলে লাফ দিয়ে উঠে এলো নৌকোয় এবং ছইয়ের তলায় না-ব'সে একেবারে পিছনের দিকে যেখানে মাঝিদের বোঁচকা পুঁটুলি রাখা আছে সেখানে পিঠ ক'রে বসলো। ঝুন্টির একেবারে নাকের সামনে। এতক্ষণ ঝুন্টির লুকিয়ে এ-সব দেখতে ভারি মজা লাগছিলো। মনটা যেন ছাড়া পেয়েছে এতদিন পরে, কিন্তু বাক্স বিছানার একটু আধটু ছিদ্রপথে যে-আলোটুকু হাওয়াটুকু তার জুটছিলো ঐ ছেলেটির পিঠের অন্তরালে তা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে সে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হ'লো। প্রতি মুহূর্তে পাৎলা পাঞ্জাবি ভেদ ক'রে প্রচণ্ড এক চিমটি কাটার ইচ্ছা হ'তে লাগলো তার। তার উপর নৌকো ছাড়তেই ছেলেটা একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম ক'রে টানতে লাগলো আর তার যতো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে তীর বেগে এসে ঢুকতে লাগলো ঝুন্টির নাকে। ঝুন্টি অনেকক্ষণ এই অন্যায় সহ্য করলো, তারপর মরীয়া হ'য়ে সে মুখ বাড়ালো বাক্স বিছানা ঠেলে। গরমে সেদ্ধ হয়েছে এতক্ষণ—টুকটুক করছে গাল—বিন্দু-বিন্দু ঘামে ভরা কপাল। হঠাৎ ছেলেটি চমকে মুখ ফিরিয়ে অবাক হ'য়ে গেলো। চোখ লাল ক'রে ঝুন্টি বললে, 'এই, সিগারেট খাচ্ছ কেন ?'

ছেলেটি ভয়ানক কৌতুক বোধ করলো, বললে, 'তাতে তোমার কী ?

'আমার বমি আসছে, এক্ষুণি ফেলো সিগারেট।'

একান্ত বাধ্য ছাত্রের মতো সে হাতের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট জলে ফেলে বললে, 'এই দ্যাখো আমি কেমন তোমার কথা শুনলাম, তুমিও এখন নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবে।'

ঝুন্টি জবাব না দিয়ে আবার মাথা ডোবালো কাঁথার পিছনে।

'এ কী?'

'বাঃ, মেয়েদের আবার গহনায় চড়তে আছে নাকি?

'তবে চড়েছ কেন?'

'তাই জন্যেই তো লুকিয়ে আছি।'

'লুকিয়ে তো তুমি শেষ পর্যন্ত থাকবে না, এক জায়গায় তো নামবেই?'

'তাও তো বটে,' ঝুন্টি এবার ভাবলো কথাটা। চিন্তিত ভাবে বললে, 'তাহ'লে কী করি বলো তো?'

'আমি তো বলি তুমি বেরিয়ে এসে এইখানে আমার পাশে বোসো, সুন্দর হাওয়া আর কেমন পড়ন্ত রোদ—'

ঝুন্টি মুহূর্তে বোঁচকা পুঁটলি ঠেলে সবেগে বেরিয়ে এলো বাইরে। সঙ্গে-সঙ্গে মাঝি-মাল্লা যাত্রীরা সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে একযোগে তাকালো ওর দিকে। হেড মাঝি একটু ভালো মানুষ গোছের, জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কেগো দিদি?'

'আমি ঝুন্টি'—সহজ সরল গলায় ঝুন্টি বলল।

'কখন উঠেছো?'

'বলবো না।'

'তুমি একা একা এসেছ নাকি? কোথা থেকে এসেছ? নামবে কোথায়?'

'নামবো শ্রীপুরে, কিন্তু কোথা থেকে এলাম তা আমি বলবো না।'

মাঝি হাসলো, 'লুকিয়ে এসেছ বুঝি?'

যাত্রীদের মধ্যে একজন রসিকতা ক'রে উঠলো, 'বাঃ, বেড়ে মেয়ে তো।'

হঠাৎ ছেলেটি চীৎকার ক'রে উঠলো, 'চোপরাও রাসকেল! আর একটি কথা বলবে তো মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলবো।'

জনতার মধ্য থেকে ঝাকড়া চুলওয়ালা ঘাড় লিক লিকে এক ছোকরা রুখে উঠলো—'তুমি কে হে, এটি কি একা তোমার সম্পত্তি?'

'ফের, বদমাস,' এবার ছেলেটি আস্তিন গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালো আর

সঙ্গে-সঙ্গে কে একজন বৃদ্ধ ফিস ফিসিয়ে ব'লে উঠলো, 'ওরে, করছিস কী তোরা, ও যে আমাদের বড়ো বাবুর ছেলে অরুণ।'

'সর্বনাশ', লিকলিকে ঘাড়ওয়ালা জিভ কেটে ব'সে পড়লো তক্ষুণি, মাঝি-মাল্লারাও এবার সচকিত হ'লো। মুহূর্তে মন্ত্রাবিষ্টের মতো শান্ত হ'য়ে গেলো সকলের স্বর। জমিদার হরিশবাবুর কোপে পড়ার চেয়ে যে-কোন রকম দুঃখই তারা বরণ করতে পারে। আর এই গহনার নৌকো যে শ্রীপুরের খাল বেয়ে চলতে পারে সে তো তাঁরই দয়ায়—প্রায় বারো আনা পথই যে তাঁদের এলাকা। হুমকি ছেড়ে মাঝি বললো, 'যাত্রী ভাই, তোমরা সব ভদ্দরলোক না? ভদ্দরলোকের কি এই ব্যাভার?' তারপর একান্ত বিগলিত ভাবে বড়োবাবুর পুত্রের কাছে তারা মার্জনা ভিক্ষা করলো।

কিন্তু এত সব কাণ্ড যাকে নিয়ে সে কিন্তু দিব্যি নিরুদ্বেগে অরুণের পাশে এসে বসলো। বিষণ্ণমুখে বললো, 'বাড়ি গেলে আমাকে বোধ হয় কাকি বকবে। কিন্তু ওখানে থাকার চেয়ে কাকির একটু বকুনি খাওয়া অনেক ভালো।'

'কোথায় ছিলে তুমি?'

'ঐ তো বড়ো পোস্টাপিশের কাছে, আমার মামাকে চেনো না? তারই তো পোস্টাপিশ।'

অরুণ হেসে ফেললো, 'ও, তাই নাকি?'

'হুঁ', খুব গম্ভীরভাবে ঝুন্টি জবাব দিলো।

'তোমার নাম বুঝি ঝুণ্টু?'

'না, ঝুন্টি—ঝুণ্টু কেবল কাকিমার জন্য।'

'আমার জন্য না?'

ঝুন্টি এবার চোখ বড় ক'রে তাকালো ওর মুখের দিকে। হঠাৎ বোধহয় ভয়ানক ভালো লাগলো তার সে-মুখ। তাকিয়ে রইল।

'কী দেখছো?'—অরুণ হেসে বললো।

লজ্জিতভাবে ঝুন্টি চোখ নামিয়ে বললে, 'তুমি যদি নেহাৎই চাও তবে ডাকতে পারো ঝুণ্টু ব'লে।'

'তাহ'লে আমাকে নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হয়েছে?' ঝুন্টি সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, 'আর আমি তোমাকে কী ব'লে ডাকবো?

'অরুণ।'

'অরুণ! কিন্তু তুমি যে আমার বড়। কাকি বলেন যে বড়দের নাম নিয়ে ডাকতে নেই।'

'তা হ'লে ডেকো না।'

'বাঃ তা কী হয়? কিছু তো একটা ডাকতেই হবে।'

'তা কেন, না-ডেকেও বেশ কথা বলা যায়।'

'কক্ষণো যায় না', ঝুন্টি সবেগে প্রতিবাদ করলো।

'নিশ্চয়ই যায়', অরুণ গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু ক'রে বললে, 'তোমার মা কি তোমার বাবাকে কিছু ব'লে ডাকেন?

'আমার বাবা নেই, কাকা আছেন—'

'তাহ'লে তোমার কাকিমা তাঁকে কী বলে ডাকেন জানো?'

'ধ্যেৎ—' ঝুন্টির গালে হঠাৎ রক্ত নেমে এলো।

লজ্জা জীবনে সে পায়নি। বিয়ের সম্বন্ধ তার বহু এসেছে, কাকি ব'লে দিয়েছেন, এটা লজ্জার বিষয় এ-কথা কাউকে বলতে নেই, তাই সে বলে না, কিন্তু এ লজ্জা তার কোথায় লুকিয়ে ছিলো? কাকা কাকিমার সম্বন্ধটা ঠিক যে অন্যান্য সম্পর্কের বাইরে এটা সে বুঝেছিল, মেনেও নিয়েছিলে। কিন্তু একজন মানুষের সঙ্গে তারও ঠিক সেই সম্বন্ধ হওয়া যে কেমন, তার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি তার অপরিণত বালিকা চিত্তে একটা নাড়া দিলো, চুপ ক'রে ব'সে রইলো জলের দিকে তাকিয়ে।

একটু পরে অরুণ বললে, 'কী হ'লো? রাগ নাকি?'

'তুমি ও-রকম যা-তা বলো কেন?'

'যা-তা কী—এমনও তো হ'তে পারে যে তোমার কাকিমার সঙ্গে তোমার কাকার যা সম্পর্ক, আমার সঙ্গেও তোমার সেই সম্পর্ক হ'লো।'

ঝুন্টিকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে অরুণ বললে, 'আমার কথা তুমি বোঝো নি?'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছো?'

'বলবো না।'

'বলো না!'

'না।'

'বলো না লক্ষ্মীটি—' অরুণ ঝুন্টির হাতের উপর নিজের হাত রাখলো।

ঝুন্টি হঠাৎ এক ঝট্‌কায় হাতছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'বিয়ে আমি করবোই না কোনো দিন।'

'আমাকেও না?'

'না।'

তাহ'লে তো ভারি মুশকিল দেখছি।' দুষ্টু হাসিতে অরুণের সুন্দর মুখ ঝলমল ক'রে উঠলো, আর ঝুন্টি দারুণ বিচক্ষণের মত ব'সে-ব'সে চিন্তা করতে লাগলো, বিয়েতে অনুমতি দেবে কিনা, এই বোধ হয় তার সমস্যা। খানিক পরে ভয়ানক দুঃখের সুরে বললে, 'ছাখো কাকা আমাকে বায়োস্কোপ দেখাবেন ব'লে ঢাকা নিয়ে এলেন, তা তো দেখালেনই না, এদিকে মামাবাড়িতে ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন। মন টেঁকে আমার? তুমিই বলো—না পারি বাইরে বেরুতে, না পারি দৌড়তে—না ঘুড়ি, না লাট্টু—ওখানে আমাদের শ্রীপুরে আমি কত সুখে ছিলাম। সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছি, কাঁচা আম খেয়েছি, কড়ি খেলেছি, আর এখানে কী বলব তোমাকে, আমি মরে যেতাম আর দুদিন থাকলে। দুপুর বেলা মামা থাকেন আপিশে, সন্ধ্যা আর আরতি-দি তো স্কুলেই যায়; এক মামিমা আর আমি—মামিমা ঘুমুতেই দোর খুলে বেরিয়ে এসেছি। ভালো করিনি?'

'নিশ্চয়ই! তা নইলে আমার সঙ্গে দেখা হ'তো কেমন ক'রে?'

'সেই তো!' ঝুন্টি সায় পেয়ে একেবারে গলে গেলো। একটুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললে, 'আচ্ছা তুমি সাঁতার জানো?'

'নিশ্চয়ই।'

'ক' রকম জানো?'

'আমি? আমি ডুব সাঁতার জানি, মরা ভাসতে জানি, চিৎ সাঁতার জানি, শিখিয়েও দিতে পারি তোমাকে।'

'দেবে?'

'তা আর কী ক'রে হবে বলো।' ভারী এক দুঃখের ভঙ্গী ক'রে অরুণ বললে, 'তুমি তো মোটে আমার কথায় রাজিই হ'লে না, তা নইলে কী মজাটাই যে হ'তো! ছবি দেখাতাম, সাঁতার শেখাতাম, তারপর—'

অবাক হ'য়ে ভুরু কুঁচকে ঝুন্টি বললে, 'কী আবার রাজি হলাম না!'—ব'লেই তক্ষুণি কী কথা মনে হ'লো আর সঙ্গে-সঙ্গে সংঘাতিক জোরে অরুণের হাতের উপর এক চিমটি কাটলো সে।

অরুণ উহুঁ ব'লে হাত বুলুতে লাগলো সে জায়গায়, আর ঝুন্টি মুখ ফিরিয়ে বসলো তার উল্টো দিকে।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। এদের গুণগুণ কথায় ঈর্ষা কাতর যাত্রীরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ বসেছে গিয়ে ছইয়ের উপরে—কেউবা মশা চাপড়াচ্ছে অধীরভাবে।

কৃষ্ণপক্ষ, সাংঘাতিক অন্ধকার, মাঝিরা একটা কালি পড়া লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখলো অরুণের মুখের সামনে।

একটু পরে অরুণ বললে, 'ও মাঝি, লণ্ঠন জেলেছো কেন, খামকাই তোমার তেল খরচা হচ্ছে।'

'কর্তা নাকি অন্ধকারে রইবেন।'

'অন্ধকার ভালো হে, এ আলো তুমি সরাও মুখের কাছ থেকে।'

মাল্লা হাঁকলো, 'ও মাঝি ভাই লণ্ঠন নি কারো দরকার আছে, জিগাও তো', তারপর উত্তরের অপেক্ষা না-করে লণ্ঠনটা যথা সম্ভব কমিয়ে এক কোণে রেখে দিলো!

আলো সরলে অরুণ ঝুন্টির হাত ছুঁয়ে বলল, 'ঘুমুবে?'

'হুঁ', মাঝিদের তোরঙ্গে ইতিমধ্যেই সে মাথা এলিয়ে দিয়েছিলো।

অরুণ নিজের সুট্‌কেশ খুলে খান দুই ধুতি আর পাঞ্জাবি বার ক'রে একটা তোয়ালে জড়িয়ে বালিশের মতো পাকিয়ে নিজে যথা সম্ভব কুঞ্চিত হ'য়ে ব'সে বললে, 'এই যে এখানে শোও—ওখানে মাথা রেখো না, ভারি ময়লা।'

ঝুন্টি ভদ্রতা জানে না—ভূমিকা না-ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে শুলো, তারপর বললো, 'গ্যাখো, কাকি বলেন, আমার মাথায় নাকি যত রাজ্যের নোংরা, তাইজন্যে কারো বালিশে আমাকে মাথা রাখতেই দেন না। তা তোমার তো এ-সব পরবার কাপড়—'

অরুণ হেসে ফেলল, 'তোমার কাকি তো ভারি দুষ্টু, এমন সুন্দর পশমের মতো চুলে নাকি আবার ময়লা থাকে। কই দেখি', অরুণ ভয়ানক বেশিরকম

নিচু হ'য়ে অন্ধকারে চুলের ময়লা পরীক্ষা করতে লাগলো হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে। আর ঝুন্টি আরামে গভীর ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়লো।

রাত প্রায় সাড়ে আটটায় গহনা এসে পৌঁছলো শ্রীপুরে। অরুণ তাড়াতাড়ি ঠেলা দিয়ে তুললো ঝুন্টিকে, তারপর বোসের ঘাটে নৌকো রাখতে ব'লে নেমে পড়লো তার হাত ধ'রে।

বোসের ঘাট থেকে বড় জোর মিনিট তিনেকের পথ ঝুন্টিদের বাড়ি। মাঝে একটা সাঁকো পার হ'তে হয়। গ্রাম এর মধ্যেই নিশুতি হয়ে গেছে। ঝুন্টির অন্ধকারকে ভারি ভয়। এত রাত্রে সে বাইরে বেরিয়েছে, এ অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম, ভয়ে সে অরুণের হাত আঁকড়ে রইলো।

'ভয় করছে?'

'হুঁ।'

'যদি আমি না আসতাম কী হতো?

'রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বলতুম।'

তা হ'লে বুঝি ভয় থাকে না?

'উহুঁ।'

'তা এখন বলোনা।'

'তুমি তো আছো।'

'আমি চলে যাই।'

'ইস!'

'ইস্ কী, তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাবো?'

'যাবেই তো।'

অরুণ অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে পথ দেখতে দেখতে আসছিলো—ওর কথা শুনে বাঁ হাতে ওকে কাছে জড়িয়ে এনে বললো, 'ভারি তো আহ্লাদি—' তারপর টর্চ নিবিয়ে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'তুমিতো রথীবাবুর বাড়ি যাবে, ঐ তো তোমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তোমাকে বাড়ির কাছে দিয়েই আমি চলে যাবো।'

'তোমাকে দেবোই না যেতে।'

অরুণ হাসলো। বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতেই ঝুন্টি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে দরজা ধাক্কাতে লাগলো, 'কাকি, দোর খোলো আমি ঝুন্টি—'

ঝপ্ ক'রে খুলে গেলো দরজা—আর ঝুন্টি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো কাকির বুকের উপর। অভিমানে সে কেঁদে ফেললো।

রথী তার মনিব পুত্রকে দেখে থ হ'য়ে রইলো খানিকক্ষণ। অরুণ বললো, 'ইনি একাই আসছিলেন, আমাদের দেশবাসীরা তেমন ভদ্র নয় তাই আমাকে রাস্তায় এঁর ভার নিতে হ'লো। আচ্ছা আজ আসি।' পা বাড়াতেই রথী অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে ওর দু হাত জড়িয়ে ধরল, কথা বলতে পারলে না। ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গেই।

হরিশবাবুর একমাত্র পুত্র এই অরুণকুমার। কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। একুশ বছর বয়েস। এম. এ. পড়ছে। বাপের স্নেহের অন্ত নেই এই সন্তানের প্রতি—মুক্ত হস্তে তিনি টাকা খরচ করেন মনের আনন্দে। গ্রীষ্মের ছুটিতে তার আসবার কথা, মা বাবা পথ চেয়ে দিন গুণছেন। নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে অরুণের মাথায় অনেক চিন্তা ভিড় ক'রে এলো। আসবার আগে টেলিগ্রাম ক'রে আসবে—প্রতিবারই তার মা-বাবা একথা কথা ছিলো লেখেন, প্রতিবারই সে এর ব্যতিক্রম ক'রে থাকে, কেননা সে আসছে জানলেই বাড়িতে ওঁরা এমন একটা ঢাক ঢোল আর বিশেষ ব্যবস্থা করেন যে ভীষণ বিশ্রি লাগে তার। ঢাকা এসেছে সে তিনদিন আগে বন্ধুর বাড়ি। এর আগে কখনো এমন জনগণে মিশে সে গহনার নৌকোর যাত্রী হ'য়ে আসেনি—এবার নেহাৎই একটা শখে উঠে এসেছিলো। কিন্তু যোগাযোগের কথাটা ভেবে অরুণের হৃদয় আবেশে মুগ্ধ হয়ে গেলো।

বাড়ি পৌঁছতেই মা-বাবা অবাক হ'য়ে গেলেন। ভৎর্সনা করলেন খবর না দিয়ে আসবার জন্য। অরুণ হাসিমুখে অপরাধ স্বীকার ক'রে মাকে আদর করলো। কথাবার্তায় খেতে-টেতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। যখন শুতে গেলো তখন রাত প্রায় বারোটা। কিন্তু শুতে গিয়ে অরুণের ঘুম এলো না। কী এক মধুরতায় সমস্ত মন আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলো।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে তার অনেক দেরী হ'য়ে গেলো। রোদ

বেশ চড়ে উঠেছে—চা খাচ্ছিলো ব'সে এমন সময় পুজো সেরে মা এলেন ঘরে—'হ্যাঁরে অরু, এ সব কী শুনছি? কালকে নাকি তুই গহনার নৌকোয় ম্যানেজারবাবুর ভাইঝিকে নিয়ে এসেছিস? সকালবেলা উঠে তো আর কান পাততে পারছি না।'

'কেন বলো তো?'

'যা-তা বলছে লোকেরা। মেয়েটাও বাবা যা হয়েছে!'

'কেন মেয়েটি তো বেশ ভালোই।'

'তুই বলিস ভালো? ও দস্যি মেয়ে কখনো ভালো হয়?' অরুণ হাসলো। মা বললেন, 'মেয়েটাকে আমি দেখেছি একবার—দেখতে কিন্তু ভারি মিষ্টি। কিন্তু মা-বাপ নেই—শাসন নেই, একেবারে বুনো হ'য়ে গেছে।'

'তুমি এনে মানুষ করো না।'

'মরণ দশা! শুনেছি ম্যানেজারবাবুর স্ত্রীর নাকি ও নয়নের মণি, তাই জন্মেই তো আহ্লাদে-আহ্লাদে অমন হয়েছে।'

'তবে তো একটু শাসন দরকার, আমি তো ভাবছি তার ভারটা তোমাকেই নিতে বলব।'

চকিতে মা চোখ তুলে তাকালেন ছেলের দিকে।

একটু পরেই প্রসঙ্গ পরিরর্তন ক'রে বললেন, 'খোকা, আমি ভাবছি এবার তোকে যেমন ক'রে পারি বিয়ে করাবোই, আর তোর অমত শুনবো না।'

'ভালোই তো।' অরুণ হাসলো।

'তবে তুই বিয়েতে রাজি হচ্ছিস? মেয়ে দেখবি?'

'মেয়ে তো দেখেছি।'

'কাকে দেখেছিস?'

'কেন সেই দস্যি মেয়েকে—যাকে শাসন করবার ভার নেবে তুমি।'

মা খানিকক্ষণ কথা বললেন না—ভালো ক'রে ছেলেকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। তাঁর ছেলের মন! সে মন যা গ্রহণ করে তাতে তাঁর বিশ্বাস ছিলো।

সেদিনই বিকেলবেলা তিনি দাসীকে দিয়ে খবর পাঠালেন, কাছারিতে ম্যানেজার যেন যাবার আগে অবশ্য তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যান।

খবর পাওয়া মাত্র রথী ব্যস্ত হ'য়ে তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো। বুক কাঁপতে লাগল তার। সে জানে যে সামাজিক অপরাধে তার কন্যা অপরাধী, এর শাস্তি অবধারিত। কাছারিতে আসতেই আজ তার ভয় করছিলো, কিন্তু ভাগ্যক্রমে হরিশবাবু আজ বিশেষ প্রয়োজনে গ্রামান্তরে গেছেন, রাত্রের আগে ফিরবেন না, কিন্তু অন্দর থেকেও যে আগুন জ্বলে উঠবে এটা সে ভাবেনি। মনে মনে নিজের স্বপক্ষে জবাব ঠিক করতে করতে কুণ্ঠিত পায়ে দাসীর সঙ্গে অন্দরে এসে দাঁড়ালো।

ঘরের দরজার কাছে আসতেই অরুণের মা মাথার কাপড় ঈষৎ টেনে দিলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'আসুন ভিতরে।'

রথী ভিতরে এসে বসতেই তিনি দাসীকে ইঙ্গিত করলেন। দাসী সরে গেলে বললেন, 'ম্যানেজারবাবু, বিশেষ প্রয়োজনেই আপনাকে ডেকেছি। শুনেছি আপনার একটি পিতৃ-মাতৃহারা ভাইঝি আছে, তাকে নিয়ে পাড়ায় নানারকম জনরবও শুনি—মেয়েটিকে আমি একবার দেখতে চাই।'

'অবশ্যই নিয়ে আসব।' রথী বিনয়ে লজ্জায় হাতে হাত ঘষতে লাগলো, তারপর একটু সামলে নিয়ে বললে, 'আপনি হয়তো কালকের ঘটনা শুনেছেন, অরুণবাবুর দয়ায় আমার মেয়ে আমি ফিরিয়ে পেয়েছি—সে ঋণ আমি সমস্ত জীবনেও শোধ করতে পারব না।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি সেকথা, আপনি পারলে আজকেই একবার নিয়ে আসবেন তাকে।'

'অবশ্যই—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।'

রথী নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে বাড়ি এলো। বাড়ি এসে দেখলো ঊষা ট্রাঙ্ক গোছাচ্ছে, আর ঝুন্টি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখছে। রথী উৎফুল্ল মুখে বললো, 'ঊষা ব্যাপার কি বুঝলাম না—জমিদার-গিন্নী একবার ঝুন্টিকে দেখতে চেয়েছেন। সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দাওতো, আমি চা খেয়েই নিয়ে যাবো।'

ঊষা বিমর্ষ মুখে বললো, 'ছাখো, আজকে আমাদের খাবার জল রিজার্ভ ট্যাঙ্ক থেকে আনতে দেয়নি—ও জল আমরা ছুঁতে পারব না—আমিতো কালই চলে যাচ্ছি ঝুন্টিকে নিয়ে, কিন্তু তোমাকে ওরা কী করবে কে জানে।'

'তুমি কিছু ভেবো না—তোমাদের তোমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে আমি একবার এদের দেখে নেবো। তুমি চট্‌পট্ ওঠো তো।'

বাক্সের ডালা বন্ধ ক'রে উষা উঠে পড়লো। প্রায় একটা যুদ্ধ হ'লো তারপর মেয়েকে নিয়ে। মস্ত একটা মজার কাজ হচ্ছিলো। বাক্স ঘেঁটে কতো হরেক রকম জিনিস সে আদায় করছিলো কাকির কাছ থেকে, কতো-দিনের কতো পুরোণো বাক্স, সেন্টের শিশি, ভাঙা কাচ, আরো কতো কী—তার মধ্যে কিনা এই বেরসিক কাণ্ড? সাবান দিয়ে হাত পা মুখ ধোয়া, পাউডার মাখা, শাড়ি ছাড়া, জুতো পায়ে দেওয়া! তারপরে কার না কার বাড়ি বেড়াতে যাওয়া প্রায় কাঁদতে বাকী রাখলো ঝুন্টি। বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যে লেগে গেলো।

জমিদার বাড়ির দেউড়িতে ঢুকতেই দেখা হ'য়ে গেলো অরুণের সঙ্গে, 'আরে, আপনারা যে—' অরুণ বিস্মিত হ'য়ে গেলো। আড়চোখে তাকালো ঝুন্টির দিকে—রথী বললো, 'বেরুচ্ছেন নাকি? আপনার মা একবার আসতে বলেছিলেন।'

অরুণ ঠোঁট কামড়ালো এবার। মা-কে সে জানে। বললো, 'না, এই একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম—চলুন আপনারা।'

তাদের বসিয়ে অরুণ তার মা-কে ডেকে নিয়ে এলো। মা এসেই হাত বাড়ালেন ঝুন্টির দিকে, 'এসো তো মা।'

কাকার শিক্ষামতো ঝুন্টি এগিয়ে গেল কাছে—প্রণামও করলো লক্ষ্মী মেয়ের মতো। মা বললেন, 'ওমা, এ তো দেখছি বেশ লক্ষ্মী মেয়ে—এসো তো আমার সঙ্গে একটু'—অরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অরুণ, তুমি একটু কথা বলো ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে, আমি আসছি।'

অরুণ বুঝলো, মা এবার নাড়ি টেপা ডাক্তারি করবেন। ছেলের পছন্দের যাচাই আর কি। মনে মনে প্রার্থনা করলো, পরীক্ষায় যেন ঝুন্টি উত্তীর্ণ হয়। মা-কে জয় করাই সব। বাবা যে অন্দরে একান্তই মা-র ছায়া একথা আর কে না জানে।

ঝুন্টিকে নিয়ে অনেকক্ষণ পরে মা ফিরে এলেন প্রফুল্লমুখে—তারপর এলো খাবার। আদর-আপ্যায়নে রথীকে অভিভূত ক'রে ফেলে অবশেষে বললেন, 'ম্যানেজারবাবু, আমার ছেলেটির কাছে তো আপনি ঋণী—ঋণ শোধ করবার একটা উপায় আছে—আপনার মেয়েটি আমাদের দিন।'

'সেকী!' রথী প্রথমটা বুঝতেই পারলো না কথাটা। বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো অরুণের মা'র দিকে।

অরুণের মা বললেন, 'বেশ মেয়ে আপনার, আমার তো মেয়ে নেই-- আপনারও ছেলে নেই—'অরুণের মা অত্যন্ত সহজভাবে বললেন।

অরুণ মা-র ঔদার্যে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। অরুণের মা'র একটা বেজি ছিল—কোথা থেকে সেটা ছাড়া পেয়ে পিল্‌পিল্ ক'রে এসে লাফ দিয়ে উঠলো গিন্নির দ্রকালে, আর মুহূর্তে ঝুন্টি কাকা-কাকিমার সমস্ত শিক্ষা ভুলে, সভ্যতা ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওটা ধরবার জন্যে—বেজিটা ভয় পেয়ে তক্ষুনি নেমে ছুটলো ভিতরের দিকে; সঙ্গে সঙ্গে ঝুন্টিও বিদ্যুৎবেগে ছুটলো তার পিছন পিছন। রথীর মুখে দুর্ভাবনার ছায়া নামলো, আর অরুণের মার মুখ ভ'রে গেলো আনন্দে। এই দাপাদাপি তিনি কতকাল ভুলে আছেন। ছেলে তাঁর অকালপক্ক—মনেই পড়ে না কবে সে এমন ক'রে শেষ হুটোপুটি করেছিলো। বললেন, 'পাগলি'।

অরুণ এবার লজ্জা ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালো, 'আমি দেখিগে মা, ওটা আবার কামড়ে না দেয়।'

ঘরে ঢুকেই সে ছুটন্ত ঝুন্টিকে খপ্ ক'রে ধ'রে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে ঝুন্টি এক হাত জিব বের ক'রে ভয়ানক অপরাধীর মতো বললে, 'এমা, কী হবে?

'কী হ'লো?'

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কাকি ব'লে দিয়েছেন এখানে এসে লজ্জা করতে—'

'কী আর হবে, কিন্তু আমাদের পুকুর দেখেছো? এবার আমার কাছে সাঁতার শিখবে তো?'

'ধ্যেৎ!' ঝুন্টি মুহূর্তে লাল হ'য়ে উঠলো।

'শোনো'—অরুণ ওকে হাত ধ'রে টেনে যথাসম্ভব কাছে এনে বললে, 'তুমি খুশি হয়েছে? না, বলো, বলতে হবে—'

ঝুন্টির সলজ্জ মুখ সে তুলে ধরলো।

ও-ঘর থেকে মা ডাকলেন, 'ওরে, তোরা করছিস কী? ম্যানেজারবাবু এখন যাবেন।'

সুমিত্রার অপমৃত্যু

হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে একটা আর্তনাদ উঠলো—খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম পাশের বাড়ির সব ক'টি আলো জ্বলছে—লোকজন যেন বড়োই ব্যাকুল। লাফ দিয়ে উঠলাম, ত্রস্তে কাপড় ঠিক করতে-করতে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। শুনলাম শ্রীপতিবাবুর পাগল মেয়েটি গভীর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে ছাতে গিঁয়েছিল, তারপর সেই তেতলা ছাত থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে।

হতভাগিনীর এতদিনের চেষ্টা সফল হ'লো। নিশ্বাস ছেড়ে ঘরে এলাম, চোখের কোণ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। এই পাগলিনীকে আমি মনে-মনে ভালোবাসতাম। আমার পঁয়ত্রিশ বছরের অবিবাহিত জীবনকে এই পাগলিনীই আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল। আলো নিবিয়ে, দরজায় তালাচাবি বন্ধ ক'রে কোমরে গামছা বেঁধে বেরিয়ে গেলাম।

আমি আজ চার বছর শ্রীপ্রতিবাবুর প্রতিবেশী। প্রথম যেদিন এ-বাড়িটি ভাড়া নিতে আসি—দেখেছিলাম জানালার শিক ধ'রে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। তার ছবির মতো ভঙ্গি ও নিটোল নিখুঁত চেহারায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য, আর দ্বিরুক্তি না-ক'রে অতি তাড়াতাড়ি মুখোমুখি এ-বাড়িটি আমি ভাড়া নিলাম। কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটি পাগল। আমার জানালা খোলা থাকলে স্পষ্টই ওর ঘর দেখতে পাওয়া যেতো। ঐ ঘরটি ছেড়ে সে বড়ো একটা নড়তো না, আর বেশির ভাগ সময়ই ছোট্ট লোহার খাটটিতে শুয়ে থাকতো। মাঝে-মাঝে দেখতে পেতাম বিছানার তলা থেকে রাশি-রাশি কাগজ বার ক'রে অত্যন্ত মন দিয়ে পড়ছে। ওর ঐ ছিল বাতিক—সেই কাগজগুলোই ছিল ওর প্রাণ। বিছানার আশেপাশে ও কাউকে ঘেঁষতে দিতো না; একমাত্র ওর মা ছিলেন ওর পরম বিশ্বস্ত বন্ধু—তিনিই ওর বিছানা ঝেড়ে দিতেন। অত্যন্ত রুগ্ন ও দুঃখী চেহারার মানুষ ছিলেন তিনি। শুনেছিলাম প্রায় দশ বছর যাবৎ হার্টের অসুখে ভুগছেন।

শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'তে আমার দেরি হয়নি—কিন্তু পাগল সন্তান আর রুগ্ন স্ত্রীই তাঁর মন-প্রাণের সমস্ত রস নিঃশেষ ক'রে দিয়েছিলো, কাজেই তাঁর হৃদয়ে কোনো আনন্দ বা আশা ছিলো না—তাঁর কাছে গেলেই মনটা যেন আপনা থেকেই উদাস হ'য়ে উঠতো, মনে হ'তো যেন কোনো গোরস্থান বা শ্মশানে এসেছি।

মেয়েটির নাম ছিল সুমিত্রা। ওর মা বাবা সবাই মিতু ব'লে ডাকতেন। একমাত্র সন্তান, নিশ্চয়ই পরম যত্নের ধন। কিন্তু বাপকেও কাছে ঘেঁষতে দিত না—বিশেষতঃ বিছানার কাছে এলে এমন সাংঘাতিক চীৎকার করতো যে ভদ্রলোক বিহ্বল হ'য়ে পড়তেন। দুই চোখ বেয়ে তাঁর দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়তো। ঐ বিছানাটির মধ্যেই ওর যত আকর্ষণ লুকোনো ছিলো ব'লে ঘর ছেড়ে এক পা নড়তো না, বেশির ভাগ সময় শুয়েই থাকতো। মা ও শয্যাশায়ী, কাজেই পরিচর্যার ভার ছিলো একটি পরিচারিকার উপর। ঘরের ঐ কোণে—খাট থেকে সবচেয়ে দূরের কোণটিতে এসে সে খাবার রেখে যেতো। রেখে যেতো স্নান করবার জল, প্রয়োজনীয় টুকিটাকি সমস্ত, তারপর ও-ঘর থেকে ধ'রে নিয়ে আসতো রুগ্ন মা-কে ; তিনি একটি জলচৌকির উপর ব'সে ব'সে সব ক'রে দিতেন। মেয়েটির কথা বলবার একেবারেই অভ্যাস ছিলো না—চুপচাপ গম্ভীর ও বিষণ্ণ মূর্তি নিয়ে যখন সে ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়াতো তখন তাকে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন দেখাতো। হঠাৎ কোনোদিন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠতেও দেখেছি।

ওর প্রতিটি ভঙ্গি প্রতিটি কাজই আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো। মাঝে-মাঝে মনটা ব্যথায় ভ'রে উঠতো—মনে হ'তো শ্রীপতিবাবু যথেষ্ট চিকিৎসা করছেন না, কোনো কোনো সময় এ-কথাও কল্পনা করেছি যে আমি যদি ওকে বিবাহ করি তাহ'লে বোধ হয় ও সেরে যায়—দু' একবার এ-প্রস্তাব করবার জন্য বদ্ধপরিকরও যে না হয়েছি তা নয়, কিন্তু শ্রীপতিবাবুর কাছে গেলে আর মনে সে-ভাব রাখতে পারিনি।

আজ যখন আমার সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটলো—একটা গভীর নিশ্বাসে সমস্ত প্রাণমন আমার মথিত হ'লো। শ্রীপতিবাবু আমাকে দেখেই মুখ নিচু করলেন, উদ্গত অশ্রুকে যথাসম্ভব চেপে বললেন, 'চলুন, অভাগিনীকে

একবার শেষ দেখা দেখে নিন্।' শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে দোতলায় উঠে গেলাম। সেই ঘরে সেই খাটটিতে একখানা চাদর গায়ে শুয়ে আছে—মৃত মানুষ না, যেন গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন একটি ঘুমন্ত মানুষ। অত উঁচু থেকে প'ড়ে গিয়েও কোনো বিকৃতি হয়নি, কেবল নাকের দুপাশে দু'টি রক্তের রেখা কান পর্যন্ত গিয়ে চুলের মধ্যে মিশেছে। বালিশের উপর দিয়ে খোলা চুল ছড়িয়ে প্রায় মাটিতে নেমেছে—হাত দু'টি জোড় ক'রে বুকের উপর রাখা। মেঝের উপর সংজ্ঞাহীন রুগ্ন মা। আমি গিয়ে ওর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ালাম, নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলাম ঐ পূর্ণিমার চাঁদের মতো পরিপূর্ণ সুন্দর মৃত মুখখানার দিকে—তারপর অতি সন্তর্পনে ওর ঠাণ্ডা কপালটির উপর নিজের হাতটি ছোঁয়ালাম।

আস্তে-আস্তে রাত বাড়লো, প্রায় ভোর চারটার সময় বার করা হ'লো মৃতদেহ। বাড়িটি লোকে লোকে ভ'রে গিয়েছিল—শ্রীপতিবাবু বললেন, 'আপনার উপর রইল আমার স্ত্রীর ভার—শ্মশান থেকে ফিরে এসে যেন দেখতে পাই।' ব'লেই তিনি এবার বুকফাটা আর্তনাদে কেঁপে উঠলেন। আমি সস্নেহে ভদ্রলোকের পিঠের উপর হাত বুলিয়ে বললাম, 'সমস্তই নিয়তি—কিচ্ছু ভাববেন না ওঁর জন্য—উনি আমার মা।' ভদ্রলোক আবেগে একবার আমার হাত চেপে ধরলেন। উঠোন মুখরিত হ'য়ে উঠলো হরিধ্বনিতে।

ভদ্রমহিলাকে আমি পরিচারিকাটির সাহায্যে ধরাধরি ক'রে অন্য ঘরে নিয়ে এলাম। মাথায় জলের ঝাপটা দিলাম—পরিচারিকাটি শিয়রে ব'সে হাওয়া করতে লাগলো। আমি কিছুক্ষণ ব'সে ফিরে এলাম ঐ ঘরটিতে। খাট থেকে বিছানাশুদ্ধ ওকে তুলে নিয়ে গেছে—ঘরটি শূন্য—হাওয়ায়-হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস। ঘরময় রাশি-রাশি কাগজ উড়ছে—হঠাৎ মনে হ'লো এই তো ছিলো ওর পরম সম্পদ, খানিকটা অন্যমনস্ক হ'য়ে ও খানিকটা কৌতূহলবশত নিচু হ'য়ে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিলাম—কাগজটির উপর হাতে আঁকা একটি পরম সুন্দর মানুষের মুখ, তলায় লেখা 'তুমি'—আরো দু' একটা কাগজ তুললাম—মুক্তাবিন্দুর মতো পরিচ্ছন্ন সুন্দর হাতের লেখায় কাগজগুলো পরিপূর্ণ। পৃষ্ঠার নম্বর দেয়া আছে—সাগ্রহে সমস্ত কাগজ সংগ্রহ ক'রে আমি তার মধ্যে চোখ ডোবালাম। মুহূর্তে আমার মন নিবিষ্ট হ'য়ে উঠলো।

তাকে প্রথম দেখলুম সতীদির বিয়েতে। বরের বন্ধু। গেটে ফুলের মালা নিয়ে অভ্যর্থনার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলুম। সতীদির বাবা আমার মেশোমশায়—ভারি শৌখিন মানুষ, বললেন—সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে কে? সে করবে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা। সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্থান ঐ পরিবারে আমারই ছিল—তারপরেই মালতীদি (মেশোমশায়ের ছোটো মেয়ে)। আমরা দু'জনে দেবদারু পাতায় সাজানো গেটের দু' পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম বেলফুলের মালা নিয়ে—আচমকা চোখ পড়লো তার মুখের উপর—ক্ষণিকের জন্যে থেমে রইলো হাত আর চোখ—দেখলুম তার ছ'ফুট লম্বা নিটোল শরীর, বাঙালির তুলনায় অস্বাভাবিক ফর্সা রং, অপরূপ মুখাবয়ব। লম্বা হাতটি বাড়িয়ে মৃদু হেসে বললো, 'আমাকে বুঝি মালা দেবেন না?' ওঁর সেই হাসিতে উজ্জ্বল দৃষ্টি আমাকে লজ্জা দিল, ত্রস্তে মালাটি হাতে তুলে দিয়ে মুখ ফেরালুম। সেই রাত্রিতেই বিয়ের আসরে ওর সঙ্গে আমার আবার চোখাচোখি হ'লো—ভালো ক'রে আমার বিয়েই দেখা হ'লো না। রাত্রিতে শুতে গেলাম দুটোর সময়—ঘুম এলো না। ঐ মৃদুমধুর হাসিভরা মুখখানা ভেসে রইলো চোখের উপর।

পরদিন সকালবেলা একদল আত্মীয়ের সঙ্গে সে-ও এলো বাসি বিয়ে দেখতে—(না কি আমাকে দেখতে?) আমাদের নতুন বর সুধীনবাবু তাকে চেঁচিয়ে কাছে ডাকলেন—নাম শুনলাম সত্যেন। বলাই বাহুল্য, আমার মেশোমশায় দুপুর পর্যন্ত সবাইকে আটকে রাখলেন, কাউকেই না-খেয়ে যেতে দিলেন না। আমার সঙ্গে ওর আলাপ হ'লো। সুধীনবাবু বললেন, 'বুঝতেই পারছো সত্যেন, স্ত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে এমন একটি শ্যালিকাকে ফাউ পাওয়া কী সাংঘাতিক একটা ভাগ্যের ব্যাপার। সেই কথা আছে না—নন্দকুলচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার—আমারও এখন সেই দশা—ঐ শ্যালিকামুখচন্দ্রবিনা শ্বশ্রূকুল অন্ধকার—' আমি সুধীনবাবুর দিকে কটাক্ষ করলুম। ও আমার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে হেসে বললো, 'ভাগ্যবানের ভাগ্যেই শিকে ছেঁড়ে। তবু তো ভাগ্যকে অনেক ধন্যবাদ যে তুমি আমার বন্ধু আর তোমার ভাগ্যের ছিটেফোঁটায় আমার চোখও আপ্যায়িত হ'লো।'

এই হ'লো ভূমিকা। মানুষের ভালোবাসা আকর্ষণ করবার প্রধান উপকরণই হচ্ছে মানুষের চেহারা, তার উপর যদি তার চরিত্রও অনুকূল থাকে

তা হ'লে হয় সোনায় সোহাগা, উপরন্তু যদি সে লোক ধনী হয় তা হ'লে আর উচ্চবাচ্য করবারই কেউ থাকে না। সত্যেন এ-বাড়িতে অবারিত দ্বার পেলো। আমার মা মাত্রই এক সন্তানের জননী এবং সেটি আমি, অতএব তাঁর রুদ্ধ পুত্রস্নেহের ধারা সত্যেনকে অবিরল ধারায় সিক্ত করলো। বাবা এ-সব যুবক-টুবক একেবারেই পছন্দ করতেন না, আর আমার কোনো ভাই না থাকায় কোনো যুবকের সমাগমও ছিলো না, কিন্তু সত্যেনের বেলায় বাবা তাঁর গতানুগতিক মতিগতি একটু পরিবর্তন করলেন। স্বীকার না-করলেও বুঝতে পারলাম, সত্যেনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট পক্ষপাত আছে। শুনলাম ওর বাবা লাহোরবাসী, সেখানে তাঁর যথেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তি। বিলেত থেকে বছর খানেক হ'লো ঘুরে এসেছে, এখানে ব্যবসা করে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে আমার সঙ্গেই ওর দেখাশোনা হ'তো সবচেয়ে কম। ঠিক আজকালকার প্রথায় আমি মানুষ হইনি, কতগুলি অহেতুক লজ্জায় মন সর্বদাই আচ্ছন্ন ছিল। পুরুষমানুষ যে পুরুষমানুষই, এ-বিষয়ে এতই সচেতন ছিলাম যে সত্যেন এলেই মা-কে ডেকে দিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে হাঁফ ছাড়তাম। নিঃশব্দে হয়তো দু'টো পান দিয়ে গেলাম কিম্বা চা! সত্যেনও লাজুক ছিল ব'লে মুখোমুখি আলাপ আমাদের হ'তোই না। অথচ আমি জানতাম সত্যেন এখানে আমার জন্যই আসে, আমার অস্তিত্বেই সত্যেনের পরম আনন্দ। আমি যে এই বাড়িতে আছি সেজন্যেই এ-বাড়ির প্রতিটি অণু-পরমাণুও ওর কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠেছিলো।

বাবা খুব সেকেলে মানুষ। যাকে বলে একেবারে গোঁড়া হিন্দু। তিনি পরলোক মানতেন, দেবদ্বিজে তাঁর অগাধ ভক্তি। বিজাতীয় ছোঁয়াচ বাঁচাবার চেষ্টায় অস্থির থাকতেন। মা সে-সব পছন্দ করতেন না, এই নিয়ে তাঁদের প্রায়ই মতবিরোধ হ'তো। আমাকে ইস্কুলে পড়তে না-দেবার কারণও অনেকটা এই যে নানারকম ম্লেচ্ছভাবাপন্ন আজকালকার অসভ্য মেয়েদের সঙ্গে মিশে পাছে বিগড়ে যাই। মার শত ইচ্ছায়ও ফল হ'লো না, অবশেষে বাড়িতেই এক বৃদ্ধ মাষ্টারের উপর আমার বিদ্যাশিক্ষার ভার ন্যস্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লেন। অতখানি বয়সেও আমি কোনোদিন থিয়েটার বা সিনেমা দেখিনি। কাজেই বাড়ি থেকে বেরুবার পাটও আমাদের বড়ো একটা ছিল না। এর মধ্যেই একদিন আমাদের এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে মা-বাবাকে খবর পেয়েই

যেতে হ'লো। আমি রইলাম বাড়ি পাহারায় আর আমাদের পুরোনো বুড়ি ঝি লক্ষ্মীর মা রইল আমার পাহারায়।

সন্ধেবেলা এ-ঘরে ও-ঘরে ধূপ-বাতি দেখাচ্ছিলাম (এই পুরোনো প্রথাটিও বাবা বর্জন করতে দেননি, তাঁর ধারণা, যতই ইলেকট্রিকের আলো থাক না, সন্ধ্যাবেলা ধূপ আর প্রদীপ না দেখালে সে-বাড়িতে লক্ষ্মী থাকে না), পিছনে পায়ের শব্দে চম্‌কে মুখ ফেরালাম। যে-কথাটি এতক্ষণ ধ'রে মনের মধ্যে গুনগুন করছিলো, যে-ইচ্ছাটি মনের অবচেতনে ঘুরপাক খাচ্ছিলো, তাই মূর্তি নিয়ে এসে আমার পিছনে দাঁড়ালো। সত্যেনকে দেখেই মুখ নিচু করলাম। একটু ইতস্তত ক'রে দু'পা ঘরে ঢুকে বললো, 'ওঁরা কোথায় ?'

'বাড়ি নেই।'

'তা তো দেখছি—কোথায় গেছেন ?'

'শ্যামবাজার।'

'ও—'

আমার বলা উচিত ছিলো, 'বসুন,' কিন্তু কিছুই বলতে পারলুম না। সত্যেন বললো, 'তা হ'লে একটু বসি, না ? এতটা পথ এলুম—'

'বেশ তো—' সহজ হবার খুব একটা চেষ্টা ক'রে ঘরে আলো জেলে বসতে দিলাম। একটু চুপ ক'রে থেকে সত্যেন বললো, 'আপনি বসবেন না ?'

'চা ক'রে নিয়ে আসি।'

'আমি কি চা খাবার জন্মেই আসি ?'

বলতে লোভ হ'লো, 'তা হ'লে কী জন্মে আসেন ?' চেপে গিয়ে বললুম, 'তা কেন ? ভালোবাসেন, তাই।'

'চায়ের চেয়েও যা বেশি ভালোবাসি তা-ই তো এ-বাড়িতে আছে।'

চকিতে চোখ তুলেই নামিয়ে নিয়ে বললাম, 'আপনার বোধ হয় গরম লাগছে এ-ঘরে, একটা পাখা নিয়ে আসি।'

'আপনার আসল উদ্দেশ্যই দেখছি আমার কাছ থেকে পালানো,'—সত্যেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তার দরকার কী ? আমিই যাই।'

'কী আশ্চর্য '—একটা মোড়া টেনে ব'সে প'ড়ে আমি বললাম, 'হ'লো ? এবার বসুন।' বলাই বাহুল্য, সত্যেনকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হ'লো না। ব'সে বললো, 'আচ্ছা, আমাকে দেখলে কি একটা রাক্ষসশ্রেণীর জীব

ব'লে মনে হয়? তা নইলে প্রায় দু' মাস ধ'রে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, অথচ আজ পর্যন্ত একটি কথাও আপনি বলেন নি আমার সঙ্গে। আমার কোনো-কোনো সময় মনে হয় এখানে এসে আমি হয়তো আপনাকে যথেষ্ট অসুখী করি।'

অস্ফুটে বললুম, 'এ-সব কেন বলছেন? একমাত্র কথা বলাটাই কি সুখ অসুখের চরম লক্ষণ নাকি?'

'তা ছাড়া আর কী ভাবা যায়, বলুন? সত্যি বলতে, এ-বাড়িটি যে আমাকে এত আকর্ষণ করে তার প্রধান কারণই তো আপনার অস্তিত্ব—এ-কথা কি আপনি কখনো মনে করেন না?' লাল হ'য়ে উঠলুম। কাপড়ের আঁচলটা অনর্থক খুঁটতে-খুঁটতে বললুম, 'কী ক'রে জানাবো? আপনার মনের কথা তো আমার জানবার কথা নয়!'

'সে তো ঠিকই'—সত্যেন পরম দার্শনিকের মতো মুখ ক'রে ব'সে রইলো। চুপচাপ কাটলো খানিকক্ষণ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মুখ মুছতে-মুছতে বললো, 'সত্যি বড়ো গরম।'

'রাগ না করেন তো একটা পাখা নিয়ে আসি।'

'আমার রাগে কিছু এসে যায় নাকি?'

আমি হাসলাম।

আমাদের বাড়িতে ফ্যান ছিলো না, উঠে গিয়ে একটা হাতপাখা এনে হাওয়া করতে যেতেই বাধা দিয়ে বললো, 'ও কী, আমাকে দিন।'

'আমি করি না।'

'পাগল নাকি?'

এক হাতে আমার হাত ধ'রে অন্য হাতে পাখাটা কেড়ে নিয়ে বললো,—'আমাকেই বরঞ্চ সেই ভাগ্যটা দিন, আমিই হাওয়া করি, আপনি বসুন।'

ওর স্পর্শে আমার বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ ব'য়ে গেল। কথা বলতে পারলাম না। আস্তে-আস্তে হাতপাখাটা নাড়তে-নাড়তে মৃদু হেসে বললো,' রাগ করলেন নাকি? কী করবো বলুন—মনে-মনে সর্বক্ষণ এতই কাছের মানুষ ভাবি যে আপনাকে যে আপনি বলছি সেটা পর্যন্ত কানে অস্বাভাবিক ঠেকে। কথা বলছেন না যে?'

'কী বলবো?'

'বলবার কি কিছুই নেই ?'

'কতই তো আছে, সবই কি মুখে বলা যায় ?'

বলতে-বলতে হঠাৎ আমি বাইরে চ'লে এলাম। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। ঈশ্বর কি আছেন ? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি-কোটি প্রাণীর মনের কথা কি তিনি শুনতে পান ? যদি তাই হয় তবে আজ আমারও একটি প্রার্থনা রইলো তাঁর কাছে। তারপরে গেলাম রান্নাঘরে, বুড়ি ঝি একমনে তরকারি নাড়ছে খুন্তি দিয়ে। বললুম, 'একটু চা হবে, লক্ষ্মীর মা।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মা তাকালো আমার দিকে! বললাম, 'সেই সত্যেনবাবু এসেছেন, উনি খাবেন।'

'কখন এলো ? আমাকে ডাকোনি কেন ?' আমার বর্তমান অভিভাবিকা ভুরু কুঁচকে আমাকে জেরা করলো। আমি বললুম, 'এই তো—আমি দেখতে পেয়েই তোমাকে চায়ের কথা বলতে এলাম।'

'তাই বলো।' নিশ্চিন্ত হ'য়ে লক্ষ্মীর মা বললো—'চলো আমিও বসিগে ঘরের কাছে।'

সহসা ঘৃণায় আমার শরীর কণ্টকিত হ'য়ে এলো, বুঝলাম, এটা আমার মা বাবার টিপ। নিজের সন্তানকে এত অবিশ্বাসও এঁরা করতে পারেন ? কিন্তু এই যে আমি ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে আজ আমার সমস্ত মন ওকে দান করলাম তাকে ঠেকাবে কোন প্রহরী। হঠাৎ জেদ্ চাপলো, বললাম, 'তোমার গিয়ে বসবার কী হয়েছে ? তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন উনি ? চা ক'রে নিয়ে এসো, আমি ও-ঘরে গেলাম।'

লক্ষ্মীর মা হাঁ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, তারপর তরকারির কড়াই নামিয়ে কেট্‌লিতে জল ভরতে-ভরতে বললো, 'কী জানি বাবা।' আমি সে-কথায় কান না-দিয়ে চ'লে এলাম।

গভীর চিন্তায় সত্যেনের মুখ আনত। আমি যে ঘরে গেলাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে-কথা জানতেই পারলো না। সর্বদাই ওর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, আজ ওর কী হ'লো ? একটা নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলতেই আমার দিকে দৃষ্টি পড়লো। মৃদু হেসে বললো, 'এখন আমার নিশ্চয়ই ওঠা উচিত।'

'মা-র সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না ?'

'আজ থাক—'

'চা খেয়ে যান।'

'না, ইচ্ছে করছে না'—আড়মোড়া ভেঙে ও উঠে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ বললো, 'আচ্ছা, আপনি জাত মানেন ?'

আমি কিছু বলবার আগেই আবার বললো, 'আমি মানি না। উপর-ওয়ালা কেউ আছেন কিনা জানি না, যদি থাকেন তার নামে শপথ করছি আমি যদি মানুষকে তার জাত হিসেবেই গ্রহণ ক'রে থাকি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা না করেন। আমার ইচ্ছে হয় আপনার মধ্যেও যেন সে সঙ্কীর্ণতাটা না থাকে—' ওর উত্তেজনায় আমি একটু অবাক হলাম। বললাম, 'এ-সব কেন বলছেন ? কোনো কুসংস্কার যদি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রেই থাকে তা হ'লে সময়মতো না-হয় সেটার সংস্কার করা যাবে।'

'আপনার যোগ্যই জবাবটা হয়েছে। রাগ করবেন না—' মার্জনাভিক্ষার ভঙ্গিতে দুই হাত জোড় ক'রে বললো, 'আপনার বাবার মধ্যে এত জাতিবিদ্বেষ আছে যে কখনো কখনো মনে হয় এ-বাড়িতে বোধ হয় আমার আসাই উচিত নয়।'

'তাই যদি বলেন—' বাবার হ'য়ে খানিকটা কৈফিয়ৎ দেবার ভাষায় বললাম—'কোন মানুষটাই বা সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ? তফাৎ খালি বেশি আর কমে।'

'বেশি আর কমকে কি আপনি কম মনে করেন ? বেশিওয়ালারা যদি পেছিয়ে থাকেন একশো বছর আগে—তাহ'লে কমওয়ালারা আছেন পাঁচ বছর আগে।'

'তা এখন কী হবে, জাতিভেদ ঘুচে যাওয়া খুব সহজ নয়।'

'আমি তো সহজ কঠিনের কথা বলছি নে,—বলছিলাম ন্যায় অন্যায়ের কথা। আপনার কি মনে হয় না একটা মানুষকে তার জন্মের জন্যেই ঘৃণা করাটা একটা অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ?—আর যদি পাপ-পুণ্য মানেন তবে আমি বলবো তার চেয়ে বড়ো পাপ আর জীবনে কিছু হ'তে পারে না।'

আমি বললাম, আপনার কী হয়েছে জানি না—যে-সব কথা আপনি বললেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে আমার বাবার সংস্কার আমার মধ্যে মোটেও সংক্রামিত হয় নি।'

'সত্যি।' ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। স্বভাবসুলভ প্রফুল্লস্বরে

বললো, 'একবার চা খাওয়াবার একটা ক্ষীণ আশা দিয়েছিলেন ব'লে যেন মনে হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই, একটু বসুন—'

তাড়াতাড়ি চা ক'রে নিয়ে এলাম। চা খেতে-খেতে ওর স্বাভাবিক আনন্দ ফিরে এলো। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'অনুমতি করেন তো আজ যাই—কাল আসবো, কিন্তু দেখা হবে তো?'

'দেখা তো রোজই হয়।'

'ওকে যদি দেখা বলেন—' একটু হেসে উঠে দাঁড়ালো।

আমি গিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

এটা আমার বাবার পৈতৃক বাড়ি। বাড়িটি বড়ো না-হ'লেও খাঁচা নয়। আলাদা-আলাদা ঘর আমাদের তিনজনেরই ছিল। আর যে-টি আমাদের বৈঠকখানা ব'লে সাজানো ছিলো সেটি সমস্ত ঘর থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। আমাদের হ'লো কলকাতার খাঁটি বনেদি পরিবার—টাকাটা গেছে কিন্তু ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়েও চালটি কিছু কিছু আছে। অন্তঃপুরচারিণীদের বুঝি কেউ দেখে ফেললো এটা তাঁদের পক্ষে একটা নিতান্তই ভাবনার বিষয়। বৈঠকখানা ঘরটি আজকাল অমনি প'ড়ে থাকে, বাবার আড্ডা বাইরে। দশটা-পাঁচটা আপিশ করেন—ফিরে এসে খেয়েই বেরিয়ে যান তাসের আড্ডায়, কাজেই আমাদের বৈঠকখানা নামে মাত্র বৈঠকখানা, ও-ঘরটিতে এখন আমার পড়বার ব্যবস্থা হয়েছে।

এর পরে দু'দিন আর সত্যেন এলো না। সকালবেলা আমার যখন ঘুম ভাঙতো কেমন একটা প্রত্যাশায় ভ'রে উঠতো মনটা। প্রতি মুহূর্তে আমি চমকে চমকে উঠতাম। সময় আমার পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ হ'য়ে গেল। রাত্রিতে যখন সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ হ'য়ে যেতো তখন হৃদয়ভরা জোয়ার আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো অকূলে। ভয়ে আনন্দে আমি বুকের মধ্যে হাত চেপে অভিভূত হ'য়ে থাকতুম। আমি শুনেছিলাম আজকাল অনেক জায়গাতেই ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করছে, কিন্তু সে ছিলো আমার পক্ষে একটা কল্পনার বিষয়। ও-রকম অসভ্য ঘটনা যে সত্যি-সত্যি ঘটতে পারে এ-কথা আমার মা বাবা অনেক বিশ্লেষণ ক'রেও বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারেন নি। অথচ

এ-বাড়িতেই যদি কোনো দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়, তাহ'লে? দুশ্চিন্তায় আমার সমস্ত রাতের সব ঘুম কোথায় উড়ে যেতো। বারে-বারে উঠে জল খেতাম আর পাখা দিয়ে হাওয়া করতাম নিজেকে।

হঠাৎ তৃতীয় দিন দুপুরবেলা সত্যেন এলো। বাবা গেছেন আপিশে—মা ঘুমিয়েছেন, আমি বৈঠকখানায় নিজের পড়ার টেবিল গুছোচ্ছিলাম। মৃদু-মৃদু কড়া নাড়বার শব্দে কান খাড়া রেখে বললাম, 'কে?'

'আমি।'

কণ্ঠস্বর শুনে বুকের মধ্যে একটা দ্রুত স্পন্দন অনুভব করলাম। নিশ্বাস ঘন হ'য়ে উঠলো—ত্রস্তে গায়ের কাপড় ঠিক করতে-করতে দরজার ছিট্‌কিনি খুলে দিয়ে বললাম, 'এই অসময়ে?'

গ্রীষ্মের দুপুর। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘাম মুছতে মুছতে বললো, 'উঃ পুড়ে গিয়েছি, এক গ্লাশ জল দেবেন?'

ওর ঘর্মাক্ত টুকটুকে মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যি কষ্ট হ'লো। ঘরের কোণে কুঁজো ছিল, এক গ্লাশ জল এনে টেবিলের উপর রেখে বললুম, 'এই রোদ্দুরে নাকি মানুষ বেরোয়!'

'না-বেরুলে কি আপনার সঙ্গে দেখা হয়?'

'সকালে বিকেলে কি আমি বাড়ি থাকি না?'

'থাকতে পারেন—আমি তো দেখতে পাইনে।'

'কী ক'রে জানলেন আমার সঙ্গে দেখা করবার এটাই উৎকৃষ্ট সময়?'

সত্যেন হাসলো, বললো, 'সত্যি বলতে এইমাত্রই এ-কথাটা জানলাম, কেননা দু'দিন আমি অসুস্থ ছিলাম, আসতে পারিনি, আজ খানিক আগে মনে হ'লো, বেশ তো ভালো আছি—আর এ-কথা মনে হওয়া মাত্রই ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবি টেনে গায়ে দিলাম, তারপর সোজা এখানে। আর আসামাত্রই আপনাকে দেখতে পেলাম।'

অসুখ শুনে একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললাম, 'ছি ছি, ঐ শরীর নিয়ে রোদ্দুরে বেরুনো মোটেই উচিত হয়নি। আর কখনো ও-রকম করবেন না—'

'তথাস্তু! কিন্তু নতুন কোনো অসুখ আমার আর শিগগির হবে না—এ আপনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারেন।'

হঠাৎ আমার লক্ষ্য হ'লো যে ও এখনো পর্যন্ত জলের গ্লাশটা হাতেই ধ'রে আছে—হেসে বললুম, 'জলটা খেয়ে নিন।'

'দেখেছেন, কী আশ্চর্য, এখানে এসেই এত ঠাণ্ডা হয়েছি যে যে-জলতেষ্টায় আমার কেবল প্রাণটাই বেরিয়ে যেতে বাকি ছিলো সেই তেষ্টা পর্যন্ত মিটে গেছে।' ঢকঢক ক'রে সমস্ত জলটা একসঙ্গে খেয়ে নিয়ে ঠাশ ক'রে গ্লাশটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনার ভগ্নীপতি সুধীনবাবু যে দিল্লী বদলি হচ্ছেন, জানেন?'

'না তো।'

'আমাকেও নিয়ে যেতে চাইছেন।'

'কেন?'

'ওর ধারণা এখানে আমি কেবল একটা ব্যবসার অছিলা নিয়ে আছি, আসলে কিছুই করছি না—ওখানে একটা চাকরির সন্ধান দিয়েছে ও।'

'বেশ তো।'

'যাবো নাকি?'

'এই দুর্দিনে একটা চাকরি কি অবহেলার যোগ্য?'

'ওরে বাবা, আপনি যে একেবারে গুরুজনের মতো কথা বলছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন যে পৃথিবী উল্টে গেলেও আমি আর কলকাতা ছাড়তে পারি না।'

হঠাৎ আমি গরম বোধ করলাম। মনে হ'লো কান দুটো যেন জ্ব'লে যাচ্ছে—কিছু জবাব না-দিয়ে হাত-পাখাটা নাড়তে লাগলাম।

'অসময়ে এলাম ব'লে রাগ করেননি তো?' আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখেই বোধ হয় বললো কথাটা। আমি হঠাৎ ক'রেই বললাম, 'রাগ করলেও কি আপনি তা শুনবেন?

'বা রে, আপনি দেখছি আমাকে বেশ প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কিন্তু আমি দিল্লী যাবো কি যাবো না তা তো কিছু বলছেন না।'

'এর মধ্যে আমার কি কিছু বলবার আছে?'

'একমাত্র আপনারই তো আছে।'

'আশ্চর্য।' আমি অন্য প্রসঙ্গ তোলবার অভিপ্রায়ে বললাম, 'মা

ঘুমুচ্ছেন—একটু পরেই বোধ হয় উঠবেন। আপনার যাবার তাড়া আছে ?'

'তাড়া তো আপনিই করছেন দেখছি। বিরক্ত বোধ করলে আমি নিশ্চয়ই উঠে যাবো', হঠাৎ চেয়ার ঠেলে শব্দ ক'রে ও উঠে দাঁড়ালো।

দু'পা এগুতেই আমি বললাম, 'এই রোদ্দুরে আবার এক্ষুনি ফিরে যাবেন —তারপর যদি কোনো অসুখ-বিসুখ করে তাহ'লে কি আমি দায়ী হবো নাকি ?'

'অসুখ বলতে আপনি দেখছি কেবল শরীরটাই বোঝেন।'

'যাই বুঝি না কেন—আপনি রোদ না-পড়লে যাবেন না এই আমার অনুরোধ।'

আমার কথায় গ্রাহ্য না-ক'রে সত্যেন বললো, 'আমার ভালো লাগছে না বেশি, কোনোরকমে বাড়ি গিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচি এখন। অনর্থক এলাম, আপনাকে বিরক্ত করলাম—'

'বিরক্ত হয়েছি এ-কথা তবুও বলবেন ?'

'বলবো না ?'

'না।'

'সত্যি ?'

'জানি না—' আমি রাগ ক'রে মুখ ঘোরালাম। সঙ্গে-সঙ্গে ধাঁ ক'রে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বললো, 'বা, কথায়-কথায় এরকম রাগ করলে চলে নাকি ?'

আমি চমকে উঠলাম। আমার স্তম্ভিত ভাব দেখে হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলো। হাত উঠিয়ে নিয়ে অত্যন্ত মৃদু গলায় বললো, 'মাঝে মাঝে নিজেকে একেবারেই সামলাতে পারি না। তোমাকে বলাই ভালো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

আমি আরক্ত হ'য়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর আস্তে-আস্তে ঘর থেকে চ'লে এলাম। মা-র ঘরে এসে দেখলাম, তিনি হাতে মাথা রেখে অকাতরে ঘুমুচ্ছেন, খাটের নিচে আঁচল পেতে নাক ডাকাচ্ছে লক্ষ্মীর মা। খানিকটা যেন স্বস্তি পেলাম। কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢেলে মুখে ঝাপটা দিলাম, মাথার উপর হাতটা রেখে দেখলাম সেখান থেকে

যেন আগুন বেরুচ্ছে। অনেকক্ষণ ভেবে পেলাম না এ-জন্যে সত্যেনকে ক্ষমা করবো কি করবো না, তারপর একসময়ে যন্ত্রের মতো আবার গেলাম ও-ঘরে, ততক্ষণে সত্যেন বোধ হয় অর্ধেক পথ চ'লে গেছে। ঘরে গিয়ে যেখানটায় ও বসেছিলো, সেখানটায় বসলাম একবার, একবার উঠলাম—অত্যন্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ মনে হ'লো এর চেয়ে বড়ো সুখ পৃথিবীতে আর কী আছে? সমস্ত শরীর বিহ্বল হ'য়ে এলো—দুই চোখ জলে ভ'রে গেলো, দু'হাত মুচড়ে-মুচড়ে নিজেকে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম।

পরের দিন সকালবেলা এলেন সুধীনবাবু। ভদ্রলোক আসেন খুবই কম—মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন জামাইয়ের পরিচর্যায়—বাবার সময় ছিলো না, তবুও আপিশে যাবার সেই ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি হঠাৎ সুধীনবাবুকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমার মনের মধ্যে অনেক কথার ঢেউ ব'য়ে গেলো।

একটা আশার বিদ্যুৎ যেন আমাকে আড়ালে কান পাততে প্ররোচিত করলো। বাবা বললেন, 'মিতুর এবার বিয়ে দিতে চাই।'

'খুব ভালো কথা, অত সুন্দর মেয়ে, তার আর ভাবনা কী?'

'বিয়ের প্রস্তাব কিন্তু তোমাকেই করতে হবে।'

'আমাকে!'—আশ্চর্য হ'য়ে সুধীনবাবু বললেন, 'আমি কার সঙ্গে প্রস্তাব করবো?'

'তোমারই তো বন্ধু সত্যেন।' আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। সুধীনবাবু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'সে হ'তে পারে না।'

'কেন? কেন হ'তে পারে না—তুমি কি মনে করো আমার মেয়ে ওর যোগ্য নয়?'

'সেজন্য নয়, মেশোমশায়—কারণটা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে এটুকু জানবেন যে এ বিয়ে হ'তে পারে না।'

নিশ্বাস ফেলে অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে বাবা বললেন, 'তা হ'লে আমি নিজেই তাকে ব'লে দেখবো'খন। ওর উপরে সত্যি আমার বড়ো মায়া পড়েছে।' সুধীনবাবু একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ও কি এ-বাড়িতে মাঝে-মাঝে আসে নাকি?'

'মাঝে-মাঝে বলো কী, ও তো প্রায় রোজই আসে। তোমার মাসিমা যে ওকে ছেলের মতো ভালোবাবেন।'

'মিতুর সঙ্গে দেখা হয় ?'

'খুব কম। মিতু যা লাজুক—ও আবার বেরুবে কারো কাছে।'

সুধীনবাবু বললেন, 'হুঁ।'

মা এসে বললেন, 'শ্বশুর জামায়ে কী এমন রাজকার্যের পরামর্শ হচ্ছে ? এসো সুধীন, একটু চা খাবে। মিতু ?'

'যাই মা,' ব'লে আমি পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। এর পরে যতক্ষণ সুধীনবাবু ছিলেন ওঁকে বেশ গম্ভীর মনে হ'লো। সহসা আমার মনে হ'লো আমার অন্তরায় একমাত্র মালতীদি। আমি জানি মালতীদিও সত্যেন সম্বন্ধে একটু দুর্বল। আর সুধীনবাবু যখন ওর নিজের ভগ্নীপতি তখন মালতীদির স্বার্থটাই তিনি বড়ো ক'রে দেখবেন। আমার বিবাহের প্রস্তাবে ওঁর আপত্তির একটা কারণ খুঁজে পেয়ে আর মালতীদির মতো সর্বগুণসম্পন্ন একজন মেয়েকে প্রতিযোগী পেয়ে আমার মনের মধ্যে ছোটোখাটো একটা বিপ্লব উপস্থিত হ'লো। ইচ্ছাশক্তির যদি সত্যিই কোন জোর থাকতো তা হ'লে সেই মুহূর্তেই সত্যেনকে দেখতে পেতাম এ-বাড়িতে। কিন্তু সে এলো না। সেদিন না, তার পরের দিন না, তার পরের দিনও না। আমি আর থাকতে পারলাম না। সেদিন ওকে যে ক'রে বিদায় দিয়েছিলাম, তারপর কি আত্মসম্মানসম্পন্ন কোনো মানুষ আর আসতে পারে ? নিজেকে সারারাত সারাদিন কত রকম ভর্ৎসনাই যে করলাম তার ঠিক নেই। অবশেষে মাকে বললাম, 'মা, ক'দ্দিন মাসিমার বাড়ি যাই না, চলো না আজ ঘুরে আসি—আজ তো রোববারই, বাবাই নিয়ে যাবেন।'

মা ঈষৎ চিন্তা ক'রে বললেন, 'সত্যি আজ গেলেও হয়, তোর বাবা তো আবার আড্ডায় বেরুলেন।'

আমার মন ছিলো সন্দেহে ব্যাকুল—সুধীনবাবুই যে চক্রান্ত ক'রে প্রত্যেক দিন ওকে মালতীদির কাছে নিয়ে যাচ্ছেন না তাই বা কে জানে। হাজার হোক, আমার সঙ্গে মালতীদির কোনো তুলনাই হয় না। ওরা মেলামেশা জানে—ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার জানে। আর আমি তো একটা কূপমণ্ডূক। বললাম, 'বাবা তো আর দিন কাটিয়ে আসবেন না, একটু না-হয় দেরিতেই যাবো।' আমি কথা বলতে-বলতে মা-র পিছন-পিছন রান্নাঘর ছাড়িয়ে উঠোনে এসে পা দিতেই থমকে গেলাম। দেখলাম, অত্যন্ত

বিধ্বস্ত চেহারায় সত্যেন এসে ঢুকলো বাড়িতে। যাকে নিয়ে মনে-মনে এত যন্ত্রণা তাকে দেখে সত্যি আমার হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। এত বড়ো একটা বিপদের সামনে যেন জীবনে এই প্রথম দাঁড়ালাম। চোখে চোখ পড়তেই মুখ নিচু করলাম। মা পিছন ফিরে ছিলেন—অস্ফুটে বললাম, 'মা, স্থাখো।'

মুখ ফিরিয়েই মা খুশি হ'য়ে উঠলেন, 'এসো, এসো, কদ্দিন তোমার দেখা নেই। মাসিমাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে ?'

'না, মাসিমা, আমার স্মরণশক্তির অত দুর্নাম দেবেন না। সময়ই পাইনি কদ্দিন—আর দেখাশোনার তো আজই শেষ।'

আমার বুকের মধ্যে ধড়াশ ক'রে উঠলো। মা বললেন, 'তার মানে ?'

'আমি তো পর্শুদিন সুধীনের সঙ্গে দিল্লি যাচ্ছি। একটা চাকরি নিলাম।'

সত্যেন আড়চোখে আমার দিকে তাকালো।

'চাকরি পেলে ? সে তো খুবই সুখের কথা। তাই ব'লে দেখা হবে না কেন ? আবার নিশ্চয়ই আসবে।'

'কে জানে।'

মা বললেন, 'বোসো—আজ আর সহজে ছাড়ছিনে—একেবারে খেয়ে যাবে এখানে।'

'না, মাসিমা—আমায় আবার যেতে হবে অন্য জায়গায়।'

অন্য জায়গায় মানে তো মালতীদির ওখানে—মনে মনে আমি সুধীনবাবুর মুণ্ডপাত ক'রে সেখান থেকে ঘরে এলাম।

খানিক পরে মা এসে বললেন, 'তুই একটু যা মিতু ও-ঘরে—আমি মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে আসি—বেলা হ'লো, রান্না চাপাবো কখন ?'

আমাদের সংসারে এই আরেকটি প্রথা ছিলো—বাবা কখনো ঠাকুর-চাকরের হাতের রান্না খেতেন না। মা বেরিয়ে যেতেই অতি সন্তর্পণে আমি ও-ঘরে গেলাম। ঘরটি আমার বাবার বিশ্রামকক্ষ। হাত-পা ছড়াবার জন্যে একটি ডেক চেয়ার, ছোটো নিচু খাটে একটি বিছানা আর মোটা-মোটা তাকিয়া আর দু' একটি বেতের চেয়ার আছে ঘরটিতে। যারা নিতান্ত আপন হয়েছে এমন পুরুষমানুষরাই এ ঘরে এসে বসে। এসে দেখলাম একটা

খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছে। আমাকে দেখেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি বললাম, 'বসুন।'

'আপনি বসুন—' ওর মুখের ভঙ্গি ও আপনি সম্বোধনে আমি অবাক হলাম। এ-ক'দিনেই আমি ওর আপনি হ'য়ে গেলাম! ওর তুমিটি কে?

ব'সে বললাম, 'শুনলাম দিল্লি যাচ্ছেন।'

'তাই তো ঠিক হয়েছে।'

'ঠিক করবার কর্তাটি বোধ হয় সুধীনবাবু?'

'হ্যাঁ, সুধীনই বললো আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

'ও—।' মনে-মনে বললাম, সুধীন আর কী জপালো? আমার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য ক'রে বললো, 'আমার উপর আপনি রাগ করেছেন, বুঝতে পারছি। আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমার সেদিনকার অপরাধ মার্জনা করুন।'

'কোন অপরাধ?' আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আমাকে ভালোবাসা যে অপরাধ এ-বিষয়ে অবহিত হয়েছেন উনি? বুকের মধ্যে একটা জ্বালা বোধ করলাম।

মাথার চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে বললো, 'সত্য কথা মুখে বলাটাই অপরাধ। তা হ'লেই তা অসভ্যতার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়।'

'সত্য কথা!' আমার মুখ থেকে কথাটা যেন খ'সে পড়লো—ভাঙা গলায় বললুম, 'যা সেদিন সত্য ছিলো তা কি আজো সত্য আছে?'

'চিরদিন তা সত্যি হ'য়ে লুকিয়ে থাকবে আমার বুকের মধ্যে।'—সত্যেন হাতের মধ্যে মুখ গুঁজলো। আমি সভয়ে এদিক-ওদিক তাকালাম—তারপর উঠে এসে আস্তে তার কাঁধে হাত রেখে, বললাম 'শোনো—' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সত্যেন মুখ তুললো আমার দিকে—নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ —তারপর আমার হাতের উপর হাত রেখে আস্তে বললো, 'আর আমার ভয় কী!'

বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ পেলাম। ত্রস্তে স'রে এলাম ওর সান্নিধ্য থেকে—মৃদু গলায় বললাম, 'কাল দুপুরে এসো।'

বাইরে এসে দেখলাম, লক্ষ্মীর মা বাজার নিয়ে আসছে।

তারপরে সমস্ত দিন আমার লঘুপক্ষে ভর ক'রে কাটলো। স্নিগ্ধতায় আর প্রশান্তিতে সমস্ত শরীর মন আবিষ্ট হ'য়ে রইলো। আর পরের দিনের প্রত্যাশায় আজ থেকেই বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্পন্দন অনুভব ক'রে শিহরিত হ'তে লাগলাম।

পরের দিন ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় ছুটোর সময় ও এলো। আমি উন্মুখ হয়েই ছিলাম—দরজা খুলে দিয়ে বললাম, 'এসো।'

'মাসিমা ঘুমিয়েছেন?'

'অনেকক্ষণ।'—সত্যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসলো। আমি হাতপাখা এনে হাওয়া করতে-করতে বললাম, 'কষ্ট হয়েছে আসতে? বড়ো রোদ।'

'সমস্ত ক্লান্তি তো তুমিই দূর ক'রে দিলে—' হাত বাড়িয়ে বললো, 'পাখাটা দাও।'

'আমিই হাওয়া দিচ্ছি।'

'ভারি লজ্জা করছে, মনে হচ্ছে যেন জুলুম ক'রে সেবা নিচ্ছি।'

লজ্জিতমুখে বললুম, 'জুলুম ক'রে তো সবই নিলে—সেবাতেই বা অত আপত্তিটা কী?'

'জুলুম ক'রে বুঝি?'

'তা নয়তো কী—'

'জুলুম ক'রে না—' আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে।'

'তাই নাকি?'—আমি হাসলাম।

'এই বুঝি হাওয়া দিচ্ছো?'

জোরে-জোরে হাওয়া দিতে-দিতে বললাম, 'কতক্ষণ দেয়া যায়!'

'তা হ'লে দাও আমাকে!—তুমি যদি কখনো এ-রকম রোদ্দুরে পুড়ে আমার কাছে আসতে, আমি কী করতাম, জানো?'

'কী?'

'নিজের কাপড় দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিতাম—পাখা দিয়ে হাওয়া করতাম না, ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে দিতাম ক্লান্তি।'

আমি বললাম, 'ঈশ!' সত্যেন একটু চিন্তা ক'রে বললো, 'আমার তো কালকেই দিল্লি যাবার কথা—তার আগে একটা বোঝাপড়া দরকার।'

বোঝাপড়ার অর্থ আমি বুঝলাম। সংকুচিত হয়ে বললাম, 'সে তুমি বাবার সঙ্গে কোরো। বোঝাপড়ার জন্য তিনিও উৎসুক।'

'উৎসুক!'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'কিন্তু কিছুতেই তিনি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন না!'

'আমি বলছি, আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।'

'আচ্ছা ধরো, যদি উনি রাজি না হন—'

'হবেন, হবেন, হবেন—'

'কিন্তু ধরোই না, যদি না হন—'

'না হলে?' আমি ভেবে পেলাম না না-হ'লে কী করবো।

'না হ'লেও তুমি রাজি আছো তো?'

'আমার কথা তো তুমি জানো—'

'তাই ভালো—আর কারো কথা দিয়ে আমরা কী করবো—' পকেট থেকে একটি ছোট্ট কেস্ বের ক'রে সত্যেন বললো, 'এই আংটিটা আজ তোমাকে পরিয়ে দিলাম, কাল আবার আসবো এ-সময়ে—যদি আমাকে গ্রহণ না করো এটা ফিরিয়ে দিয়ো।'—আংটি পরিয়ে বুক-পকেট থেকে একটা চিঠি বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললো, 'আমি চ'লে গেলে অতি নিভৃতে এই চিঠিটা তুমি পোড়ো।'

তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি যাই। মন বড় ব্যাকুল।'

শক্ত ক'রে আমার হাত দু'টো একবার জড়িয়ে ধরলো, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। ওর ভাবভঙ্গিতে আমি ঈষৎ অবাক হলাম। আংটি-পরা আঙুলটির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ নিচু হ'য়ে নিজের আঙুলকেই চুম্বন করলাম। তারপর নীল পুরু খামটির মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা বের ক'রে পড়লাম।

'সুমিত্রা,

আমি আজ একটা গভীর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। হয় চির-অমৃত নয় চির-নরক। তোমাকে বলেছিলাম মানুষ মানুষই, জাতটাই তার পরিচয় নয়—আশা করি তা তুমি মর্মে গ্রহণ ক'রে আমাকে এই অতল থেকে উদ্ধার করবে। তোমাদের হিন্দু সমাজে জাতের ছোঁয়াছুঁয়িটা যে কী ভীষণ

পাপ সে-বিষয়ে তোমাদের একটু অবহিত হওয়া দরকার। আমার বাবা মুসলমান—আমার নিজের কোনো ধর্ম নেই। আমার পৈতৃক নাম ইয়ুসুফ, সবাই ডাকে সুফি।'

সুফি! মুসলমান!

ছি, ছি, আমি মুসলমানের প্রণয়ে আবদ্ধ? আমার হাতে থেকে থরথর ক'রে কেঁপে চিঠিটি খ'সে পড়লো। আমার মনের মধ্যে আমার সমস্ত পূর্বপুরুষ বিদ্রোহ ক'রে উঠলো; দুই হাত জোড় ক'রে বুকের উপর রাখলাম—যিনি সকলের অন্তর্যামী তাঁকে স্মরণ করলাম—তাঁর চোখে কী সত্যেন? মুসলমান! খৃষ্টান! হিন্দু! না মানুষ? আমি কি তাঁর চোখে অতি পবিত্র হিন্দু বংশোদ্ভূত শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী, না সত্যেনের মতোই কেবলমাত্র একটি মানুষ? আমি যাকে ভালোবাসি, সে কি ঐ মানুষটি নয়? সে কি ওর জাত? ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো—আমাকে শক্তি দাও ভালোবাসতে—অমি দুই হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠে দরজায় খিল বন্ধ ক'রে চিঠির বাকি অংশটুকু প'ড়ে ফেললাম।

'হয়তো যে-মুহূর্তে আমি সত্যেনের বদলে সুফি হবো সেই মুহূর্তে তোমার সমস্ত ভালোবাসা কর্পূরের মতো হৃদয় থেকে উবে যাবে। যদি তাই যায় তবে যাক—তা হ'লে বুঝবো যে মানুষের হৃদয়টাও একটা সংস্কারের সমষ্টি—সেখানেও সে চুলচেরা বিচার ক'রে তবে কাজ করে। তুমি হয়তো ভাবছো এ-ভাবে হিন্দু সেজে বিশ্বাসঘাতকতা করবার দরকার ছিলো কী! প্রথমটায় এ একটা নিছক ফাজলেমির থেকে শুরু, সুধীনই আমাকে অনুপ্রাণিত করে। সুধীন আমাকে অকৃত্রিম ভালোবাসে—ওর বিয়ের খবরে আমার চেয়ে কার বেশী আনন্দ হয়েছিলো! অথচ জাত আমাদের এতই আলাদা যে সে-বিবাহে হিন্দু না-সাজলে আমার কোনো অংশই থাকতো না। আমি রাজি হইনি—সুধীন বললো, 'নিশ্চয়ই তুই সত্যেন হবি। কেন, সত্যেন হ'তে তোর বাধা কী। বিয়েতে যাবি, একসঙ্গে খাবি—আটদিন ধ'রে আনন্দ করবি। মানুষের মিথ্যা সংস্কারের জন্য কি আমরা দায়ী? ও-রকম অবোধ যারা, মূর্খ যারা—মানুষকে জাত দিয়েই যারা বিচার করে, তাদের সঙ্গে ছলনা করলে কোনো পাপ হয় না। আর তুই তো কোনো ধর্মই মানিস না—তোর সত্যেনই বা কী সুফিই বা কী।' একটু ভয়-ভয়ও করলো, মজাও লাগলো খুব। কিন্তু ঢুকে যেতো

ঐখানেই যদি না তোমার সঙ্গে দেখা হ'তো। জানো তো, কোনো-কোনো ভালোবাসা এক পলকেই আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন বাড়ী গিয়ে মনে-মনে ভাবলাম, আমি তো আর চেহারা বদলাইনি, চরিত্রও বদলাইনি—বদলেছি জাতি, যেটা মানুষের মনুষ্যত্বের তিলমাত্র প্রকাশ নয়। মানুষ ছোটো বড়ো তার চরিত্রে—বিদ্যায় বুদ্ধিতে আর নম্রতায়। আমি যতটুকু বিদ্বান তার চেয়ে বেশি ভান করিনি—যতটুকু বুদ্ধি তার বেশি দেখাইনি- আর আমার চরিত্র তো সুধীন জানে। তুমি ভেবে দেখো অন্যায় আমি কি করেছি। যে মুহূর্তে তোমাকে দেখলাম, আবার দেখবার ইচ্ছায় আমি পাগল হ'য়ে গেলাম—তারপর যতবার দেখলাম ততবার আবার দেখবার দুর্নিবার ইচ্ছায় এ-মিথ্যা জাতকে আমি আঁকড়ে রইলাম। কিন্তু আর নয়—এবার যদি আমি মুসলমান ব'লে তোমার ভালোবাসায় তিলমাত্র চিড় না ধরে তা হ'লে ঐ আংটি তুমি খুলো না, এই আমার মিনতি। আর আমাকে ক্ষমা কোরো।

তোমার ইউসুফ।'

চিঠিটি ভাঁজ ক'রে নিশ্বাস ছাড়লাম। কোলের উপর প'ড়ে রইলো খোলা চিঠি—জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, গাছের পাতায়-পাতায় রোদ ঝিকমিক করছে। মন উধাও হ'য়ে গেলো। পরের দিন সকালের ডাকে বাবার নামে একখানা চিঠি এলো—চিঠিখানা পড়তে যতটুকু সময়—তার-পরেই হঠাৎ যেন বাবার গলায় বোমা ফাটলো। চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি শালা জোচ্চোর ব'লে শূন্যে লাফিয়ে উঠলেন। ছুটে গেলেন মা,—'কী হয়েছে, কী হয়েছে?' মা'র গলায় অস্থিরতা ফুটে উঠলো। 'শালাকে আমি জলে খাটাবো—সুধীনকেও রেহাই দেবো না জামাই ব'লে। হারামজাদা—লম্পট—' বাবা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, মা কিছুই বুঝতে না-পেরে খালি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন—হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো চিঠিটার দিকে। তাড়াতাড়ি সেটি কুড়িয়ে নিয়ে এক নিশ্বাসে প'ড়ে নিয়ে অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'চুপ করো তো তুমি, তোমার কি মাথা খারাপ হ'লো? ঘরে এসো।' হায়-হায় করতে করতে বাবা ঘরে গেলেন —ফিশফিশিয়ে মা বললেন, 'বুড়ো বয়েসে আর কেলেঙ্কারি কোরো না। চ্যাঁচামিচি ক'রে এখন রাজ্য সুদ্ধ লোককে জানাও যে রাতদিন একটা

মুসলমান এ-বাড়িতে আসতো, খেতো, একসঙ্গে বসতো, একসঙ্গে ছোঁয়াছানি—একাকার। চেপে দাও—জাত আবার কী? চেপে গেলেই হ'লো।' বাবা তক্ষুনি ঢোঁক গিলে চেপে গেলেন, কিন্তু জাতিসাপের মতো চাপা গর্জনে কপাল চাপড়িয়ে ক্রমাগত মুখ খারাপ করতে লাগলেন। আমি এতক্ষণ হতবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এবার যেন কিছু বোধগম্য হ'লো—মা-র হাত থেকে চিঠিখানা টেনে নিয়ে পড়লাম—চিঠিখানা সুধীনবাবুর লেখা—

'শ্রীচরণেষু,

আমি নিজে কোনো জাত মানি না। আমার বন্ধু সত্যেন যে আমার কত খানি তা আপনারা অনুমান করতে পারবেন না। আমার বিবাহের আনন্দের কোনো অংশই যদি সে গ্রহণ না করতো আমার পক্ষে সে আনন্দ অসম্পূর্ণ হ'তো, কিন্তু সে-উৎসব-সভায় যোগদান করবার তার কোনো অধিকার থাকতো না, যদি না তার নাম আমি সত্যেন রাখতাম।

আমি জানতাম না সেই নামটি ভাঙিয়ে সে এখনো আপনার ওখানে যাতায়াত করে। এটা তার পক্ষে বোধহয় উচিত হয়নি, আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি তার চরিত্রের কথা বলছি না—বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে সে সত্যিই অসাধারণ, কিন্তু তার নাম সত্যেন নয়, ইউসুফ—তার বাবা মুসলমান।'

চিঠিটা প'ড়ে আর আমি জাত খোয়াবার ঐ মর্মবিদারক দৃশ্য দেখবার জন্য দাঁড়ালাম না। বাবারও আপিশের বেলা হয়ে গিয়েছিলো, বেশিক্ষণ বিলাপ করবার আর সময় হ'লো না। অপিশে যাবার সময় কেবল বললেন, 'হারামজাদা মোচলমানের বাচ্চাকে আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলাবো'।

যে মানুষটাকে মা কালও সন্তানের অধিক স্নেহ করেছেন, তিনিও নির্বিকার মুখে ব'লে উঠলেন, 'তা-ই উচিত'।

মানুষ কেবল ভালোকেই ভালোবাসে না—চোর জোচ্চোর লম্পট বদমাস এমন লোককেও একজন মানুষ হয়তো কত গভীরভাবে ভালোবাসে দেখেছি, কিন্তু সে যদি বিজাতি হয়, তা হ'লেই কেন সব নিঃশেষে চুকে যায়? বুকের মধ্যে সত্যি কেমন ক'রে উঠলো। এই অন্যায়, এই নির্মমতা—এই অহেতুক জাতিবিদ্বেষ কি আমাকেও স্পর্শ করবে? আমার ভালোবাসাকেও কলঙ্কিত করবে?

স্নান ক'রে যখন খেতে বসলাম মা বললেন, 'লোকটাকে তখনই আমার ভালো মনে হয়নি—তখনই মনে হয়েছিলো আসলে একটা বদলোক—'

আমি মৃদু গলায় বললাম, 'মানুষটা আর বদ কী—জাতে মুসলমান এই যা অপরাধ।'

'ও মা তুই বলিস কী, মিতু? জাত ভাঁড়িয়ে সকলের জাত ও মারলো ও কি একটা কম নরক? ওটার মুখ দেখলেও যে পাপ হয়—'

নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রে খেয়ে উঠলাম। মা-ও খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতে বললেন, 'কাউকে এ-সব বলিসনি, বুঝলি! লোকে জানলেই ভয়, নইলে আর কী। তোর বাবা আবার যা গোঁয়ার মানুষ। এ নিয়ে একটা হাট না করেন তাই ভাবি।

মা ঘুমুতে গেলেন, আমি গেলাম বৈঠকখানায়। গিয়ে প্রথমেই খিল বন্ধ করলাম, তারপর প্রতি মুহূর্তে আশায় আর প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলাম। অনেকক্ষণ পরে, আমার মনে হ'লো বোধ হয় এক যুগ পরে দরজার কড়া ন'ড়ে উঠলো। কাল আংটিটা আমি খুলে রেখেছিলাম, বুকের মধ্যে থেকে বার ক'রে তাড়াতাড়ি আঙুলে প'রে নিয়ে খুব আস্তে দরজা খুলে দিয়ে অত্যন্ত নিচু গলায় বললাম, 'এসো।' ঘরে ঢুকে প্রথমেই তাকালো আমার হাতের দিকে—সঙ্গে-সঙ্গে আশায় আনন্দে ওর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—ভারি গলায় বললো, 'আমাকে ক্ষমা করেছো?'

'ভালোবাসাকে কি অপরাধ হার মানতে পারে?'

'জাত?'

'জাতটা তো অপরাধ নয়।'

'তুমি আমাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করোনি?'

'গ্রহণ তো তোমাকে আগেই করেছিলাম—আমি প্রস্তুত—আমাকে তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যেনের চোখ ছলছল ক'রে উঠলো, রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, 'আমাকে তুমি এত ভালোবাসো? আমি কি এ-দানের যোগ্য!'

কোনো কথা আমি মন দিয়ে শুনতে পারছিলাম না, আতঙ্কিত চোখে চারদিকে তাকিয়ে অস্থির গলায় বললাম, 'আমাকে কী করতে হবে, বলো—এ বাড়িতে আর একদণ্ডও তোমার থাকা উচিত হচ্ছে না।'

'সবাইকে বলেছো।'

'সুধীনবাবুই জানিছেন।'

বিষণ্ণ চোখে সত্যেন আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'আমার কৃত-কর্মের জন্য ওঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, অন্তত মাসিমার কাছে—তাঁকে আমি সত্যিই ভালোবাসি।'

'ও সব ভুলে যাও—'

'ওঁরা কি আমাকে ক্ষমা করবেন না?'

'অসম্ভব।'

সত্যেন নিশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রে রইলো। আমি বললাম, 'আর তুমি এ-বাড়িতে এসো না।'

'তুমি?'

আমি জবাব দিলাম না।

আমাকে বোঝাবার চেষ্টায় বললো, 'মা-বাবাকে ছেড়ে গিয়ে যে-দুঃখ তুমি পাবে তা ভ'রে দিতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করো আমি কখনোই তোমাকে কোনো দুঃখ দেবো না। বিবাহের দ্বারা মেয়েরা সর্বদাই বাপ-মার সান্নিধ্য-সুখ থেকে কোনো-না-কোনো দিন বিচ্ছিন্ন হয়ই—তুমিও হবে—' একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমি অনেক ভেবেছি, তুমি মন শক্ত করো, আমি আজ রাত এগারোটার পরে গাড়ি নিয়ে আসবো—'

'তা-ই হবে, তুমি এবার যাও—' আমি আর এক মুহূর্ত ওকে থাকতে দিলাম না, প্রায় ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম।

বিকেলবেলা বাবা আপিশ থেকে এসে বললেন, 'ওকে আমি ছাড়বো না, কিছুতেই ছাড়বো না—বুঝলে? আমার কী—গঙ্গায় ডুব দিলেই সব শুদ্ধ, কিন্তু ওকে আমি দেখে নেবো।' চাপা গলায় মা বললেন 'কী যে লাগিয়েছো সেই থেকে—তোমার আর বুদ্ধি হবে না। আগে মেয়ের একটা হিল্লে করো, একটা মোছলমান ছোঁড়া বাড়িতে আসতো যেতো এ জানলে কি কেউ ওকে ঘরে নেবে। তখনই বলেছিলাম যে ন' খুড়ির বৌঠানের ভায়ের সঙ্গেই বিয়েটা দাও—'

বাবা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তুমি বলেছিলে, না আমি বলেছিলাম? তুমিই তো নাচতে-নাচতে বললে যে ও আবার একটা সম্বন্ধ!'

আমি নিঃশব্দে বাবার পায়ের জুতোর ফিতে খুলে দিয়ে চা আনতে চ'লে গেলাম।

অনেক রাত পর্যন্ত মা-বাবা সেদিন অনেক কথা-কাটাকাটি করলেন। নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে সব শুনলুম! মনের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতা বোধ করছিলাম যে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলাম। একবার মনে হ'লো এর চেয়ে মৃত্যু ভালো—কিন্তু মন সায় দিলো না—কেন মরবো? আমার মত্যুই যদি মা-বাবাকে সহ্য করতে হয় তাহ'লে এটাই বা তার চেয়ে খারাপ কী? কী অপরাধ সত্যেনের—কেন বঞ্চিত করবো ওকে? কোনো না কোনোদিন বিয়ে আমাকে করতেই হবে—যদি তা-ই হয় তাহ'লে ওকে বিয়ে না-করাই হবে আমার চরম অন্যায়—নৈতিক অপরাধে অপরাধী হবো আমি।

আকাশ-পাতাল মাথামুণ্ডু ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা যেন পাগলের মতো হ'য়ে গেলো। আস্তে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম—রাত বেড়েছে—থমথম করছে সমস্ত পৃথিবী। তারা-ভরা অমাবস্যার কালো রাত। তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। মা-র ঘরের দরজার কাছে এসে মা-র নিশ্বাসপতনের শব্দটা কান পেতে গ্রহণ করলাম, বন্ধ দরজার উপরে মাথা রেখে যেন মা-কে অনুভব করবার চেষ্টা করলাম নিজের মধ্যে। কত ছোটো ছোটো কথায় মন ভ'রে উঠলো—চোখ জলে ভ'রে গেলো।

সহসা আমার সমস্ত সত্তা দীর্ণ ক'রে মোটরের হর্নটি বেজে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গেই আমার পায়ের সঙ্গে যেন কে একটি ভারি পাথর বেঁধে দিলো। একটা বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মতো থমকে গেলো আমার শরীরের সমস্ত তন্ত্রী। মাত্রই এক সেকেণ্ড, তারপরে আমার আবাল্যপরিচিত ঘর, চির-অভ্যস্ত জীবন—মা-বাবার অপর্যাপ্ত ভালোবাসার বন্ধন সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

চলন্ত গাড়ির মধ্যে আমি যেন একটি মৃত মানুষ। অন্ধকারের মধ্যে এক সময়ে সত্যেন আমাকে স্পর্শ ক'রে বললে, 'ভয় করছে?'

ভাঙা গলায় বললাম, 'না।'

একটু সময় কাটলো। আবার বললো, 'মন-কেমন করছে?'

'করাটা কি অন্যায় ?' এ-রকম জবাবে একটু দুঃখিত হ'লো বোধ হয়—তারপর সমস্ত রাস্তাই আমাদের নিঃশব্দে কাটলো।

নিতান্ত নিভৃত জায়গায় একটি বাড়ির কাছে এসে গাড়ি থামতেই বাড়ির আলো জ'লে উঠলো; একজন স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিলো।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলাম—স্ত্রীলোকটি আগে-আগে এসে আলো জ্বালিয়ে দিলো। যে-ঘরটি আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো, সে-ঘরে এসেই সে চ'লে গেলো। সত্যেন বলল, 'এবার তুমি বিশ্রাম করো।'

ঘরটি বেশ প্রশস্ত—মাঝখানে একটি সরু লোহার খাটে ধবধবে বিছানা—শিয়রের কাছে ছোটো টিপায়ের উপর এক গেলাশ জল প্লেট দিয়ে ঢাকা। কোণে দেখলুম একটা আলনায় দু'খানা ধোলাই করা নতুন শাড়ি। চারদিকে তাকিয়ে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ব'সে প'ড়ে বললুম, 'তুমি ?'

'পাশের ঘরেই থাকলাম, কিছু ভয় নেই।'

'পাশের ঘরে তো কোনো বিছানা দেখলাম না—'

'সে হবে'খন—তুমি আর রাত কোরো না, শুয়ে পড়ো।' সত্যেন গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে আলনায় রেখে এলো। গেঞ্জি-পরা ওর নিটোল শরীর আর প্রশস্ত বুকের দিকে তাকিয়ে আমি রোমাঞ্চিত হলাম।

একেবারেই পাশাপাশি ঘর, দরজা খোলা রাখলে সবই দেখা যায়—ও-ঘরে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে-দিতে ও বললো, 'ইচ্ছে করলে ভিতর থেকেও দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতে পারো।'

মুহূর্তে বাড়িটি স্তব্ধ হ'য়ে গেলো—খাটের রেলিংএ হেলান দিয়ে আমি ব'সে রইলাম। নিঃসঙ্গতা আমাকে তিলে-তিলে গ্রাস করতে লাগলো। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না—হঠাৎ ঘুমটা পাতলা হ'য়ে এলো—তন্দ্রার মধ্যেই অনুভব করলাম কে যেন আমার মাথার তলায় বালিশ গুঁজে দিচ্ছে। আমি আরাম পেলাম—খুট ক'রে আলোটিও নিবলো—আলো নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার ঘুম ছুটে গেলো, সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে আমি রুদ্ধশ্বাসে মড়ার মতো প'ড়ে রইলাম—কেবল বুকের মধ্যে কেমন একটা ভয় আর প্রতীক্ষা শিরশির ক'রে ওঠা-নামা করতে লাগলো। একটু পরেই বুঝলাম সত্যেন চ'লে গেলো নিজের ঘরে। আমার মন বিশ্বাসে আর কৃতজ্ঞতায় ছলছল ক'রে উঠলো।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে চুপ ক'রে শুয়ে ছিলাম, দরজায় টোকা দিয়ে সত্যেন বললো, 'ঘুমুচ্ছ ?'

'না, এসো।'

দরজা ঠেলে ঘরে এলো—ঐটুকু সময়ের মধ্যেই পরিষ্কার ক'রে দাড়ি কামিয়েছে—স্নান করেছে,—ওর পরিচ্ছন্ন স্নাত চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলাম—নাম-না-জানা কোন সাবান আর ব্রিলেনটিনের মধুর গন্ধে ঘর ভ'রে উঠলো। আমার মাথার কাছে এসে খাটের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে বললো, 'এবার চা দিক, না ?'

'সকালে তো আমি চা খাই না।'

'তা হ'লে দুধ দিক—দাঁড়াও বলি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম—'কিছু দরকার নেই—আমি এখন খাবো না।'

'তা কী হয় ?'—সত্যেন শুনলো না, জানলার কাছে গিয়ে মুখ বার ক'রে বললো, 'মতির মা, ছোটো পটে আমার জন্যে চা এনো—আর ছোটো জগে দুধ এনো।' ফিরে এসে বললো, 'তুমি মুখটুক ধুয়ে নাও, পাশেই বাথরুম আছে।' অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি উঠলাম। সত্যেন বলল, 'এত অল্প সময়ে আমাকে এত সব করতে হয়েছে যে তোমার জন্য কিছুই ব্যবস্থা ক'রে রাখতে পারিনি—শাড়ি এনেছি অথচ তোয়ালে ভুলে গিয়েছি—আমারটাই ব্যবহার করো আজ—কী আর করবে।' বলতে-বলতে ও-ঘর থেকে একখানা তোয়ালে নিয়ে এলো—আলনা থেকে একখানা শাড়ি তুলে আমার হাতে দিয়ে অত্যন্ত বিহ্বল গলায় বলল, 'আমি জানতাম না কাউকে দিলে এত আনন্দ হয়, এত আনন্দ আমি সইবো কেমন ক'রে ?'

আমি মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম, কথা বললাম না।

ফিরে এসে খাবার আয়োজন দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। দুধ, ফল, সন্দেশ, লুচি, হালুয়া—প্লেটে-প্লেটে ট্রে-টি একেবারে ভর্তি। আমি বললাম, 'এ কী !'

'খাবে না ?'

'মানুষে এত খেতে পারে ? তাছাড়া সত্যি বলছি আমার একেবারেই খিদে নেই।'

'মিতু, তুমি মন-খারাপ ক'রে আছো ?'

আমাকে ও নাম নিয়ে সম্বোধন করলো এই প্রথম। ওর মুখের সম্বোধনে আমি শিহরিত হলাম। বললাম, 'না, মন-খারাপ করবো কেন? খুব ভালো লাগছে।'

'তা হ'লে খেতে চাইছো না কেন?'

'মন খারাপ হ'লেই বুঝি মানুষে খায় না?'

'তা ছাড়া আর কী।' সত্যেন হাত গুটিয়ে বসলো। আমি বললাম, 'তাই ব'লে তুমিও খাবে না নাকি?'

'আমারও খিদে নেই।' আমি এবার হাসলাম। পট থেকে চা ঢেলে দিয়ে বললাম, 'নাও, খাও, কী ছেলেমানুষি করো যে—'

খেতে-খেতে বললাম, 'কাল শুলে কেমন ক'রে?'

'একটা ডেক চেয়ার ছিলো।'

'সারারাত ডেক চেয়ারে? ছি ছি!'

'কিছু কষ্ট হয়নি আমার!'

'তা বইকি—আজ অবশ্য বিছানার ব্যবস্থা কোরো।'

'যতক্ষণ না রেজেস্ট্রি হচ্ছে কিছুতেই আর মন দিতে পারছি না আমি। আচ্ছা, তোমার বয়স কত?'

'উনিশ বছর ছ' মাস।'

'তা হ'লে আর ভয় কী। আমি ওদের আজকেই যাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে বলছিলাম, কোর্টে গেলে তাড়াতাড়ি হ'য়ে যেতো কিন্তু আমার ইচ্ছে করে না তোমাকে নিয়ে কোর্টে যেতে। তাছাড়া রেজিস্ট্রার আমাদের অনেক কালের চেনা, তিনি নিজে থেকেই বললেন বাড়িতে আসবেন।'

আমি হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম মুখের দিকে—এতখানি কাণ্ড করলাম—ভালোবেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, অথচ আমাদের বিবাহ হবে কেমন করে সেটাই আমি এতক্ষণ মনে করিনি – হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ যে শালগ্রাম শিলা সাক্ষী ক'রে পুরুত ডেকে হবে না, এটা আমার মাথায়ই আসেনি—রেজেস্ট্রি করার কথা শুনে এতক্ষণে সে-বিষয়ে সচেতন হ'য়ে বললাম, 'ও-সব চুকে গেলেই রক্ষে পাই—আমার বড়ো ভয় করছে বাবার কথা ভেবে।' অত্যন্ত নিরুদ্বেগে সত্যেন বললো, 'উনি যদি বা তোমাকে খুঁজে বার করেন, মুসলমান

ব'লে তক্ষুনি বর্জন করবেন। শোনো, আমাকে একটা লিস্ট ক'রে দাও তো কী-কী তোমার লাগবে—আমি একটু বেরুই।'

'ও-সব হ'য়ে গেলেই বেরিয়ো, এখন থাক।'

'কিন্তু চলবে কেমন ক'রে, তা'ছাড়া ঝি-টিই বা কী মনে করছে কে জানে?'

'ও কে?'

'আমার এক বন্ধুর বাড়ির পুরোনো লোক—ওরা ওর কাছে তোমাকে আমার কী বলেছে তা তো বুঝতেই পারছো, এ-রকম জিনিষপত্রহীন বৌ দেখলে ওর যে সন্দেহ হবে।'

'হোক, তোমার না-বেরুনোই ভালো।'

আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'ওদেরো তো আটটার সময় আসবার কথা—আচ্ছা, তুমি লিখে দাও তো—না-হয় বন্ধুদের দিয়েই আনিয়ে নেবো।'

'বন্ধু বন্ধু বলছো যে, আর কেউ কি জানে নাকি?'

'বা, জানে না?' সত্যেন হাসলো—'ওরাই তো আমার সব ঠিক ক'রে দিলে। উইটনেসও তো ওরাই হবে।'

'উইটনেস? উইটনেস কিসের?'

'বাঃ, আমাদের যে বিয়ে হবে তার সাক্ষী।'

জানতাম না এ-সব সাক্ষীসাবুদের ব্যাপার, তাই চুপ ক'রে গেলাম। একটু পরেই স্ত্রীলোকটি চায়ের বাসন নিতে এলো। ওকে দেখে একটু সংকুচিত হ'য়ে বললো, 'বাজারে যাবো এখন?' আমার হ'য়ে ও-ই বললো, 'হ্যাঁ, যাবে বইকি—ব'লে দাও কী-কী আনবে।'

বিপদে পড়লাম—মনে করবার চেষ্টা করলাম মা-বাবাকে কী-কী আনতে বলতেন—আমার অবস্থা দেখে ও নিজেই বললো, 'তোমার ইচ্ছেমতো যা খুশি এনে রান্না করো গে, ওঁর শরীরটা ভালো না কিনা।' ঝি কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে চ'লে গেল।

'এ-রকম কর্ত্রী হ'লেই হয়েছে,'—ব'লে সত্যেন দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এসে খাটের উপর টান হ'তে-হ'তে বললো, 'রাগ না করো তো তোমার বিছানায় একটু শুই।'

শুতে-না-শুতে ওর বন্ধুরা রেজিস্টারকে নিয়ে এসে হাজির হ'লো।

বিবাহের নমুনা দেখে আমি অবাক হলাম। এই নাকি বিয়ে? সময় বোধ হয় চল্লিশ মিনিটও লাগলো না, হাঁড়ি-হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে এলো ওরা—খুব হৈ-হল্লা ক'রে খাওয়া হ'লো—রেজিস্টার আগেই চ'লে গেলেন, আর ঐ ভদ্রলোক তিনজন একেবারে আমাদের সঙ্গে খেয়ে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বন্ধুদের বিদায় দিয়ে আমরা আবার যখন নিভৃত হলাম, তখন বোধহয় বেলা দুটো। ঘরের ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে বললো, 'এইবার আমারা আইনত স্বামী-স্ত্রী হলাম।'

আমি মুখ নিচু ক'রে ছিলাম হঠাৎ ও আমার একান্ত কাছে এসে দাঁড়ালো তার পর নিচু হ'য়ে আমার মুখে বিবাহের প্রথম প্রণয়চিহ্ন এঁকে দিলো। দুপুরটা কাটলো একটা অস্বাভাবিক বিহ্বলতার মধ্যে। সুখের ভারে সমস্ত শরীর আমার অবশ হ'য়ে রইলো। রাত্রে নামমাত্র খেয়ে যখন আবার আমাদের শোবার সময় হ'লো, তখন আমার দিকে চেয়ে ও জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায় শোবো?'

'কোথায় তোমার ইচ্ছে?'

'ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ওঠে নাকি—' আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে বললো, 'আজ আমাদের বিয়ের প্রথম রাত্রি না? বিছানা যতই ছোটো হোক—'

'অসভ্য!'

'এর নাম বুঝি অসভ্যতা?' উঠে গিয়ে খুট্ ক'রে আলো নিবিয়ে দিয়ে এলো।

জেগে ঘুমিয়ে কেমন ক'রে আমার সে-রাত কেটেছিল, তা কেমন ক'রে বোঝাবো। সে-রকম রাত্রি কি আর কোনো মেয়ের জীবনে এসেছে? খুব সকালে আমার ঘুম ভাঙলো। ওর বলিষ্ঠ আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে উঠে বসলাম—তাকিয়ে রইলাম নির্নিমেষে ওর ঘুমন্ত আর সুখী মুখখানার দিকে। দেখতে-দেখতে সমস্ত হৃদয় যেন ভ'রে গেলো। মনে-মনে বললুম, 'ঈশ্বর, আর কিছুই চাই না—এ-মুখ যেন জীবন ভ'রে দেখতে পাই।' সন্তর্পণে নিজের মুখটা কিছুক্ষণের জন্য রাখলাম ওর কপালের উপর, তারপর একটা নিশ্বাস নিয়ে জানালায় এসে দাঁড়ালাম। মনে হ'লো কেউ কথা বলছে

একতলায়। এত সকালে কে এলো? কান পাতলাম—ঝিয়ের গলা পেলাম—'হ্যাঁ বাবু, আমারো কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

'ঠিকই ধরেছেন, ইন্সপেকটরবাবু—' সঙ্গে-সঙ্গে ভারি জুতোর আওয়াজে সিঁড়ি ভ'রে গেলো। জানালা ছেড়ে আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'ওঠো, ওঠো—আমার ভয়ানক ভয় করছে।' হাসিমুখে ও চোখ খুললো। আমার শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী হলো?' সঙ্গে-সঙ্গে দরজায় লাঠির আঘাত শুনে চমকে উঠে বললো, 'কে? আমি জড়িয়ে ধ'রে বললাম, 'খুলো না, ওরা পুলিশ।'

'পুলিশ আমার কী করবে? আইনত তুমি আমার স্ত্রী—বাড়ি চড়াও করবার জন্য আমি ওদের জেল খাটাবো।' আমার কথা শুনলো না, দরজা খুলে দিলে। হুড়মুড় ক'রে প্রথমেই যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি আমার বাবা, পিছনে ইউনিফর্ম-পরা ইন্সপেকটর—তার পিছনে দু'জন পুলিশ। আমাকে দেখতে পেয়েই বাবা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'এই যে হারামজাদি—' চুলের মুঠি ধ'রে আমাকে তিনি মাটি থেকে শূন্যে তুললেন। লাফিয়ে এলো সত্যেন—'কক্ষনো হাত দেবেন না আমার স্ত্রীর গায়ে—'

'হারামজাদা, লম্পট—' ঠাশ ক'রে সত্যেনের গালের উপর এক চড় কষিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, 'তোমার বদমাইসি বার করছি এবার—হাতকড়া লাগান, রজনীবাবু।'

আমি রুখে দাঁড়ালাম, 'কক্ষনো না, আইন অনুসারে আমরা বিবাহিত—আমি সাবালিকা—আমার উপর তোমার কোনো হাত নেই—স্বেচ্ছায় আমি বিয়ে করছি একে।'

'বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে—' সত্যেনের গলা চিরে শব্দ বেরুলো। ইন্স-পেকটার রসিকতা ছাড়লেন, 'তাই নাকি, চাঁদ। আচ্ছা—তেওয়ারি, হাতকড়া লাগাও।'

আমি বাবার পা জড়িয়ে ধরলাম, 'রক্ষা করো।' বাবা গায়ের জোরে আমার আঁচলের কাপড় আমার মুখে গুঁজে দিলেন, তারপর টানতে-টানতে ঝি-টার চোখের সামনা দিয়ে নিয়ে তুললেন ট্যাক্সিতে।

পিছনে সত্যেন ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে উঠলো, 'এ-অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি নেবো, নেবো, নেবো—'

বাড়িতে এনেই আমাকে শক্ত ক'রে হাতে পায়ে বেঁধে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। হাতে চাবুক লিকলিক ক'রে নাচতে লাগলো। 'বল, বল, হারামজাদি, কেন আমার জাত মান সব খোয়ালি তুই।'

হুশ হুশ শব্দে সমানে চাবুক পড়তে লাগলো আমার সমস্ত গায়ে। নিঃশব্দে শরীরকে সইতে দিলাম। আমার নীরবতা বাবার ক্রোধকে আরো উদ্দীপ্ত করলো। 'তবু হারামজাদি কথা বলবি না? তবু বলবি না অন্যায় করেছিস? তবু বলবি না? বল, বল—' প্রতেকটা কথার সঙ্গে-সঙ্গে আমি বাবার হাতের ওঠা-পড়া দেখতে-দেখতে বললাম, 'মারো, মারো মারো·· মেরে ফেল, তবু বলবো না অন্যায় করেছি, খুন ক'রে ফেল. তবু বলবো না —'

মা দরজা ধাক্কাতে-ধাক্কাতে বলতে লাগলেন, 'ওগো তুমি করছো কী, ওকে কি মেরে ফেলবে? খোলো, খোলো শিগগির।' বাবা ক্লান্ত হয়েছিলেন—চাবুক রেখে ঘাম মুছতে-মুছতে দরজা খুলে দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন মা—'এই করেছো তুমি!' আমার রক্তাক্ত স্ফীত মাংসখণ্ডগুলো তিনি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে-দিতে দাঁতে-দাঁত আটকে বললেন—'পশু।' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বাবা তাকালেন মা-র দিকে তারপর বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'বেরিয়ে যাও ঘর থেকে—' ব'লে নিজেই তাঁকে বের ক'রে দিলেন। তারপর নিজেও বেরিয়ে গিয়ে বললেন—'চিরজীবন তুই বন্দী হ'য়ে থাক এই ঘরে।' বাইরের দরজায় শিকল তোলার শব্দ হ'লো।

শুনতে পেলুম কান্নাভরা গলায় মা বলছেন, 'এই যদি করবে ওকে—যদি ওকে মেরেই ফেলবে তবে আনলে কেন তুমি— কেন ওকে থাকতে দিলে না ওর জীবন নিয়ে—'

'কী, কী বললে তুমি? ওকে থাকতে দেবো ওর জীবন নিয়ে· তারপর! তারপর যদি ওর সন্তান হয়? আমি হবো সেই মোচলমানের বাচ্চার মাতামহ?'

হা ঈশ্বর! অত দুঃখেও বাবার কথা শুনে আমার হাসি পেলো।

আজ তিনদিন আমি বন্দী হ'য়ে আছি এই ঘরে—এখনো বাবার রাগ পড়েনি—মা কী করবেন, তিনিও তো মেয়ে—তাই তিনি আমারই মতো অসহায়—জানালা দিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। দিনে একবার আমাকে খোলা হয়—কয়েদির মতো সঙ্গে ক'রে মা আমাকে

স্নানে নিয়ে যান, তাও বাবা আপিশে যাবার আগে—চেয়ে চিন্তে একটি খাতা আর একটি কলম জোগাড় করেছি—তাই দিয়ে লিখে রাখলাম আমার হতভাগ্য জীবনের কাহিনী। কাল ওর শেষ চিহ্ন আংটিটিও বাবা ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন আমার হাত থেকে।—আমার কি মৃত্যু নেই?

* * * *

এই পর্যন্ত লেখা হ'য়েই তারপর নানারকম অসংলগ্ন কথায় কাগজগুলো ভর্তি—বুঝলাম মাথা-খারাপের ঐ হ'লো সূত্রপাত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমস্ত কাগজগুলো জড়িয়ে পকেটে রাখলাম—বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—অন্ধকার কেটে কখন আলো ফুটেছে। মনে মনে ভাবলাম সেই ইউসুফ এখন কোথায়? কে সে? পৃথিবীর এই জনারণ্যে কোনোদিন কি আমি তাকে খুঁজে বার ক'রে এ লেখাটি তার হাতে দিতে পারবো?

গুণীজনোচিত

আমি একজন অতিশয় সাধারণ যুবক। আমার জীবনে কোনো কল্পনার প্রসার নেই। আমার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডিতেই আবদ্ধ। মার্চেন্ট আপিসে চাকরি করছিলাম। মামার মৃত্যুতে সামান্য কিছু টাকার অধিকারী হ'য়ে বসলাম। মামা অবিবাহিত ছিলেন—আমি তাঁর একমাত্র ভাগ্নে—এবং অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয় আমাকে হ'তেই হবে, কেননা আমার মতো ছেলেরা স্বভাবতই স্তিমিত হয়, গুরুজনদের ভক্তি করে, এবং পাঁচজনের মনরক্ষার জন্য নিজের সর্বনাশ করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। মামার সামনে সিগারেট খেতুম না, মাথা আঁচড়াতাম না, দাড়ি কামাতাম না—মামা আজকালকার দিনের সঙ্গে আমার তুলনা ক'রে খুশিতে অস্থির হ'য়ে যেতেন। সে জন্যই বোধহয় তাঁর লাইফ-ইনশিওরেন্সের পলিসি আমার নামেই এসাইন ক'রে রেখেছিলেন। একটু অসময়ে মরলেন তিনি, এবং তাঁর পাঁচ হাজার টাকার ইনশিওরেন্সের অধিকারী আমাকেই হ'তে হ'লো। আমি কি খুব খুশি হয়েছিলাম? বরং টাকাগুলো নিয়ে কী করবো তাই ভেবেই আরো উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলাম। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিলো—অবশেষে একটি বাড়ি কিনে ফেললুম আমি। পাঁচ হাজার টাকায় কলকাতার মতো জায়গায় যে একটি বাড়ি পাওয়া যাবে এমন কল্পনাও আমি করিনি, কিন্তু পাওয়া গেলো। মামার টাকাটাও যেমন আমার পক্ষে দৈব, বাড়িটিও তেমনি দৈবের দয়া ব'লেই আমি মেনে নিলুম। আসলে বাড়িটির যিনি মালিক, তিনি বোধহয় কোনো কৌশলেই বাড়িটি আপন করায়ত্ত করেছিলেন, আর বাড়িটির প্রতি কী যেন কেন তাঁর একটা প্রকট বৈরাগ্য দেখতে পেলুম—ও যেন হাতছাড়া করতে পারলেই তিনি রক্ষা পান, এ-রকমই তাঁর মনের ভাব। পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজারই সই। আমার সুবিধে হ'য়ে গেলো।

বাড়িটি ছোটো, কিন্তু বড়ো সুন্দর। চারপাশে একটু-একটু জমি—আগাছার জঙ্গলে ভর্তি—তার মধ্যে ছড়ানো-ছিটোনো নানা রংয়ের বুনো ফুল। দেয়াল ঘেঁষে একটি লম্বা লিচু গাছ। আমার মন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো। মাত্রই তিনখানা

ঘর, তবুও ঘুরে-ঘুরে দেখতে আমার অনেক সময় লাগলো। আমিই যে এই বাড়ির মালিক এ-কথা আমি এক মিনিটের জন্যও ভুলতে পারলুম না। আমার বাড়ি, একান্তই আমার, এ-কথাটা যেন আমার বুকের মধ্যে গুনগুন করতে লাগলো। আমি মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে একটা স্বপ্নের আবেশ অনুভব করলুম। আমি দেখতে পেলুম কোনো-একটি সলজ্জ শঙ্কিত আলতা-পরা পদক্ষেপে সমস্ত বাড়ি যেন ভ'রে উঠেছে। এতদিনে মনে হ'লো আমার বিবাহ করা দরকার।

•

আমি থাকতুম আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার এই দশা। কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশুনো চালাবার মতো সংস্থান আমার ছিলো না। কেননা আমার বাবা আমার শৈশবেই মারা যান এবং মা-র সামান্য-কিছু গহনা ছাড়া আমার আর অন্য কোনো মূলধন ছিলো না। অতএব টিউশনি ক'রে হাত-খরচ আর পড়ার খরচ চালানো সম্ভব ছিলো, কিন্তু মেসের খরচ পোষাতো না। প্রথমবার এসে এক পিসতুতো বোনের বাড়ি ছিলুম, তারপর জ্যাঠতুতো কাকার—তারপর বর্তমানে মাসির দেওরের বাড়ি। এখন চাকরি করি, মেসে থাকতে পারতুম কিন্তু এ-ভদ্রলোক নিজে থেকেই আমাকে আপ্যায়িত করেছিলেন। খরচ অবিশ্যি দিতুম।

মামা মিলিটারিতে কাজ করতেন, মাঝে মাঝে ছুটি-ছাটায় আসতেন আমাদের দেখে যেতে—আমার নম্রতায় মুগ্ধ হতেন, আর তারপর তো এই ফল। আমার আর একদিনও দেরি করতে ইচ্ছে করলো না। মোট-ঘাঁট নিয়ে তখুনি চললুম বসবাস করতে। সবাই আমার বোকামিতে অবাক হ'লো। বললো, 'বাড়িটা পরিষ্কার করিয়ে ভাড়া দাও, মোটা ভাড়া পাবে।' আমার মন মানলো না। কী হবে অত টাকা দিয়ে। চির-কালই তো এর তার বাড়ি কাটলো। নিজের বাড়িতে নিজে থাকবো, এ আমার কতকালের স্বপ্ন, এই একটা ছোটো আকাঙ্ক্ষাকে আমি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারলাম না। মা-কে চিঠি লিখে দিলাম দেশে। তারপর সামান্য একটু চুনকাম করিয়েই নিজের অতি স্বল্প সম্পত্তি—একটা ট্রাঙ্ক আর একটা স্যুটকেশ নিয়ে একদিন সকালবেলা এসে উঠলাম এ-বাড়িতে। রবিবার ছিলো। সামনেই চায়ের দোকানে জলযোগ সেরে

দুপুরবেলা ঘুরে-ঘুরে দুটো-একটা জিনিশ কিনে আনলুম—একটা চাকরের ব্যবস্থা ক'রে এলুম—একটা ক্যাম্পখাট পর্যন্ত। একটা কুঁজো—দুটো কাচের গ্লাশ—মনে ক'রে ক'রে সংসারের টুকি-টাকি শেষ পর্যন্ত অনেক-কিছুই এনেছিলুম মনে আছে। কোণের ঘরের দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে খাটটি পাতা হ'লো। কুলিটাকে বকশিষ দিয়ে বিছানা পাতিয়ে নিলুম। রাস্তার কল থেকে এক কুঁজো জলও এনে দিলো। এবার আমি হাত-পা ছড়ালুম বিছানার উপর।

নিস্তব্ধ দুপুর—লিচু গাছটা হাওয়ায় কাঁপছিলো—জানলা খুলে তাকিয়ে দেখতে আমার যে কী ভালো লাগলো। লিখতে জানি না, নইলে সমস্ত দুপুর ব'সে-ব'সে কবিতা লিখতুম। নিঃশব্দে আমার সুখের সময় গড়িয়ে গেলো, বিকেলে উঠে দরজায় তালা দিয়ে আবার বেরুলাম। রাত্রিবেলা ফিরলাম একেবারে সংসার নিয়ে। স্পিরিট স্টোভ, কেটলি, কাপ—চাল, ডাল, হাঁড়িকুড়ি—আমি যে কত কৃতী কাউকে দেখানো গেলো না, এই যা দুঃখ। তবু মনে-মনে মা-র কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হ'তে লাগলুম, তিনি আসবেন এবার তাঁর ছেলের সংসারে—ছেলের বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হ'য়ে বলবেন, 'তুই এতও পারিস?' খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছিলুম। খানিকক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর ঘুরলুম—বিছানাটা টান করলুম নিজের হাতে—তারপর এক সময়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আলো নিবিয়ে শুলুম এসে বিছানায়। একটু দূরে একটা বাড়িতে আলো জ্বলছিলো, কোন-এক সময় তাও নিবে গেলো,—আমি নির্ঘুম চোখে চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে উপভোগ করতে লাগলুম নিজের বাড়ির আরাম। আস্তে-আস্তে সিগারেটটা শেষ হ'লো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না—কেন ঘুম ভাঙলো তাও জানি না—থমথমে নিঃশব্দ ঘরে চোখ মেলে আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলুম। ভূত সম্বন্ধে আমার মনে ইতিপূর্বে কোনো বিকার ছিলো না, তাই এই নিরালা নির্জন রাতে একলা একটি ঘরে আছি, এ নিয়ে তিলমাত্র উদ্বেগ ছিলো না আমার। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম আমার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ছোটো-ছোটো নরম-নরম পাতলা পা ফেলে-ফেলে একটি মেয়ে এগিয়ে এলো ভিতরে। কাঁধের দুই পাশে তার লম্বা-লম্বা কালো চুল বেয়ে পড়েছে, দুটি নিটোল সরু আর সাদা হাত বুকের উপর ন্যস্ত, হাওয়ার মতো হালকা শরীর নিয়ে আস্তে-

আস্তে ঘরের মাঝখানটিতে এসে সে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। তারপর হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো মেঝের উপর—দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো কান্নায়। তার কান্নার অনুচ্চারিত শব্দ আমার সমস্ত প্রাণ-মন মথিত করলো। আমার বুকের মাধ্যও যেন একটি কান্নার ঢেউ ব'য়ে গেলো। তার অব্যক্ত অশ্রুত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমি প্রাণপণে আমার সমস্ত শক্তিকে কণ্ঠে একত্রিত ক'রে রুদ্ধ গলায় বললুম, 'তুমি কে?' চমকে মুখ তুললো মেয়েটি। কান্নায় তার গাল ভেজা, দুঃখের গভীরতায় অতলস্পর্শী তার চোখ। আমি ভালো ক'রে এবার তার মুখ দেখলুম—কী বলবো সে-মুখকে? সে-মুখ কি সুন্দর? সে-মুখ কি অবিস্মরণীয়? সে মুখের আকর্ষণ কি অনিবার্য? তা তো নয়! কিন্তু সে-মুখ অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অচিন্ত্য! তাকিয়ে দেখতে-দেখতে আমার মনে হ'লো আমার সমস্ত জীবনের সকল ইচ্ছা সকল কামনা যেন মূর্তি নিয়ে এসেছে আমার কাছে। সমস্ত দিন ধ'রে কি আমার অচেতন মন এই মেয়েটিকেই প্রার্থনা করেছিলো? আমি একটু ভয় পেলুম না, একটু অস্বস্তি বোধ করলুম না, কেবল মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে, আমার বুকের কম্পন দ্রুত হ'য়ে উঠতে লাগলো। মেয়েটি আমাকে দেখে আশ্চর্য হ'লো। কতক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালো সেখান থেকে। এইবার সে আমার কাছে আসবে, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবো—কেমন একটা উত্তেজনায় আমি উঠে বসলাম বিছানায়, ভাঙা-ভাঙা গলায় আবার বললাম, 'তুমি কে?'

মেয়েটি এসে আমার বিছানা থেকে একটু দূরে দাঁড়ালো, দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললো, 'আমি রাধা।' আমার মনে হ'লো তার কণ্ঠ বেয়ে যেন গান ঝ'রে পড়লো। কেমন একটা অদ্ভুত মধুর আওয়াজে ভ'রে উঠলো ঘর। ফাঁকা মাঠে ডাক দিলে যেমন প্রতিধ্বনি হয়, তার সেই সঙ্গীতময় কণ্ঠও আমার বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। আমি কথা বলতে পারলুম না। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সে আবার বললো, 'তুমি কে? তুমি কেন এসেছো? কেন আমার এই অতল দুঃখের তিলতম শান্তিটিও হরণ করছো তোমরা? আমাকে দয়া করো, দয়া করো—হে পৃথিবীর নিষ্ঠুর মানুষ—আমাকে দয়া করো।' তারপর সে দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো, পাখির মতো নরম হালকা শরীর সেই ক্রন্দনবেগে কেবল কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো।

আমি ব্যথিত হ'য়ে বললুম, 'শান্ত হও। তুমি কী চাও আমি জানি না—তোমার কোনো ইচ্ছার আমি অসম্মান করবো না—কিন্তু তুমি বলো তুমি কী চাও।'

মেয়েটি একটু আন্দোলিত হ'লো। হাতের পাতা থেকে মুখ তুলে বললো, 'আমি তো বলতেই চাই, কিন্তু কেউ শোনে না—আমাকে দেখলেই সবাই চীৎকার করে ওঠে, সবাই পালিয়ে যায়—অথচ আমার মৃত্যুর আগে কত লোক আমাকে ভালেবাসতো—কত লোকের সংস্পর্শে আমি ধন্য হতাম। এই ঘর, এই বাড়ি, কত পদস্পর্শে একদিন মুখরিত ছিলো। এইখানে, ঠিক এই জানালার পাশেই আমরা ঘুমুতাম—কত সুখরাত্রি—কত বিনিদ্র অবকাশ—কত মধুর আলাপনে আমরা সময় কাটিয়েছি তা কি তুমি জানো? একটু থেমে—'তারপরে এখানেই একদিন এই নিঃসঙ্গ শয্যায় কোনো-এক রাত্রে আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়লো।'

মেয়েটি স্তব্ধ হ লো। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো বিহ্বল গলায় বললুম, 'কেন? কেউ কি ছিলো না তোমার?'

'ছিলো না! বলো কি তুমি! আমার কেউ ছিলো না! আমার তো তিনিই ছিলেন—পৃথিবীতে কোন সুখ আছে, কোন আনন্দ আছে যা আমি তাঁর কাছ থেকে পাইনি! তাহ'লে শোনো—'

মেয়েটি আবার হাঁটু ভেঙে মেঝের উপর বসলো—দুটি হাতের পাতা মেঝের উপর রেখে শরীরের ভর রাখলো তার উপর। হাত বেয়ে-বেয়ে ছড়িয়ে রইলো তার লম্বা চুল—আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে তার কথা শুনতে লাগলুম।

আমার স্বামী ছিলেন দুর্লভ চরিত্রের মানুষ। তা কেবলমাত্র এইজন্যে নয় যে তিনি আমাকে অতিরিক্ত ভালোবাসতেন। মানুষ হিসেবেই তিনি অতি উঁচুদরের ছিলেন।

আমি যখন তাঁকে বিয়ে করলুম সমস্ত আত্মীয়রা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। তাঁদের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার কখনোই কোনো সংযোগ ছিল না—তাই তাঁদের চোখ আর আমার চোখও ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আসলে তিনি গাইয়ে-বাজিয়ে মানুষ ব'লে নানারকম সুনাম দুর্নামের অকারণ ভাগী হ'তে

হয়েছিলো তাঁকে। যে-কোনো তুচ্ছ কথাও পল্লবিত হ'য়ে রটনা হ'তো তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি খাঁটি শিল্পী—ও-সব পার্থিব নিন্দা-প্রশংসা তাঁকে স্পর্শ করতো না। সাধারণ মানুষের মতো তাঁর চরিত্র ছিলো না ব'লে অনেক কথা তিনি বুঝতেও পারতেন না।

সমস্ত যন্ত্রের উপরই ছিলো তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা। ঈশ্বর তার আঙুল-গুলোকে যেন সুর দিয়ে গ'ড়ে দিয়েছিলেন। যে-যন্ত্রের উপর যে-মুহূর্তে তিনি আঙুল ছোঁয়াতেন সেই মুহূর্তেই তা যেন প্রাণ পেয়ে কথা ব'লে উঠতো। আর সে সুর গতানুগতিক সুর ছিলো না—সে-সুর কী? সেই অনির্বচনীয় অনুভূতিময় শব্দ-সমন্বয়কে আমি কী নাম দেবো? হাওয়ায়-হাওয়ায় লীলায়িত হ'য়ে ফিরতো তাঁর সুর—সে-সুর শুনলে মানুষ আত্মবিস্মৃত না-হ'য়ে পারতো না। একদিন মনে আছে—কোনো-এক রাত্রে আমরা পাশাপাশি শুয়ে গল্প করছিলাম। তাঁর বাঁ হাতের উপর ছিলো আমার মাথা। ডান হাত দিয়ে তিনি আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি কৌতুক ক'রে বললুম, 'ও সঙ্গীতজলধি—তোমার আঙুলকে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না—হঠাৎ যদি এখন আমার চুল একটা চাঁদের আলোর গান গেয়ে ওঠে!'

'চাঁদের আলোর গান?' সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর গলা যেন ভ্রমরের মতো গুঞ্জন ক'রে উঠলো। আমার লম্বা চুলের মধ্য থেকে হাত তুলে নিলেন তিনি, তারপর বললেন, 'দাও বাজাই।'

'সে কী?'

'বা রে, তুমিই তো বললে। দাও, একটা চুল ছিঁড়ে দাও।'

'সত্যি?'

'সত্যি বলছি। তুমি তো ভালো কথাই বলেছো—চুলও তো একরকম সূক্ষ্ম তারই—বাজবে না কেন। নিশ্চয়ই বাজবে।' উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে বিছানার উপর উঠে বসলেন তিনি। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাঁর মুখ। সে-মুখ কি মানুষের? না দেবতার? আমি দিলুম একটা চুল ছিঁড়ে। লম্বা চুলটার একটা দিক আস্তে দাঁতে কামড়ে ধরলেন, আরেকটা দিক টান ক'রে হাতে টিপে ধ'রে ঠিক তারযন্ত্রে যেমন ক'রে আঙুল চালায় সে-রকম ক'রে বাজাবার চেষ্টা করলেন। আমি তাকিয়ে আছি স্থির চোখে, আমার কান সজাগ। হঠাৎ একসময়ে অত্যন্ত অবিশ্বাস্যভাবে জয়জয়ন্তীর

একটি খণ্ডস্বর যেন শুনতে পেলাম আমি—তক্ষুনি মিশে গেলো—আবার শুনলুম, আবার মিশে গেলো—শেষে অতি সূক্ষ্ম শব্দে একটানাভাবে বেজে চললো। আমি যেন কোনো ভৌতিক ব্যাপার দেখছি। আমার স্বামীকেই আমার ভয় করতে লাগলো। এ কে? এ কি মানুষ? গভীর আবেগে আমার কান্না এলো। হঠাৎ আমি তাঁর দু' পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে বললাম, 'থামাও! থামাও! আমার ভয় করছে।' পট ক'রে চুলটা ছিঁড়ে গেলো। কিন্তু তিনি থামলেন না· মাথা থেকে আরেকটা চুল ছিঁড়ে নিয়ে আবার বাজাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে আর বাজলো না। ঐ এক মুহূর্তের জন্য কি ঈশ্বর এসেছিলেন তাঁর আঙুলে?

ক্লান্ত হ'য়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি বললুম, 'ক্ষমতার সীমা আছে জানতুম—দেখলুম তা নেই।' তিনি আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু হাসলেন।

সঙ্গীতে আমার কান ছিলো অতিশয় তীক্ষ্ণ। এ-দখল আমার জন্মগত। স্বামীর সংস্পর্শে তা পরিণত হয়েছিলো শুধু। তাঁর নানারকম সব অদ্ভুত যন্ত্র ছিলো। মিস্ত্রি দিয়ে নানা আকারের সব খোল তৈরি করাতেন, তারপর তার বসাতেন নিজে। প্রচলিত কোনো যন্ত্রের মতো ছিলো না সে-সব, আর প্রচলিত কোনো রাগ-রাগিণীর চর্চাও করতেন না তিনি। তিনি ছিলেন স্রষ্টা। সমস্ত হৃদয়ভরা ছিলো তাঁর সুর—সুর তিনি তৈরি করতেন নিজে। যখন তিনি সুর তৈরি করতেন তখন অবিশ্রান্ত আমাকে কাছে ব'সে থাকতে হ'তো। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম কোনো ভুলও আমার কানকে ফাঁকি দিতে পারতো না। উনিও যে-ভুল কিছুতেই ধরতে পারতেন না, সে-সব পরমাণু ভুলও আমার কানকে নাড়া দিতো।

একদিন ওঁর বিশেষ একটি প্রিয় যন্ত্রে উনি সুর তৈরি করছিলেন—আমি চোখ বুজে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে শুনছিলুম। কিন্তু যতবারই উনি অন্তরায় এসে পৌঁছন, ততবারই কোথায় যেন কী ব্যাঘাত হয়, আর আমার চোখ আপনা থেকে খুলে যায়। যেন ভাত খেতে-খেতে হঠাৎ কাঁকর পড়েছে দাঁতে, তেমনি ক'রেই আমি শিহরিত হ'য়ে উঠি। আমার স্বামী বললেন, 'কিছুতেই ভুল হ'তে পারে না—তোমারই বাড়াবাড়ি—আমি ঠিক করছি!'

আমি বলি 'উঁহু।'

'আচ্ছা, আবার শোনো —' আবার তন্ময় হই—কিন্তু ঐ জায়গায় এসে ঠিক তেমনি শিহরিত হ'য়ে উঠি আবার। বার-বার দশ বারেও যখন ঐ ভুলের কোনো মীমাংসা হ'লো না তখন দেখলুম আমার স্বামীর চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠছে—শিল্পীর সুবৃহৎ চোখে অপার যন্ত্রণা। আর-একবার যেই শিহরিত হলুম অমনি উনি সেই যন্ত্রের বাটটি দিয়ে আমার মাথায় একটা আঘাত করলেন। ঐ আঘাতে সমস্ত তারগুলো একসঙ্গে ঝনঝন ক'রে বেজে উঠেই স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। আমি মাথায় হাত দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজলাম। মুহূর্তে সে-যন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি—তাঁর সকলের চেয়ে প্রিয় যন্ত্র এটি—সকলের চেয়ে অভিনব ছিলো এর সুরঝঙ্কার—সকলের চেয়ে বেশি চিন্তা করতে হয়েছিলো এটি উদ্ভাবন করতে। যন্ত্রটা মেঝের উপর আছাড় খেয়ে ফেটে গেলো —উনি উন্মাদ হাতে তারগুলোও পটপট ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে—ব্যাকুল আগ্রহে তুলে ধরলেন আমার মুখ, তারপর আমার অশ্রুসিক্ত গালের উপর প্রবল আবেগে নিজের মুখ ঘ'ষে-ঘ'ষে আদর করতে-করতে বললেন, 'তোমার চেয়ে প্রিয় আমার কেউ না—কিছু না—ঐ যন্ত্রটাও না! যার জন্য তোমাকে আঘাত করবার মতো দুর্মতি আমার হয়েছিলো, ঐ ছাখো তার দশা।' ভেবেছিলাম কঠোর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকবো, কিন্তু এর পরে কি তা সম্ভব? মুখ মুছে বললুম, 'আমার পাগলা শিব—' তারপর সযত্নে তুলে আনলুম যন্ত্রটি—কাপড়ের আঁচলে মুছে সন্তান-স্নেহে হাত বুলোতে লাগলুম ঐ ভাঙা কাঠ আর ছেঁড়া তারগুলোর উপর। ভর্ৎসনা ক'রে বললুম, 'ছি ছি ছি, এ তুমি করলে কী?'

অনেক গুণীমানীই পা রাখতেন আমার এই অপরিসর ঘরে। আমি সানন্দে সকলকে অভ্যর্থনা জানাতুম—চা ক'রে দিতুম নিজের হাতে—আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব সযত্ন ব্যবহার করতুম তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা সবাই আমাকে তাঁদের বন্ধুতা দিয়ে কৃতজ্ঞ করতেন। অনেককেই বলতে শুনেছি, 'গুণীর যোগ্য স্ত্রী আমি।' কিন্তু আমিও যে একজন গুণী এ-কথা যিনি বললেন তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রেই আজ আমার এই পরিণতি।

সংসারের সকল ভারই ছিলো আমার উপর। এ-সব বিষয়ে আমার স্বামী

ছিলেন নিতান্ত উদাসীন। আমি কী করলুম, ভালো করলুম কি মন্দ করলুম, এ নিয়েও তাঁর কোনো চিন্তা ছিলো না। তিনি সদাসহাস্য, সদাসুখী। আমি যে তাঁর গৃহে আছি এটাই ছিলো তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। এ-বাড়ির প্রত্যেক আনাচে-কানাচেও যে আমারই অস্তিত্ব এই অনুভূতিই ছিলো তাঁর কাছে মহা উপভোগ্য। এজন্যে একদিনের জন্যও আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারতুম না। শুধু যে তিনিই দুঃখিত হতেন তা নয়—আমারই মন কেমন করতো। বিয়ে হয়েছিলো আমাদের সাত বছর, কিন্তু আমাদের মনে হ'তো যেন সাত দিনও হয়নি। তখনও প্রতি রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে খানিক-ক্ষণের জন্য আমরা বিহ্বল হ'য়ে থাকতুম, মনে-মনে উপভোগ করতুম পরস্পরের সান্নিধ্যসুখ।

আমার স্বামী যে-সব সুর রচনা করতেন তা একটু অদ্ভুত। রাগ-রাগিণীকে দিয়ে তিনি সজীব মানুষের মতো কথা বলাতেন সুরে। সুরের মধ্য থেকেই আমরা কল্পনা করতে পারতুম তাদের রাগ-অনুরাগ, হাস্য-পরিহাস কিম্বা প্রণয়গুঞ্জন। যেন কখনো গম্ভীর কথাবার্তা হচ্ছে, কখনও চপলতা, কখনো গভীর প্রেমালাপ। এ-সব সুর যখন বাজতে থাকতো, আমার মনে তখন কথা তৈরি হ'তো। আস্তে-আস্তে সেই সুরগুলোকে আমি কথা দিয়ে মূর্তি দিতে লাগলাম। হয়তো কথাগুলো তেমন ভালো হ'তো না, কিন্তু তাইতেই সুরগুলো যেন আনন্দে আত্মহারা হয়েছে মনে হ'তো। উনি যখন বাজাতেন, সঙ্গে-সঙ্গে গুনগুন ক'রে আমি সে-কথাগুলো গাইতাম। না-গেয়ে পারতাম না।

সন্ধ্যাবেলা নানা লোকের সমাগমে আমাদের ঘর মুখরিত হ'য়ে উঠতো। সবচেয়ে কম আসতেন তিনিই যাঁকে নিয়ে আমার এই গল্প। সেদিন তিনি এসেছেন, আমার স্বামী আমাকে ডাকলেন। বিব্রত ছিলাম রান্নাঘরের কাজে—বললাম, 'তুমি বোসো গিয়ে, আমার দেরি হবে।'

'না, না, এসো—ইনি একজন অসাধারণ লোক—এঁর কাছ থেকে তুমি ঐ কথাগুলো ঠিক ক'রে নিতে পারবে।'

'কেন, উনি কি কথার কারিগর নাকি?'

'সত্যি, ঠাট্টা নয়—উনি গান নিয়ে ঠিক এই ধরণের চর্চাই করছেন। ওঁর ধারণা খুব স্পষ্ট।'

আলাপ ছিলো না এমন নয়, কিন্তু সামান্য। আমাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

আমার স্বামী বললেন, 'ইনি আমার সুরে অনেক কথা বসিয়েছেন—'আমার খুব ইচ্ছে আপনি সেগুলো একটু দেখেন।'

বিনীত গলায় বললেন, 'স্বয়ং আপনি যেখানে, সেখানে আমার যে কথা বলতেই ভয় করে।'

আমি বললুম, 'আপনার দক্ষতার পরিচয় অনেক পেয়েছি—কাছাকাছি পাবার যখন সুযোগ হয়েছে তখন ও-সব ব'লে আর সময় নষ্ট করবো না—বসুন।'

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণচোখে একবার আমার দিকে তাকালেন।

তাঁকে সুদর্শন বললে হাসাহাসি হবে, কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম। আমি মনে-মনে বললুম, 'গুণীজনোচিত বটে।' আমার পাগল স্বামী ততক্ষণে যন্ত্রের কান টানাটানি করছেন। হেসে বললুম, 'ওঁকে আগে চা ক'রে দি।'

আমি দেখেছি গাইয়ে বাজিয়ে লোকেরা ভারি চা খায়। আমার স্বামীকে যদি অবিরত কেবল কাপের পর কাপ চা দিয়ে যাই, উনি সানন্দে তা গ্রহণ করবেন, কিন্তু তা তিনি পান না—বরঞ্চ এ নিয়ে অনেক সময় অনেক বকুনি খান। কাজেই এই ভদ্রলোকটির উপরই ইনি প্রসন্ন হ'য়ে উঠলেন। হাসি-মুখে বললেন, 'এই এতক্ষণ পরে একটা ঠিক কথা বলছো তুমি। মাঝে-মাঝে তুমি এত ভালো হও কেমন ক'রে?'

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন।

দেখলুম, আমার স্বামীর চাইতেও চা-খোর মানুষ আছে। এঁরা দু'জনে মিলে বড়ো রুপোর পটটি শেষ ক'রে গানে বসলেন।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কথাগুলো দেখালেন না?'

আমি ভারি কুণ্ঠিত হলাম। ঘন-ঘন তাকাতে লাগালাম স্বামীর দিকে—তিনি বললেন, 'বা রে, এতে আর একটা সংকোচের কী আছে? সবাই আমরা সমধর্মী। তুমি তো একজন কম নও—'

'আপনারও এ-সব নেশা আছে নাকি?'

'আছে নাকি মানে ?'—আমার স্বামী যন্ত্রের কান টেপা ছেড়ে সোজা হ'য়ে বসলেন—'এঁর কান যা সূক্ষ্ম তা যদি আমার থাকতো আজ সমস্ত পৃথিবী আমি জয় ক'রে ফেলতুম। তাছাড়া ইনি একটি অসাধারণ কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী।'

'সত্যি ?'—কথাটা ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন যাতে একটু ঠাট্টার যেন গন্ধ পেলুম। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ওঁর ধারণা বোধ হয় বেশি উঁচুতে ওঠে না—তাছাড়া স্ত্রীর প্রশংসারত মানুষটিকে বোধ হয় তাঁর কাছে একটু স্ত্রৈণ বলেই বোধ হ'লো।

আমি বললুম, 'হয়তো ভাবছেন এই অতিশয়োক্তি আমি ওঁর স্ত্রী ব'লেই উনি করছেন। তা কিন্তু নয়। অতিশয়োক্তি করা ওঁর স্বভাব। তাছাড়া শিল্পীরা তো একটু উচ্ছাসপ্রবণই হন—এতটুকু ভালো দেখলেও আনন্দে আকুল হ'য়ে ওঠেন।'

'তাহ'লে নিজের গুণ সম্বন্ধে আপনিও নিঃসংশয়—এক্ষুনি আপনার লেখাগুলো আমাকে দেখানো উচিত।'

বিরক্ত হলাম। মুখে তবু হাসি রাখলাম সযত্নে। খুব সহজ হ'য়ে বললাম, 'সৎ সঙ্গে তো আছি—কিন্তু লেখাগুলো আমি আপনাকে দেখাবো না।'

'নিশ্চয়ই দেখাবে।'—আমার স্বামী তক্ষুনি লেখাগুলো আনবার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

আমি হেসে বললুম, 'উনি কি পাবেন, ভেবেছেন ? উনি কি জানেন এ-বাড়ির কোথায় কী আছে ?'

'কেন ?'

'ওঁর সংসার মহৎ—তাই আমি আর আমার ঐ ছোটো সংসারে ওঁকে টেনে আনি না।'

'তার মানে ?' ভদ্রলোক একটু মনোযোগ দিলেন আমার কথায়।

'মানে তো আপনার জানবার কথা, এ-সব মানুষকে দিয়ে কি আর কখনো চাল-ডালের হিশেব করানো যায় ? এমনিতেই তো এই দরিদ্র দেশে শালগ্রাম শিলা দিয়ে সর্বদাই শিল-নোড়ার কাজ করানো হয়।- সংসারের চাপে ওঁকে যে উপার্জনের জন্যে সময় নষ্ট করতে হয় এটাই আমার কাছে একটা মর্মান্তিক পরিহাস মনে হয়, তার উপরে যদি গয়লার হিশেব আর মাছের বাজার, ধোপার কাপড় আর ছেলের বার্লির খোঁজও ওঁর ঘাড়েই চাপানো যায়,

তাহ'লে আর ওঁর জীবনে থাকে কী? এ-বাড়ির কোন জিনিশ কী-ভাবে কোথায় আছে তা উনি কিছুই জানেন না। আর জানলেও ওঁর মনে থাকে না।'

'আশ্চর্য তো!' ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক হলেন।

আমার স্বামী পর্দার ফাঁকে মুখ বার ক'রে বললেন, 'কী যে কোথায় রাখো— কিচ্ছু যদি পাই দরকারের সময়!

আমি হেসে উঠে গেলাম। দেখলুম, ঐ সময়টুকুর মধ্যেই ঘরে একটি দক্ষ-যজ্ঞের ব্যাপার হয়েছে। গোছানো বিছানা উলট-পালট—পরিচ্ছন্ন টেবিল একটি আস্তাকুঁড়।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই তীব্রচোখে তাকালাম ওঁর দিকে।

ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝেকে বললেন, 'পাই না তা কী করবো।'

'তাই ব'লে এ-রকম করবে ঘর-দোর—' গম্ভীর মুখে নির্দিষ্ট জায়গায় হাত দিয়ে বার করলুম লাল চামড়ার খাতাটি, তারপর বললুম, 'জানা কথাই তো পাবে না, কেবল অগোছাল ক'রে আমার কাজ বাড়ানো!'

তাড়াতাড়ি মুখের কাছে এগিয়ে এলেন উনি—আমি বললাম, 'অসভ্যতা করতে হবে না।'

'তবে বলো রাগ করোনি।'

'তা বলবো কেন—রাগ না-করবার কী আছে বলতে পারো? এটা কিন্তু আমি দেখাবো না।'

'কেন দেখাবে না?'

'আমার ইচ্ছে।'

'সবই তোমার ইচ্ছে—আর আমার ইচ্ছে নেই।' টেনে উনি খাতাটা নিয়ে নিলেন।

সংকোচ ছিলো সত্যি। প্রথম কথা, আজকেই প্রথম নয়—আরো দু'-একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে যা সামান্য আলাপ হয়েছিলো তা থেকেই বুঝেছিলাম স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইনি মনের মধ্যে একটা অবহেলা পোষণ করেন—কেমন যেন সদয় ভাব। কিন্তু সংকোচ কেটে গেলো যখন উনি মুখ তুললেন। খাতাটা কোলের উপর রেখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে, তারপর বললেন, 'চমৎকার।' আমার স্বামী খুশি হ'য়ে বললেন, 'কিছুতেই কি দেখাবে, জোর ক'রে নিয়ে এলাম—আমি জানতাম এ আপনি তুচ্ছ করতে পারবেন না।'

'এ-কথাগুলো আপনি গেয়ে যেতে পারেন?'

লজ্জিত হ'য়ে বললুম, 'আমি কি গান করতে পারি, না শিখেছি!'

'গান তো ঐশ্বরিক—এ কি শিক্ষাসাপেক্ষ? এই যে কথা দিয়ে আপনি এমন বিরহ-মিলনের অদ্ভুত তত্ত্ব তৈরি করেছেন—এ কি কেউ শেখালে কোনোদিনই পারতেন? আমি তো সমস্ত জীবনের সাধনাতেও এমন একটি সহজ সুন্দর আবেষ্টন কিছুতেই তৈরি করতে পারতাম না।'

আমি এ-কথায় আরক্ত হলাম। আমার স্বামী বাজাতে শুরু করলেন। বাঁশি বাজলে যেমন সাপ না-নেচে পারে না—উনি বাজাতে শুরু করলেও আমার গলা দিয়ে আপনিই স্বর বেরিয়ে আসে। খাতা দেখে গানগুলো আমি গাইলাম। ক্রমে বাজনা নিবিড় হ'য়ে-হ'য়ে শেষে সূক্ষ্ম হ'লো—অবশেষে থামলো—আমিও থামলাম।

ঘরের মধ্যে তিনটি প্রাণী স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি—কারো মুখে কথা নেই। দেখলুম, ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুগ্ধতার আবেশে গভীর—আমার উপরই সে-দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর মুগ্ধতা অনুভব ক'রে রোমাঞ্চিত হলুম—অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ঘন-ঘন তাঁর মুখের উপরই আমার চোখ ঘোরাফেরা করতে লাগলো—কিন্তু তাঁর দৃষ্টি স্থির।

একসময়ে নিশ্বাস ফেলে উঠে বললেন, 'আজ যাই।'

'সে কী, আর-একটু বসুন।' আমার স্বামী ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।

'না—আজ আর অন্য-কিছু নয়।' ধীরে-ধীরে উনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে স্বামীকে বললুম—'তুমি ভালো বলো, তাতে হৃদয় আপ্লুত হয়—তুমি যে কত ভালোবাসো তারই প্রমাণ পাই বারে-বারে, কিন্তু মনের অবচেতনে বোধহয় যারা ভালোবাসে না, তারা কিছু বলুক, নিরপেক্ষ কোনো লোক সত্যি-সত্যি আমার মধ্যে কিছু আছে কিনা তা বিচার করুক, এটাই চেয়েছিলাম।'

আমার স্বামী বললেন, 'তুমি তো দেখাতে চাওনি। আমি জানতাম এমন দিন আসবেই যেদিন তোমাকে কেউ গুণীজনের স্ত্রী ব'লেই সম্মান করবে না—তোমার জন্যই তোমার সম্মান হবে।'

আমি বললুম, 'সম্মানের জন্য নয়, তোমার যোগ্য হবার জন্যই আমার বড়ো হ'তে ইচ্ছে করে।'

এ-কথার পরে আমার স্বামী চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর স্পর্শে অনুভব করলুম তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়েছেন।

বাড়িটি আমাদের দু'জনের পক্ষেও ছোটো—তারই মধ্যে একটি ঘরে একটি ঘর-জোড়া নিচু তক্তাপোশের উপর নানারকম খাঁজ কেটে নানারকম যন্ত্র রাখা হ'তো। সকালবেলা ঘুম ভেঙেই তিনি ও-ঘরে যেতেন—ওখানেই চা খেতেন—আর রেওয়াজ করতেন। তিনি যতক্ষণ রেওয়াজ করতেন ততক্ষণ আমি সংসারের কাজে ঘুরে বেড়াতুম। কতগুলো স্বভাব তাঁর একেবারেই ছেলেমানুষের মতো ছিলো। খাওয়া-পরা সকল বিষয়েই তাঁর মনের মধ্যে কতগুলো কল্পনা থাকতো—অথচ মুখে তা তিনি বলতেন না—কিন্তু তাঁর ইচ্ছা বা অভ্যেস আমার এতই মুখস্থ ছিলো যে আমি তাঁর সঙ্গে দু'একটা কথা ব'লেই তাঁর সকল ইচ্ছা বুঝতে পারতুম আর সেই অনুসারে ব্যবস্থা করতুম। কখনো কদাচিৎ সেই ব্যবস্থার ত্রুটি ঘটলে ভারি ছেলেমানুষি করতেন। তা ছাড়া অসম্ভব অগোছালো ছিলেন ব'লেও তাঁকে নিয়ে আমার মুশকিল হ'তো। গানের ঘরেই সেই নিচু তক্তাপোশের পাশেপাশে ছোটো-ছোটো শেলফে তাঁর গানের বই, খাতা, রেকর্ড, স্বরলিপি আলাদা-আলাদা ক'রে সাজানো থাকতো। প্রত্যেক শেলফে একটা ক'রে ঢাকা ঝোলানো থাকতো—তার মধ্যে সুতোর অক্ষরে লেখা থাকতো কোনটার মধ্যে কী আছে। অথচ প্রত্যহ উনি বইয়েরটাতে খাতা, খাতার মধ্যে রেকর্ড, রেকর্ডের বাক্সে স্বরলিপি ঢুকিয়ে একটা অস্থির কাণ্ড ক'রে রাখতেন। এ নিয়ে বকুনি খেতেন যথেষ্টই, কিন্তু শোধরাবার চেষ্টা ছিলো না—বেশি কিছু বললে এমন একটা ক্ষমা-প্রার্থীর ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাতেন যে ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে আর-কিছু বলতে ইচ্ছে করতো না।

সেদিন সকালবেলা উঠেই আবার সেই সুরটি তৈরি করতে বসলেন (যেটি অন্তরায় এসে ভুল হচ্ছিলো)। আমি বললুম, 'অসম্ভব। এই সকালে আমি কাজ-কর্ম ফেলে বসতে পারবো না।'

কিন্তু তা কি আর হয়। বসলুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো—কিন্তু সেই

একই ভুল! কেন ভুল—কিসে শোধরাবে—কিছুই বার করা গেলো না। ভারি হতাশ হলেন উনি—ভালো ক'রে খেতে পারলেন না—কোনো কাজে মন দিলেন না, সারাদিন অন্যমনস্ক হ'য়ে কেবলই হাতে তুড়ি দিয়ে-দিয়ে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন।

আমি বললুম, 'ব্যাকুল হোয়ো না—নিশ্চয়ই একদিন এ-সুর ধরা দেবে তোমার কাছে।' উনি বললেন, 'উঁহু—এজন্য চাই ভাষা—ভাষার আবেদনে যদি সুর আসে—চলো, আমি আবার বাজাবো আর তুমি কথা তৈরি করবে।'

সমস্ত দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'য়ে গেলো—ক্লান্তিতে অবসন্ন হলুম—সুর এলো না। আমি উঠে এলুম, উনি যন্ত্র হাতে ব'সে রইলেন ধ্যানস্থ হ'য়ে।

সন্ধেবেলা আবার এলেন সেই ভদ্রলোক। দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালুম। আমার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদুহাস্যে বললেন, 'ভালো আছেন? পণ্ডিত কই?' আমার স্বামীকে তাঁর সমসাময়িকরা অনেকেই পণ্ডিত ব'লে সম্বোধন করতেন। পাখা খুলে দিয়ে বললুম, 'বসুন, ডাকছি।'

গানের ঘরের ভেজানো দরজা খুলে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। ঘরটা যেন সুরে ভ'রে গেছে—দেয়ালে-দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তারের ঝংকার, আর সেই একঘর সুরের মধ্যে ব'সে আছেন আমার স্বামী, হাতের আঙুল বেয়ে তাঁর নেমে আসছে সুরের বন্যা। দুই চোখ তাঁর বোজা, নিজের মধ্যেই নিজে তিনি মগ্ন। ডাকলুম, 'শোনো—' দাউ-দাউ আগুনের মধ্যে থেকে যেন উনি বেরিয়ে এলেন—ডাক কানে যেতেই চকিত হ'য়ে চোখ তুললেন, আমার দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত গলায় ব'লে উঠলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি—তুমি আশ্চর্য! তুমি মহৎ! তোমার কাছে আমি হার মানলাম আজ।'

আমি লাফিয়ে উঠলুম, 'পেয়েছো? ঠিক সুর পেয়েছো?'

'তখন তুমি গাইছিলে—তোমার গলা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছিলো সে-সুর। চোখ বেঁধে দিলে অন্ধ যেমন কাছ ঘেঁষে যায় অথচ চোর ধরতে পারে না—ঠিক সে-রকম একটা আন্দাজ পাচ্ছিলাম তোমার গলায়—কিন্তু আমি ধরতে পারছিলাম না—এইবার পেয়েছি—এসো।'

বললুম, 'ঐ ভদ্রলোক এসেছেন।'

'কে? কবি?'—ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, আমি

একেবারে স্নান ক'রে আসি।' আমি এ-ঘরে চ'লে এলুম। অন্ধকার হ'য়ে এসেছিলো—আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বললুম, 'আজ সমস্তটা দিন উনি পাগলের মতো খেটেছেন। স্নান ক'রে আসছেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনিও কি ব্যস্ত?'

'না, ব্যস্ত আর কি।'

'তাহ'লে বসুন না।'

বসলুম।

একটু পরে উনি বললেন, 'নতুন কিছু লিখলেন?'

লজ্জিত হ'য়ে বললুম, 'কী আর।'

'আশ্চর্য আপনার সৃজনীশক্তি! আপনি যখন গান করেন তখন আপনি সৃষ্টি করেন—আমি তো ভাবতেই পারি না মেয়েদের মধ্যে কী ক'রে আপনি সম্ভব হলেন!'

বললুম, 'আমাকে অত অসামান্য ক'রে দেখছেন, সে আপনারই মহত্ত্ব! কিন্তু এ-কথা না-ব'লে পারছিনে যে মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার আশাটা বেশি উঁচু নয়, সম্মানটা তত গভীর নয়।'

'আমার? কখনোই না। আপনি ভুল বলছেন। আমি অনেক দেখেছি, অনেক ভেবেছি—কিন্তু পুরুষ এনে দেবে আর তাঁরা খাবেন আর সন্তানপালন করবেন, এ ছাড়া তো দ্বিতীয় অবস্থা আমি দেখিনি।'

একটু আহত হ'য়ে বললাম, 'আজকাল অন্তত এ-কথা খাটে না।'

'আজকাল? আজকালকার অবস্থা আরো শোচনীয়!'

ভদ্রলোকের নিজের কথার উপরে এত দৃঢ় প্রত্যয় যে আমি আর কথা কাটলাম না।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন, 'রাগ করলেন?

'না তো।'

'তবে যে জবাব দিলেন না?'

'কী বলবো বলুন।'

পরদা ঠেলে আমার স্বামী ঘরে ঢুকে বললেন, 'একেবারে স্নান ক'রে নিলাম।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু চা দাও ওঁকে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওঁর সঙ্গে আমার তর্ক হচ্ছিলো মেয়েদের নিয়ে—'

'ওরে বাবা, ওদিকেই যাবেন না—ইনি কিন্তু ভীষণ ফেমিনিস্ট। তার চেয়ে চলুন ও-ঘরে যাই।' ভদ্রলোককে নিয়ে আমার স্বামী গানের ঘরে এলেন—আমি চায়ের কথা ব'লে গা ধুতে গেলুম।

ফিরে এসে দেখলুম গানের টেকনিক নিয়ে কথা বলছেন ওঁরা। আরো অনেক আগন্তুকে ঘর একেবারে ভর্তি। বক্তা বলতে গেলে একমাত্র আমার স্বামীই। গান সম্বন্ধে তাঁর মনে কতগুলো অদ্ভুত ধারণা ছিলো—অন্যেরা তা হয়তো বুঝতেন না, কিম্বা বুঝলেও একেবারে নতুন-কিছু করতে ভরসা পেতেন না। চায়ের ব্যবস্থা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সবাই কথা থামিয়ে আমাকে একবার অভিবাদন জানিয়ে আবার কথা আরম্ভ করলেন। আমি নিচু হ'য়ে চা ঢালতে-ঢালতে শুনছিলুম ওঁদের আলোচনা—সহসা সেই ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কিছু বলুন—এর সহজ মীমাংসা বোধ হয় একমাত্র আপনিই ক'রে দিতে পারবেন।'

এ-কথায় আমি চকিত হ'য়ে চোখ তুললুম—অনেক জোড়া চোখও আমার উপরে নিবদ্ধ হ'লো। এত সব সূক্ষ্ম আর জটিল তর্কের মধ্যে যে আমাকেও কথা বলবার জন্যে কেউ আহ্বান করছেন এটা আমার পক্ষে সম্মানের সন্দেহ নেই—অন্যদের দিকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলুম অন্য-কোনো চোখেও এ-কথাটার সায় আছে কিনা। হতাশ হ'য়ে আমার দৃষ্টি ফিরে এলো—বললুম, 'ঠাট্টা করছেন?'

'ঠাট্টা! আমার কথা শুনে কি আপনার ঠাট্টা মনে হ'লো?

'আমি যাই মনে করি না কেন—অন্য সবাই একথাকে তা ছাড়া আর-কিছুই মনে করেন নি।'

সকলের গলায়ই একটি মৃদু আপত্তির গুঞ্জন উঠলো, 'এ আপনার অন্যায় ধারণা। সত্যিই কিছু বলুন না এ-বিষয়ে।'

আলগা শোনালো তাঁদের প্রতিবাদটা। আমার স্বামী নিবিষ্ট হ'য়ে কী ভাবছিলেন, হঠাৎ বললেন, 'সত্যি তুমিই বলো না—আমাদের সঙ্গীত কি এখন একেবারেই নিষ্প্রাণ হ'য়ে যায়নি? কী আছে এর মধ্যে? একে আবার গড়তে হবে-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে সুরের মধ্যে। আমি রাগ মানি না, রাগিণী মানি না—'

বাধা দিয়ে একজন বললেন, 'তাই ব'লে তো আপনি এক ফুঁয়ে এ-সব

রাগিণীকে উড়িয়েও দিতে পারেন না—আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে এ-সব সুর—'

আমি বললুম, 'আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে ব'লেই যে সেটাই চরম তা কেন বলছেন? আর এ-কথা কি কেউ জানে যে সত্যি-সত্যি কোন রাগিণীর কখন কী রূপ ছিল? একশো বছর আগে এই ভৈরবীই যে রাত্রে গাওয়া হ'তো না আর ইমনই যে ভোরে গাইবার প্রচলন ছিলো না তা কে জানে?'

'তাই ব'লে কোনো-একটা নিয়মকে ভেঙে দেবো, এ-রকম একটা পণ ক'রে গান করতে বসাও কম বিড়ম্বনা নয়।'

'উঁহু, তা নয়—' ভদ্রলোক ঈষৎ উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'উচ্ছৃঙ্খলতাটাই যে প্রগতি তা তো উনি বলছেন না। এখন সংগীত এসে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেখানে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় যদি এর রীতি না বদলায় তাহ'লে আনন্দের উপলব্ধিটা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হবে।'

আমার স্বামী খুশি হলেন এ-কথায়। অত্যন্ত মধুর ক'রে একটু হাসলেন, তারপর হাত বাড়িয়ে একটা যন্ত্র টেনে নিলেন। স্নেহভরে খোলটার উপর হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'এটা কী? সেতার না এস্রাজ? বেহালা না বীণা? তানপুরা না তবলা? কী এটা? চেনো না তোমরা? কিন্তু তাই ব'লে কি এটার মূল্য তোমরা কম বলতে চাও? আর আমার রচিত যে-সুরটি আমি এখন বাজাবো', (তাঁর অঙুল কথার সঙ্গে-সঙ্গে তারের উপর লীলায়িত হ'লো) 'বলো দেখি তা পূর্বী না পুরিয়া, জয়জয়ন্তী না তিলক কামোদ, কানাড়া না বারোয়াঁ—বিশ্লেষণ করলে কি ঠকলে—' আমাকে গাইবার জন্য ইশারা করলেন—তারগুলো সব ঝম্‌ঝম্ ক'রে উঠলো তাঁর স্পর্শে।

আমি বললুম, 'আমি কি জানি এটা?'

ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়ই জানেন—আপনি জানেন না এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।'

আমার স্বামী বললেন, 'এত সংকোচ থাকলে হয় কখনো? আশ্চর্য ওঁর কান।—আচ্ছা দেখুন তো, যে-সুরটা আমি বাজাচ্ছি এর কোনো জায়গায় আপনাদের খটকা লাগে কিনা।' ঢেউয়ের মতো তারের উপর দিয়ে আমার

স্বামীর আঙুল গড়িয়ে যেতে লাগলো—দু'একজন নিতান্ত সজাগ প্রহরী ছাড়া আপনা থেকেই সকলের চোখ বুজে এলো।

একজন তার্কিক উশখুশ করছিলেন—বাজনাটা থামতেই ব'লে উঠলেন, 'ভুল কোথায়, তা ঠিক বুঝছিনে, তবে ভুল যে হ'চ্ছে এটা কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে।'

ভদ্রলোকটি বললেন, 'তা বললে তো চলবে না, ভুলটা কোথায় তাই আপনাকে ধরতে হবে।'

'আপনি পেরেছেন?'

'না।'

'তবে?'

'তবে কী। আমি তো তর্কও করিনি।'

আর সবাই চুপ ক'রেছিলেন—এর মধ্যে কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক চুল ভুল রয়েছে কারো কানেই সেটা ধরা পড়েনি।

আমার স্বামী বললেন, 'এ-ভুল আমিও ধরতে পারিনি, পেরেছেন উনি। আর ভুলের সংশোধনও আমি ওঁর গলা থেকেই পেয়েছি। এই শুনুন—'। তিনি আবার অন্তরাটা ধরলেন—'আমি সুর তৈরি করি, কিন্তু তাই ব'লে তা তো অনিয়মে চালাইনি—একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে এর মধ্যে—একটা সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় আবদ্ধ আছে এ-সব সুরের পর্দা—সেই পর্দাচ্যুত হচ্ছিলাম—অথচ বুঝতে পারছিলাম না—এই দেখুন নিখাদ আর রেখাব থেকে কেমন ক'রে সুরটা আমাকে টেনে রাখতে হবে। এখানে আঙুল হেলাবো না—কিন্তু মনে হবে হেলাচ্ছি—দুটো শ্রুতি বার করতে হয়েছে এখান থেকে। এই দেখুন।'

প্রত্যেকেই কান পেতে গ্রহণ করলেন তফাৎটা—একটু অবাক হলেন সত্যি-সত্যি আমার এই সূক্ষ্ম শ্রুতিবোধ দেখে। চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে-দিতে একজন বললেন, 'আশ্চর্য তো আপনার কান।' ভদ্রলোক চুপ ক'রে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে—চোখে চোখ পড়তেই মাথা নিচু ক'রে গানের কথাগুলো দেখতে লাগলেন। এক সময়ে মুখ তুলে বললেন, 'আপনারা কি শুধু ওঁর শ্রুতিবোধটাই দেখলেন—ওঁর অদ্ভুত রচনাশক্তিতে আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি। এ-ধরনের রচনা সত্যিই বিরল।'

আমি অস্বস্তি বোধ ক'রে উঠে দাঁড়ালুম। ভদ্রলোক বললেন, 'কী বলবো পণ্ডিত, আপনার স্ত্রীভাগ্যে ঈর্ষা না-ক'রে পারছি না।'

পণ্ডিত মৃদু হাসলেন—আমি ঘরে চ'লে এলুম।

এর পরে সেই ভদ্রলোক যেদিন এলেন আমার স্বামী বাড়ি ছিলেন না। আমি দ্বিধাজড়িত গলায় বললুম, 'উনি এখুনি আসবেন—বসুন না একটু।'

'তা উনি নাই বা এলেন—' নিতান্ত সহজ গলায় হাসিমুখে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি তো আছেন। আপনার সঙ্গও আমার কাছে পণ্ডিতের চাইতে কম লোভনীয় নয়।'

বিনয় ক'রে বললুম, 'কত ভাগ্যে আপনাদের মতো গুণীমানীর সাহচর্য লাভে ধন্য হচ্ছি, কত পুণ্য করেছিলাম তাই আমার বাড়ি আপনারা ধন্য করেন—কিন্তু তাই ব'লে আমি তো এটুকু বুঝি যে আমার মধ্যে এমন-কিছুই নেই যা দিয়ে আপনাদের ধ'রে রাখতে পারি।'

'আপনার বিনয় অনুকরণীয়—' হাতের ছাতাটি দেয়ালে ঠেশ দিয়ে আরাম ক'রে বসতে-বসতে ভদ্রলোক বললেন—'আমি কিন্তু অনেক পরিশ্রম ক'রে এলাম। আমাকে এক্ষুনি একটু চা দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই—'চায়ের জল চাপিয়ে এসে আবার বসলুম।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার রচনা দেখে সত্যি আমি আশ্চর্য হয়েছি। সুরগুলোকে কথা দিয়ে মূর্তি দেওয়া তো সহজ নয়—ক'দিন লাগে আপনার ?'

আমি এ-কথার অবতারণায় একটু কুণ্ঠিত হলুম। বললুম, 'ও আর কী। হয়তো ভালো ক'রে কিছু করলে সময় লাগতো—আমি ওঁর সুর বাজানোর সঙ্গে-সঙ্গেই কথা তৈরি করি—বাজানাটা থামলে আর পারি না। সুরে-সুরে আমি কথোপকথন শুনতে পাই।'

'শুনতে পান! তাই তো—শুনতে না-পেলে কি কেউ এমন সহজে এমন আশ্চর্য কথা লিখতে পারে। মনেরও তো একটা কান আছে। আমি একটা বৃহৎ উপাখ্যান লিখছি—সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি যত রাগ-রাগিণী আছে তাদের নিয়েই আমার এই উপাখ্যান। যখন যে রাগিণীই আমার নায়িকা হয় তখনই তার মধ্যে আমি যেন ঠিক আপনাকে দেখতে পাই। কেন এমন হয়, বলতে পারেন ?'

অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে বললুম, 'কী যে বলেন।'

'দেখুন, আপনাকে দেখবার আগেই আমি উপাখ্যানের প্রথম অধ্যায় লিখতে শুরু করি—কিন্তু কিছুতেই আপন অন্তরের মধ্যে তাকে উপলব্ধি করতে পারছিলুম না—আর এখন আমি লিখতে-লিখতে কোথায় চ'লে যাই—কী আনন্দে যে আমার অন্তর ভ'রে ওঠে—'। একটু বিহ্বল হ'য়ে থেমে রইলেন ভদ্রলোক, তারপর কথার স্বর বদলে ফেলে বললেন, 'ভেবে দেখলুম শাস্ত্রে যে মেয়েদের শক্তি ব'লে আখ্যা দিয়েছে কথাটা খাঁটি সত্যি—'।

জুতোর শব্দ করতে-করতে পণ্ডিত এসে ঘরে ঢুকলেন। ঘোরাঘুরিতে বিস্রস্ত চুল—ঈষৎ লালচে ও ঘর্মাক্ত মুখ—আমি মুখের দিকে তাকালুম। পরিশ্রমেও কি মানুষকে এমন মনোহর করে? অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু দেরি করেছেন ফিরতে—ভিতরে-ভিতরে একটা উৎকণ্ঠা চলছিলো—যদিও খুব প্রত্যক্ষভাবে আমি তা টের পাচ্ছিলুম না—কিন্তু তাঁকে দেখে হৃদয়টা হঠাৎ যেন একটা নিশ্চিন্ততায় ভ'রে গেলো। আমার মুখ-চোখ আপনা থেকেই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। ভদ্রলোককে দেখে আমার স্বামী বললেন, 'এই যে, কতক্ষণ?'

'মন্দ নয়—'

'আমার আজ একটু দেরি হ'য়ে গেলো।'

'তা আর কী হয়েছে, ইনি ছিলেন।'

'বসুন।'—আমার স্বামী ভিতরে এলেন, এসেই আবার মাথা বার ক'রে দিয়ে বললেন, 'চমৎকার একটা সুর ভেবেছি—আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবো—আসছি।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'পণ্ডিত একেবারে খাঁটি শিল্পী।' সম্পূর্ণ সায় দিয়ে বললুম, 'সত্যি—' ভিতরে আসবার তাগিদে উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক বললেন, 'এতক্ষণে আপনার মুখ দেখে মনে হ'চ্ছে আপনার যেন প্রাণ এলো।'

লজ্জিত মুখে বললুম, 'কই, না তো।'

চায়ের ব্যবস্থা ক'রে খুঁটিনাটি নানারকম কাজ সেরে ও-ঘরে যেতে আমার দেরি হ'লো। গিয়ে দেখলুম ভদ্রলোক উঠি-উঠি করছেন। আমি যেতেই আমার স্বামী বললেন, 'তুমি কী করছিলে? তুমি নিজের হাতে চা দাওনি ব'লে ইনি খেতে পারলেন না—তুমি ছিলে না ব'লে ওঁর আর বসতেও ভালো লাগছে না।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিতান্ত মিথ্যা বলেননি পণ্ডিত—এ-বাড়িতে আপনার অনুপস্থিতিটা একেবারেই সহ্য হয় না। আজ উঠি—'

'এক্ষুনি? এই তো এলেন।'

'আছি তো নানান্ বিপাকে—' এই ব'লে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

তিনি চ'লে যেতেই আমার স্বামী হাই তুলে বললেন, 'যাই স্নান ক'রে আসি। ট্রামে বাস্-এ কি আর আজকাল চড়া যায়? নরক—একেবারে নরক। কী ক'রে যে ঝুলে-ঝুলে বাড়ি ফিরি।'—চ'লে গেলেন তিনি স্নান করতে।

তাঁর চ'লে-যাওয়ার দিকে তাকিয়ে গভীর ভালোবাসায় আমার হৃদয় উছল হ'য়ে উঠলো—একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

একটু পরেই উনি স্নান সেরে বেরিয়ে এলেন। একটা গেরুয়া রংয়ের পাজামার উপরি একটা সিলকের চাঁপা ফুলের রংয়ের পাঞ্জাবি পরেছেন, মাথার চুল চুঁইয়ে জল পড়ছে টপটপ ক'রে—জলের স্পর্শে চোখ দুটি রক্তবর্ণ। আকাশে বাতাসে আজ কী দেখেছেন উনি, অত্যন্ত উন্মনা—মাথা না-আঁচড়েই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। বুঝলাম, ভিতরে-ভিতরে ওঁর সৃষ্টির কাজ চলেছে। নিঃশব্দে খাতা আর কলম সাজিয়ে দিলাম টেবিলে—তারপর শুকনো তোয়ালে দিয়ে জল-ভরা চুল মুছে দিতে-দিতে বললাম, 'তুমি হ'লে কী? চুলটাও মুছতে পারো না ভালো ক'রে?' সচেতন হ'য়ে ফিরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ বললেন, 'তোমার নাম কি সরস্বতী? তুমি কি ভালোবাসো আমাকে, না আমার সৃষ্টিকে?' আমার কী মনে হয়, জানো? তুমি সেই ধরনের মানুষ, যারা গুণীর মর্যাদা দেবার জন্যই উন্মুখ– তাঁদের সুখ-সুবিধার অভাব হয়েছে শুনলেই হৃদয় হাহাকারে ভ'রে যায়—কিন্তু স্বামী ব'লে কোনো আলাদা ভালোবাসা কি আছে তাদের অন্তরের মধ্যে?'

হাতের কাছে চিরুনিটা দিয়ে বললুম, 'এবার মাথাটা আঁচড়াও তো।'

'আচ্ছা, সত্যি ক'রে একটা কথা বলবে? আমাকে যখন তুমি সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে বিয়ে করেছিলে, তখন কি এই ব্যক্তিটাই ছিলো বড়ো, না কি তার যোগ্যতা?'

এ-কথার উত্তরে আমি বললুম, 'যোগ্যতাই মানুষের ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ।—হ'তে পারে মানুষের ভালোবাসা অন্ধ—একটা লালা-ঝরা হাবাকেও হয়তো কত মেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ভালোবাসছে—আবার অতি কদর্য হীনস্বভাব একটি মেয়েকেও হয়তো একজন পুরুষ তার সকল হৃদয় সমর্পণ ক'রে ব'সে আছে, কিন্তু তবুও একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের যখন একটা সম্বন্ধ দাঁড়ায়, তখন তার যোগ্যতাটাই প্রথমে মুগ্ধ করে। তারপর তা ছাড়িয়ে ব্যক্তির উপর চ'লে যায়—'

'তাহ'লে কথাটা এই দাঁড়ালো যে প্রথমে গুণ দিয়েই মানুষ মানুষের হৃদয় জয় করে—তারপর সে নিজে—'

'তর্ক যদি করতে চাও, এ নিয়ে অনেক কথাই বলতে হয়, কিন্তু সন্ধেবেলায় ব'সে-ব'সে তা করবো না—অনেক কাজ আছে।' আমি চ'লে আসছিলাম, আমার স্বামী আঁচল টেনে ধরলেন। 'না, তুমি যেয়ো না— সবসময় আমার কাছে থাকো তুমি। তুমি এত ভালো—এত আশ্চর্য যে আমার কেবলি ভয় হয় এই বুঝি হারিয়ে ফেললাম। আমি কি তোমার যোগ্য?'

বুঝলাম, কোনো কারণে একটু বিচলিত হয়েছেন। মাথার চুলে আদর দিতে-দিতে বললাম, 'পাগলামি না-ক'রে স্বরলিপির কতগুলো নতুন চিহ্ন বার করো তো। আর এক্ষুনি যদি না টুকে নাও, তাহ'লে ঐ নতুন সুরটাও হারিয়ে যাবে কিন্তু।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।' আমার আঁচল ছেড়ে হাতের উপর হাত রেখে একটু চাপ দিলেন, তারপর নীল শেড্-দেয়া টেবল-ল্যাম্পের তলায় মাথা নিচু করলেন তিনি। খাতার পাতা নিমেষে অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্নে রহস্যময় হ'য়ে উঠলো। তাঁর মুখে এতক্ষণ যে একটা সুখ-দুঃখের ছায়াপাত চলছিলো, সেটা কেটে গিয়ে উজ্জ্বল আভাময় প্রতিভা ফুটে উঠলো। নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি কাজে গেলুম।

এর কয়েকদিন পরেই কোনো-এক সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে একটি গানের আসর বসলো। বাইরে থেকে একজন বীণা-বাদক এসেছিলেন, তিনিই আসল অতিথি—তাঁরই বাজনা। একটা বাজনা শেষ হ'লো এইমাত্র। সবাই স্তব্ধ। এমন সময় দরজা ঠেলে ঐ ভদ্রলোক ঢুকলেন। অকৃত্রিমভাবে

খুশি হ'য়ে উঠলাম আমি। মনে-মনে আমি তাঁর কথাই ভাবছিলাম। কেবলি মনে হচ্ছিলো এলে বেশ হয়।

ঘরে ঢুকেই একবার চারদিক দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'এ যে গান-বাজনার ব্যাপার। আমাকে যে খবর দেননি?'

তাঁর ছেলেমানুষি-ভরা অভিমানের ভঙ্গিতে আমি ঈষৎ হেসে জবাব দিলাম, 'প্রত্যক্ষভাবে দিইনি, কিন্তু পরোক্ষে দিয়েছি।'

'কী-রকম?'

'মনে-মনে তো আপনাকেই প্রার্থনা করছিলুম এতক্ষণ। বসুন।'

আমার এ-কথায় ভারি খুশি হলেন তিনি। হাসিমুখে আমার স্বামীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'পণ্ডিত, আমি তো অযাচিত অতিথি, কিন্তু ইনি বলছেন, তা নয়—মনে-মনে আমাকেই ইনি প্রার্থনা করছিলেন।'

আমার স্বামী হেসে বললেন, 'খুব আনন্দের কথা। আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দি।'

পরিচয়ের পালা সমাপ্ত হ'তেই ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চা বুঝি শেষ?'

'শেষ হ'লেও আপনাকে এক কাপ দিতে পারবো।'

'সত্যি! তাই জন্যেই তো কখনো কোনো ক্লান্তি এলেই আমার এখানে আসতে ইচ্ছে করে। শুধু কি চা-ই? আপনি যে দিচ্ছেন—তাতে যে আপনার স্নেহও পরিবেশিত হচ্ছে, এ-কথা ভেবেই আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়। আপনাকে কী ব'লে যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো!'

সত্যি-সত্যিই হৃদয়ের মধ্যে একটা স্নেহ অনুভব করলুম ভদ্রলোকের জন্যে। আমরা মেয়েরা যাদের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল আর কোমল আমাদের কাছে ঠিক এই ধরনের মানুষদের ভারি অসহায় বোধ হয়। তাদের আপন ব'লে ভাবতে আমরা দ্বিধা করি না।

হঠাৎ আমার স্বামী বললেন, 'কবি, আপনার এবার বিয়ে করা উচিত।'

'বিয়ে? বিয়ে করবো কেমন ক'রে? এমন তো কোনো মেয়ে দেখলুম না, যাকে দেখেই স্ত্রী ব'লে পেতে ইচ্ছে করে।'

একজন আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে হেসে বললেন, 'দেখলেন তো, আপনার উপস্থিতিতেই উনি মেয়েদের ও-রকম ক'রে কথা বলছেন।'

ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন, 'উনি? ওঁর সঙ্গে তো কারো তুলনা হ'তে পারে না—ওঁর মতো মেয়ে কি আর একাধিক জন্মায়? পণ্ডিত সত্যিই পণ্ডিত! উনি শুধু সঙ্গীতের আসল রসই আবিষ্কার করেননি, জীবনের সুখ-শান্তির আসল মূলটিও উনি খুঁজে বার করেছেন। ওঁর মতো স্ত্রী কি আর সকলের ভাগ্যে জোটে!'

এ-কথায় আমি লজ্জিত হলুম। একটু উসখুস ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'যাই, আপনার চা নিয়ে আসি।'

রাত বারোটা পর্যন্ত চললো গান-বাজনা—অনেক তর্ক, অনেক কচকচি—কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না—বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক বললেন, 'এত ভালো লাগে আপনাদের এখানে এলে, মনে হয় রোজ আসি।'

স্বামী তখনো গুনগুন করছিলেন, আমি বললুম, 'বেশ তো, সে তো আমাদের সৌভাগ্য। আর ভালো লাগাটা তো পারস্পরিকই।'

'পারস্পরিক? আশ্চর্য! আমার তো ধারণা কেউ আমাকে পছন্দ করে না। সংসারে আমি একটা উৎপাত। এই দেখুন বাড়িতে কেউ আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না—রাগ ক'রে তিন দিন খাইনি—খাইনি তো খাইনি! কার ব'য়ে গেছে আমাকে সেধে-সেধে খাওয়াতে। আসলে কী জানেন, মানুষটা আমি নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া—কী বলা উচিত, কী করলে কী হয়, কিছু ভেবে-টেবে চলি না—তাই কারো প্রিয়ও হ'তে পারি না।'

গুনগুনানি থামিয়ে আমার স্বামী বললেন, 'একটা গানের কাগজ বার করবো ভাবছি—আপনার উপাখ্যানটি কদ্দূর?'

'হ'য়ে এলো—লেখাটা যে আমার কী ভালো হচ্ছে ভাবতে পারবেন না। কাব্যলক্ষ্মী আমাকে ধরা দিয়েছেন—তাঁকে যেন চোখে দেখতে পাই আমি।'

আমি বললুম, 'আপনারা যে-ধরনের সংগীত রচনা করছেন তা দেশের লোক গ্রহণ করবে কিনা তার একটা মহড়া হ'য়ে গেলে মন্দ হ'তো না। এতে তো একেবারে সংগীত আর সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়ানো হচ্ছে—সুর-সৃষ্টিরও যতখানি মূল্য, সুরপ্রকাশের এই ভাষাসৃষ্টিটাও তো ততখানি মূল্যবান?'

'নিশ্চয়ই। আমি যা লিখেছি তা বাংলাভাষায় একটা আশ্চর্য প্রেমের কাহিনী হিসেবেও স্মরণীয় হবে।'

আমার স্বামী বললেন, 'উৎসুক রইলাম—প্রথম মহাড়াটা এখানেই হবে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'সে তো নিশ্চয়ই—পর্শুই খানিকটা নিয়ে আসবো।'

'পর্শু?' আমার স্বামী চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করলেন কী আছে—তারপর ব্যাকুল চোখে তাকালেন আমার দিকে।

আমি তাঁর ভঙ্গি দেখে হেসে বললুম, 'কিছু যদি মনে থাকে। পর্শু না তোমার একটা সভা আছে? সংগীত সম্বন্ধে উনি বলছেন সেদিন—'

'আপনি? আপনিও যাবেন?

'না, আমার সেখানে নিমন্ত্রণ নেই।'

'তাহ'লে আর কী, পণ্ডিত নিশ্চয়ই দেরি করবেন না।' আমাদের কিছু বলবার অবকাশ না-দিয়ে তিনি দুমদাম ক'রে নেমে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুম এলো না আমার। ওঁর গায়ে হাত রেখে বললুম, 'ঘুমিয়েছো?'

'না।'

'চুপ ক'রে আছো যে?'

'একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী-কথা?'

'থাক, বলবো না।'

'বলো না', আমি আবদারের সুরে কথাটা ব'লেই ওঁর আরো কাছে এগিয়ে এলুম। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন তিনি—ভেজা-ভেজা গলায় বললেন, 'ধরো যদি এমন হ'তো যে তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হ'লো তখন তোমার বিয়ে হ'য়ে গেছে—কী হ'তো?'

'ঈশ, কী একটা ভাবনার কথা!'

আমার ঠাট্টায় উনি মন না-দিয়ে বললেন, 'সত্যি—তুমি বুঝছো না—এটা একটা ভাবনারই কথা।'

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম,'তোমার যেন কী হয়েছে, কী যেন ভাবছো দু'দিন থেকে।'

নিশ্বাস নিলেন তিনি, তারপর একটু শব্দ ক'রে হেসে উঠে বললেন, 'মাথায় আমার একটু সত্যিই দোষ আছে। তুমি ঠিকই বলো।'

'যাক, এতদিনে বুঝেছো তবে?'

'একটু-একটু।'

'তাহ'লে এবার নিরুদ্বেগে ঘুমাও।'

'ঘুম কেন আসছে না?'

আমি কপালে মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললুম,'এবার নিশ্চয়ই আসবে।'

আমার হাত নিজের মুখের উপর চেপে ধরলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলুম উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করলুম—রাত চারটা বেজে গেলো, ঘুম এলো না।

একদিন বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে আবার এলেন সেই ভদ্রলোক। ঘরে ঢুকেই একটা আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করলেন তিনি। দড়াম ক'রে ছাতাটা ফেলে দিয়ে আরাম ক'রে বসলেন কৌচের উপর। বললেন, 'উঃ, কী ঘোরাটাই ঘুরেছি, এক গ্লাশ জল দিন শিগগির।'

তাকিয়ে দেখলুম চেহারার আর হাল রাখেননি। এক মাথা রুক্ষ চুল, অতি মলিন জামা-কাপড়—মুখটা যেন পুড়ে গেছে। জল দিয়ে বললুম, 'এত কী ঘোরেন আপনি বলুন তো? সময় নেই, অসময় নেই? চেহারা আপনার ভয়ানক খারাপ হয়েছে?'

'এই দেখুন, এ-কথা আপনি বললেন—কে বলতো আর? তবে আর কারো মুখে শুনলে অবিশ্যি আমার এত ভালোও লাগত না।'

চোখ নামিয়ে বললুম, 'বসুন। চা ক'রে আনি।'

'পণ্ডিত কখন আসবেন?'

'খুব বেশি দেরি হবে না হয়তো—'

'তা হ'লে তো চা-টা একসঙ্গে খাওয়াই ভালো।'

মৃদু হেসে যেতে-যেতে বললুম, 'তা আর ক। হয়েছে। ওঁর সঙ্গে আবার খাবেন।'

ফিরে আসতেই বললেন, 'দেখুন, পৃথিবীতে আমি এখন যত মানুষের কথা ভাবি, আপনার কথাই ভাবি সব চাইতে বেশি। যখনই কোনো অপ্রিয় কাজ করতে হয়, তখনই মনে হয় আপনি হ'লে ঐ ছোটো সংসার থেকে আমাকে মুক্তি দিতেন, বৃহৎ সংসারের জন্য সময় পেতাম কিছু।'

এ-কথায় আমি অস্বস্তি বোধ ক'রে বললুম, 'কবি, আপনি আমাকে অকারণে বাড়িয়ে তুলছেন। আমার পরিমাণ আমি তো জানি।'

'জানেন না। কিছুই জানেন না আপনি। কতখানি বললে আপনাকে ঠিক বলা যায় তার কোনো পরিমাণ আপনি জানতেই পারেন না—'

চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে বাধা দিলুম—'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এখন চা খান।'

হাসিমুখে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'পণ্ডিত ভালোবাসেন ব'লে বোধহয় চা তৈরির সমস্ত তথ্যই আপনি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন?'

'কেন?'

'এত ভালো চা কি আর কেউ করতে পারে?'

এ-কথায় আমি মুখ তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিলুম—চোখে চোখ পড়লো—কথা ভুলে গেলুম, সহসা আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন ক'রে উঠলো। সহজ হ'তে একটু সময় লাগলো আমার। উনিও নিঃশব্দে চা পান শেষ করলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার আমি যাই।'

'আপনার উপাখ্যান—'

'আরে, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলুম সে-কথা।'

পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটু থমকে গিয়ে বললেন, 'আজ থাক বরং, আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না।'

'ভালো না লাগার আর অপরাধ কী? সারাদিন অনিয়ম করলে কোনো মানুষেরই ভালো লাগে না।'

'নিয়ম? নিয়ম কী?' উনি আবার ব'সে প'ড়ে বললেন, 'নিয়ম আমি মানি না। নিয়ম করলেই আমার শরীর খারাপ হয়। তাই জন্যেই তো আমি এখানে নিয়মিত আসি না—আমি ঠিক জানি নিয়মমতো এলে একটা বিভ্রাট আমার ঘটবেই?'

আমি বললুম, 'বিভ্রাটটা নিতান্তই দৈব, বিভ্রাট যদি মানুষের জীবনে ঘটেই তার বিরুদ্ধে আর লড়াই চলে না।'

'চলে না? আপনি ঠিক বলছেন, চলে না?' হঠাৎ তিনি আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো—

আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'এই যে আমি আপনাকে ভালোবাসি, এত ভালোবাসি তার বিরুদ্ধেও কি—'

কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমার গলা থেকে একটি শব্দ নিঃসৃত হ'লো—'কবি!'

'না, না, আমাকে থামিয়ে দেবেন না, আমাকে বলতে দিন—আমাকে দয়া করুন—আমি আপনার অসম্মান করবো না—শুধু আমাকে এ-কথাটি বলতে দিন—কেবল বলতে দিন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি—' নিচু হ'য়ে তিনি আমার পদস্পর্শ করলেন।

আমি তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়ে আহত কণ্ঠে বললুম, 'এতো বড়ো গুণীর যোগ্যই কি এই ব্যবহার?'

গলার স্বর তাঁর যন্ত্রের মতো কেঁপে উঠলো।

'রাধা, এই একটা মুহূর্ত আমাকে দাও—তোমার সুখে ভরা জীবন থেকে মাত্র একটা মুহূর্ত, মাত্র একটা মুহূর্ত তুমি আমাকে দাও—' আমি দু'হাত বাড়িয়ে বাধা দেবার একটা ভঙ্গি করলুম, তিনি থামলেন না—'এই একটা মুহূর্ত আমাকে দিলে তোমার কিছুই ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি কতখানি লাঘব হবো তা তুমি জানো না, তুমি বুঝবে না এ যে কত বড়ো কষ্ট—কতখানি দুঃখ।'

ভদ্রলোক হাঁপাতে লাগলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখ বেয়ে জলধারা নামলো।

আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পাথরের মতো ভারি হ'য়ে উঠলো আমার পা দুটি। মৃদু গলায় বললুম, 'আপনি যান।'

নত মুখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'জানি, এই দুর্বল মুহূর্তটির জন্য মনের সংযত অবস্থায় আর আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারবো না—জানি, তোমার কাছে আমার আর মুখ দেখানো কত অসম্ভব হবে—কিন্তু একটা প্রার্থনা তুমি আজ পূরণ করো—আমাকে নিয়ে তুমি উপহাস কোরো না—আমার সমুদ্রের মতো গভীর প্রেমকে তুমি আর পাঁচটা সাধারণ জিনিশের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে উপেক্ষা কোরো না—'।

'আপনি বাড়ি যান—' আমার কণ্ঠস্বর এবার তীক্ষ্ণ হ'লো।

ভদ্রলোক যেন চাবুক খেয়ে মুখ তুললেন—একটু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইলেন আমার দিকে, তারপর আস্তে-আস্তে মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের মতো বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। সহসা চোখ ঝাপসা হ'য়ে এলো।

শোবার ঘরে এসে দেখলুম, ইজি-চেয়ারে চোখের উপর হাত রেখে আমার স্বামী শুয়ে আছেন। তাঁর ভঙ্গিটি অত্যন্ত ক্লান্ত। বড়ো-বড়ো কালো চুল বিস্রস্ত—পায়ের জুতো ছাড়েননি—গায়ের উড়নিটি পর্যন্ত তেমনি গায়ের উপর জড়ানো। কাছে এসে বললুম, 'কখন এলে?'

শব্দ নেই।

মুখের থেকে চাপা হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললুম, 'আমি তো ঢুকতে দেখলাম না।'

সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখবার চোখ ছিলো না।'

নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'ওঠো, জামা-জুতো ছেড়ে নাও।' তিনি উঠলেন না। আমি বললুম, 'শোনো—'

'ঐ যে তোমার মালা—' অত্যন্ত শ্রান্ত স্বরে তিনি কথাটা উচ্চারণ করলেন।

তাকিয়ে দেখলুম, বিছানার উপর বেলফুলের কুঁড়ির একটি মস্ত মালা প'ড়ে আছে—হাত বাড়িয়াছিলুম, হঠাৎ লাফ দিয়ে আমার স্বামী উঠে দাঁড়ালেন, এক ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিয়ে মালাটি টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় করতে লাগলো। ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগেনি—কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কান্না-ভাঙা গলায় বললুম, 'তুমি কি—'

'যাও! যাও তুমি।' কী-রকম বুক-ফাটা গলায় যে তিনি 'যাও' শব্দটা উচ্চারণ করলেন তা আমি ভাষা দিয়ে আমি কেমন ক'রে বোঝাবো? দু' হাত বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠে বললুম, 'তুমি কি আমার কথা শুনবে না?'

'না, না, চাই না, চাই না—' আমার হাতের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে সবলে মুক্ত ক'রে তিনি আবার ইজি চেয়ারের উপর নিজেকে ছেড়ে দিলেন। আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সময় যেন ভারি হ'য়ে চেপে বসলো আমাদের উপর। থমথমে হ'য়ে উঠলো আমাদের আনন্দিত কক্ষ, সঙ্গীতের পরিবর্তে চারপাশে যেন শোকের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

আমি নিজেকে সামলে নিলুম। আস্তে গিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে বললুম, 'তুমি কি পাগল হ'লে?'

উনি জবাব দিলেন না। আমি হাতের উপর হাত রেখে বললুম, 'ওঠো, লক্ষ্মীটি—'

এক ঝটকায় আমার হাত ঠেলে দিলেন। অভিমানে আমার গলা বন্ধ হ'য়ে এলো, রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি—তুমি হ'লে কী করতে?'

'আমি?' আমি কী করতাম?' রেগে উনি উঠে বসলেন—অনেকক্ষণ বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে দেখলেন আমাকে, হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'জানি না কী করতাম।'

আমি বললুম, 'এ কি আমার দোষ?'

'জানি না, জানি না,' উত্তেজিত ভাবে মাথার চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে তিনি বললেন, 'জানতাম, আমি আগেই জানতাম যে এটা হবেই। তুমিও জানতে, কিন্তু তুমি—' কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি—গলা বুজে গেলো।

আমি শান্ত গলায় বললুম, 'যে-হতভাগ্য ভালোবেসে ব্যর্থ হয় তাকে আঘাত দেবার মতো নিষ্ঠুরতা আমার নেই।'

'ও, তাহ'লে সার্থক করবার ইচ্ছেও আছে তোমার?'

একটু চুপ ক'রে থেকে ব্যথিত গলায় বললুম, 'একি আমার অপরাধ?'

'জানি না।'

'তুমি বুঝতে পারছো না—'।

'চুপ করো, চুপ করো—'।

'কিন্তু'—।

'চুপ! চুপ!' অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন তিনি।

আমি নিঃশব্দ হলুম। মনে-মনে বুঝলুম, কথা বলা ব্যর্থ। হঠাৎ উনি উঠে আমার হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিলেন, আর্তস্বরে বললেন, 'বলো, বলো, লোকটাকে তুমি ঘৃণা করো কিনা—'

'তিনি তো ঘৃণার পাত্র নন।'

'নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা জেদ চেপে গেলো, বললাম, 'কাউকে ভালোবাসাটা কি ঘৃণ্য ? সেটা কি ছোট কাজ ?'

'সেটার প্রকাশটা ছোটো হ'তে পারে।'

'প্রকাশটা তো ভঙ্গির উপরই নির্ভর করে। তিনি আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেননি।'

'এও অসৎ নয় ? হা ঈশ্বর!' কপালে কর হেনে তিনি ধপ ক'রে বিছানায় ব'সে পড়লেন। তাঁর উজ্জ্বল শ্যাম কপাল ঘেমে উঠলো—তাঁর দেবদুর্লভ আঙুল থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো—তাঁর প্রতিভাদীপ্ত সমস্ত মুখ নীল হ'য়ে গেলো।

আমি জানি তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন—সেই মুহূর্তে যদি আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি তাঁকে ঘৃণা করি—তাহ'লে আমার স্বামী প্রাণ ফিরে পান—তাঁর দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির ধারা নামে, কিন্তু আমি তো মিথ্যে বলতে পারিনে। আমাকে যিনি ভালোবাসেন তাঁকে আমি ঘৃণা করবো—এত বড় দম্ভ তো আমার নেই। কিন্তু আমার স্বামীর বেদনাবিদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করলো মিথ্যে ক'রেই বলি—অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলুম। যাকে ভালোবাসি তাকে ভোলাতে পারিনে,—মিথ্যা ব'লে তাঁর কাছে ছোট হ'তে পারিনে। তিনি যে আমার কতখানি, তাঁর আসন যে আমার হৃদয়ের কোন গভীর প্রদেশে পেতে রেখেছি তা কি তিনি এত দিনেও বুঝলেন না ? দুঃখ হ'লো। এই কি আমাদের সাত বছরের সম্পর্ক ? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম মাথার কাছে, কেবল বড়ো-বড়ো ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো দু'চোখ বেয়ে।

ধীরে-ধীরে সময় গড়িয়ে চললো। কত যে মর্মন্তুদ সে-সময়ের দীর্ঘতা তা কাকে বলবো ? রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে দু'জনেই নির্ঘুম চোখে ছটফট করতে লাগলুম। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বামীর করস্পর্শে জেগে উঠলুম। চোখ বুজেই অনুভব করলুম, আমার স্বামী ঝুঁকে পড়েছেন আমার মুখের উপর, শুনতে পেলুম অত্যন্ত মৃদু গানের মতো গুনগুন করছেন, 'আমার রাধা, আমার সোনা, তুমি আমার—'। আমি দু'হাত বাড়িয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে

উঠলুম। তিনি আমার জেগে ওঠা টের পেয়ে চমকে উঠেছিলেন—সামলে নিয়ে বললেন, 'কাঁদো কেন? তুমি ঠিক বলেছো। তোমার মতো মেয়ের যোগ্য কথাই বলেছো তুমি। আমিও বুঝেছিলুম কবি তোমাকে ভালোবাসেন —কিন্তু বুঝতে পারিনি তোমার অবচেতন মন কবির সেই ভালোবাসাকে সাগ্রহেই গ্রহণ করেছে—'

উঠে ব'সে বললুম, 'পণ্ডিত, ভালোবাসার কি কেবল একটাই ক্ষেত্র? কবিকে যে আমি ভালোবাসি আর তোমাকে যে আমি ভালোবাসি, দুটোর কি একই রূপ?'

'না, এক হবে কেন? কিন্তু কালক্রমে আমরা দু'জনে তোমার মনের এক জায়গায় এসেই পাশাপাশি দাঁড়াবো।'

'ছি!'

'ছি কেন, রাধা, তা কি হ'তে পারে না? তোমার হৃদয়ের গভীরতা সাধারণের অতীত, সেখানে অনায়াসেই তুমি দু'জনকে জায়গা দিতে পারো। আজ ভাবছো অসম্ভব, কিন্তু তুমি নিজেও জানো না কবে কখন একদিন দু'জনকেই তুমি একই ভাবে ভালোবাসতে শুরু করবে।'

'না, না,'—আমি ব্যাকুল হ'য়ে উঠে তাঁর মুখে হাত চাপা দিলুম, 'এই কি এতদিনের পরিচয় তোমার কাছে? আমার এত ভালোবাসার মূল্য কি তুমি এ-ভাবেই শোধ দিলে?

'শোধ দেবো? তোমার ভালোবাসার? রাধা—' আমার স্বামীর গলা বুজে এলো, ভাঙা গলায় বললেন, 'তোমার শোধ কি কোনোদিন কোন পুরুষ দিতে পারে? তুমি আমায় ভ'রে রেখেছো—তোমার স্নেহ, দয়া, প্রেম, সাহচর্য—সর্বোপরি তোমার সহযোগিতা—সে কি শোধ দেবার জিনিশ? কিন্তু ভেবে দেখলাম, এত ভালোবাসা এক আধারে আবদ্ধ থাকতে পারে না।'

'চুপ করো, চুপ করো—' কান্নায় আমার গলা ভেঙে এলো—'শান্ত হও। তুমি কি পাগল হ'লে? আমার পাগলা শিব—' আমি স্নেহভরে তাঁকে কাছে টেনে নিলুম। আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে তিনি যেন খানিকটা শান্তি লাভ করলেন।

এর পরে দু'তিন দিন কেমন একটা অশান্তিতে সময় কাটতে লাগলো। দু'জনেই দু'জনের কাছে যেন অপরাধী হ'য়ে আছি। তারপর আস্তে-আস্তে

সে-ভাব কাটিয়ে উঠলাম আমরা, আবার আমার স্বামী সহজ হলেন, আবার আমাদের সেই অপরিসর গানের ঘর আনন্দগুঞ্জনে ভ'রে উঠলো। সবাই আসেন, আসেন না কেবল কবি। আমার মনের মধ্যে কেমন একটা অভাববোধ হ'লো। আমার স্বামী সেই অভাববোধের কেমন ব্যাখ্যা করবেন, তা আমি জানতুম, তবু তাঁর কাছে লুকোতে পারলুম না সে-কথা।

আমার ইচ্ছে শুনে স্বামী সহজভাবেই বললেন, 'আচ্ছা, ওঁকে আসতে বলবো একদিন। শুনছি ওঁর উপাখ্যানটা নাকি খুব ভালো হয়েছে।'

পরের দিনই তিনি তাঁকে ধ'রে নিয়ে এলেন। একেবারে উপাখ্যান সমেত। আমাকে বললেন, 'এসো এসো, বেশিক্ষণ ভদ্রলোককে আর বিরহ-পাথারে ফেলে রেখো না।'

আমি হেসে বললুম, 'ভারি যে ফাজিল হয়েছো।'

'হবো না? যা একখানা উপন্যাস করেছো তুমি!'

আমি হাতে চিমটি কাটলুম—উনি মুখ বাড়িয়ে নিতান্ত যুবকের মতো একটি কর্ম ক'রে পালিয়ে গেলেন।

আমি যখন ও-ঘরে গেলুম আমার স্বামী সেই উপাখ্যানের সংকেত দেখে-দেখে সুর বাজাচ্ছেন আর কবি সঙ্গে-সঙ্গে মৃদুগুঞ্জনে গেয়ে যাচ্ছেন সেই সুর। অলক্ষ্য হাওয়ার মতো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে সেই সুরের স্পর্শ। আমি নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—এক সময় চোখ তুলে আমার স্বামী আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কবি নতদৃষ্টিতে ছিলেন—আমার অস্তিত্ব অনুভব ক'রে তিনি আরো নত হলেন।

একটি বিশেষ রাগিণীকে ঘিরেই দেখলুম এই কাব্যের সৃষ্টি। প্রথম সর্গে আছে রাগিণীর বন্দনা, তারপর অনুরাগ, তারপর হতাশ, তারপরে অনন্তকাল প্রতীক্ষার সংকল্প।

গানের মৃদু গুঞ্জন ক্রমেই দরাজ হ'তে লাগলো। আমার স্বামী অচেতনের মতো বাজিয়ে চললেন, সুরের ঢেউয়ে তাঁর আঙুলের লীলা অপরূপ হ'লো—কবি দুই চোখ বুজে বিশ্বসংসার হারিয়ে ফেললন, আকাশে-বাতাসে তাঁর সুরের দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে গেলো। কেবল আমি সচেতন হ'য়ে-ব'সে তাঁর অনুরাগে হতাশায় আর ব্যর্থতায় কেবল আমারই ছবি দেখতে লাগলাম। আস্তে-আস্তে গানের রেশ একেবারে উঁচু পর্দায় উঠলো—সঙ্গে-সঙ্গে আমার

মনে হ'লো যন্ত্র আর কণ্ঠ যেন একসঙ্গেই কেঁদে উঠলো—আর তাদের সেই মর্মভেদী কান্নায় সমস্ত পৃথিবী যেন একটা হাহাকারে ভ'রে উঠলো। হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'থামাও, থামাও।' মুহূর্তে দুটি মানুষ নিস্তব্ধ হ'য়ে থেমে গেলো।

জানি না গানের আত্মা আছে কিনা—কিন্তু সমস্ত শরীর আমার কেমন ছমছম করতে লাগলো সেই স্তব্ধ ঘরে—মনে হ'লো অসম্পূর্ণ সুরের অতৃপ্ত আত্মারা যেন অশরীরী হ'য়ে ঘরময় ঘুরে-ঘুরে আমাকে শাপ দিচ্ছে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে আমার প্রতি রোমকূপে বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব করলুম—আতঙ্কে দিশাহারা হ'য়ে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হলুম আমি, আমার পতনোন্মুখ দেহটিকে ধ'রে ফেললেন কবি, কম্পিত গলায় বললেন, 'পণ্ডিত, এ কী হ'লো?'

আমার স্বামী তখনো অভিভূত ছিলেন, চমকে উঠে আমাকে এসে জড়িয়ে ধ'রে কবির কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তাই তো, কী হ'লো?

আমি ফিশফিশিয়ে ব'লে উঠলুম, 'আমার ভয় করছে, আমাকে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এখান থেকে।'

ওঁরা আমাকে ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন—মাথায় জল ঢাললেন—এক সময় হঠাৎ আমার চেতনা ফিরে এলো। সচেতন হ'য়ে আমি উঠে বসলুম—লজ্জিত হ'য়ে বললুম, 'হঠাৎ যে কী হ'লো।'

আমার স্বামী আমার কাছেই ব'সেছিলেন, নিঃশব্দে আমাকে স্পর্শ করলেন, আর সেই স্পর্শে সহসা আমার শরীরে যেন একটি সুগভীর শান্তি ব্যাপ্ত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো। মৃদুকণ্ঠে কবি বললেন, 'আমি এবার যাই।'

'কাল সকালেই একবার আসবেন,' একান্ত অনুরোধের ভঙ্গিতে আমার স্বামী কবির হাত চেপে ধরলেন। সম্মতি জানিয়ে মুখ ফিরিয়ে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

শরীর দুর্বল ছিলো, তাড়াতাড়িই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম সে-রাত্রে। কাজেই পরের দিন অতি প্রত্যুষেই আমার ঘুম ভাঙলো, তখনো আলো ফোটেনি ভালো ক'রে। আবছা-আবছা অন্ধকারে আমি আমার স্বামীর দিকে বাহু বাড়ালুম—অনুভব করলুম সে-স্থানটি শূন্য। বুকটা ধড়াশ ক'রে উঠলো। উঠে ব'সে ভালো ক'রে চারদিক তাকিয়ে দেখলুম। তারপর আস্তে-আস্তে

নামলুম বিছানা থেকে। প্রথমেই উঁকি দিলুম গানের ঘরে, সেখানে নেই। বাথরুমের দরজাটি হাঁ ক'রে খোলা। তবে? তবে তিনি কোথায় গেলেন? গলা বুক যেন বন্ধ হ'য়ে এলো আমার। তুমি কই? তুমি কই? সমস্ত ঘরময় ঘুরে-ঘুরে তাঁকে ডাকতে লাগলুম—কোথাও তিনি নেই। চারদিক ভোরের আলোয় ভ'রে উঠলো। সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। আস্তে-আস্তে সে-আভা শাদা হলো, তীব্র হ'লো—আর আমি সেই আলোয় আমার বালিশের পাশে একটি ভাঁজ-করা কাগজ লক্ষ্য ক'রে হাতে তুলে নিলুম।

এ হাতের লেখা আমার ভুল করবার কথা নয়। আমাদের বিবাহিত জীবনে কখনো আমরা বিচ্ছিন্ন হইনি, তাই আমাকে আমার স্বামীর এই প্রথম পত্র—এবং এই শেষ।

'রাধা,

তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম। আমার ভালোবাসার এর চেয়ে চরম প্রমাণ আর কী থাকতে পারে? প্রার্থনা করি, তুমি বড়ো হও।

হতভাগ্য পণ্ডিত।'

চিঠিখানা পড়া শেষ হ'য়ে গেলো, আস্তে-আস্তে অক্ষরগুলো মুছে এলো আমার চোখ থেকে। আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু কি ভেবেছিলাম, না কি মনটা শূন্যে পরিভ্রমণ করছিলো? জানি না। আমাদের ছোটো বাড়ির তিনটি মাত্র ঘরে আমি সহস্রবার প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলাম। আমার চেতনা ছিলো না, কী চাই, কী খুঁজে বেড়াই, তাও আমি ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পরিশ্রমে আমার কপালে ঘাম দেখা দিলো—বুকের ওঠা-পড়া দ্রুত হ'য়ে উঠলো, কাঁধ থেকে আঁচল স্খলিত হ'লো—তবু আমি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে উন্মাদের মতো ছুটে বেড়াতে লাগলাম। এক সময়ে বসবার ঘরে এসে আমার পা থামলো। হঠাৎ যেন লুপ্ত চৈতন্য ফিরে এলো আমার। তাকিয়ে দেখলাম, নতমুখে কবি দাঁড়িয়ে আছেন চুপ ক'রে; আমাকে দেখে সভয়ে দু'পা স'রে গেলেন, আর আমি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালাম। এবার আস্তে-আস্তে আমার বুক ঠেলে যেন একটা কান্নার ঢেউ গলা পর্যন্ত উঠে এলো—কিন্তু বন্যা নামলো না চোখে। একটা অসহ দুঃখের গুরু ভারে

আচ্ছন্ন হ'য়ে আমি মুখ তুললুম—কম্পিত হাতে চিঠিটি এগিয়ে দিলুম কবির হাতে। নিমেষে চিঠি পড়া শেষ করলেন তিনি। ব্যাথায় বিস্ময়ে মুহূর্তে তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেলো। অনেকক্ষণ আমার দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর একটা ভারি নিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'এত বড়ো দুঃখ দিলাম!' তাঁর মাথা নিচু হ'লো। উদ্গত অশ্রুকে কোনোরকমে বাধা মানিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় আবার বললেন, 'এ-দুঃখ আমারই রচনা। কিন্তু তোমাকে তো আমি কোনো দুঃখই দিতে পারি না। আমি যাবো, আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো তাকে—শুধু তুমি, তুমি এখানে অপেক্ষা কোরো।'

আমি নিস্পন্দ হ'য়ে রইলাম। এক সময়ে অনুভব করলাম, কবি চ'লে গেছেন। তারপর থেকে এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি প্রতীক্ষা ক'রে আছি। একদিন এক পলকের জন্যও এ-বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি। সমাজ সংসার থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ নির্বাসিত করেছিলাম। আমার কেউ ছিলো না, সমস্ত সঙ্গীরা আমাকে আস্তে আস্তে ভুলে গিয়েছিলো। তারপর আমার ক্ষুধিত তৃষিত আত্মা একদিন পরিত্যাগ করলো আমার এই অবহেলিত জীর্ণ দেহ। অতি মলিন একটি শয্যার উপর ঠিক ঐখানটিতে আমার আত্মাহীন অসার দেহটি অনেকদিন প'ড়ে রইলো—কেউ দেখলো না, কেউ জানলো না—মৃত্যুর যন্ত্রণায় যখন উদ্বেল হ'য়ে ছটফট করলুম—কেউ এক ফোঁটা জল দিলো না মুখে। কিন্তু তবু আমি আছি, আমার এই বঞ্চিত, ব্যথিত আত্মা নিয়ে তবু আমি প'ড়ে আছি এই গৃহে। ওগো পৃথিবীর সুখী মানুষ, আমার এই প্রতীক্ষা—আমার মিলনের আকাঙ্খা কেড়ে নিয়ো না, কেড়ে নিয়ো না এই নির্জন অবকাশটুকু। আমাকে থাকতে দাও, থাকতে দাও,—দয়া করো, দয়া করো আমাকে—'

বলতে বলতে মেয়েটি সবেগে উঠে এলো কাছে, এক মাথা চুল নিয়ে নিচু হ'য়ে ব্যাকুল হাতে জড়িয়ে ধরলো আমার পা—তার সেই হিম-শীতল স্পর্শে আমি চমকে উঠে বসলুম। তাকিয়ে দেখলুম, পায়ের কাছে টিপয়ের উপর জলের গ্লাশটি উলটে প'ড়ে আমার পা জলে ভিজে গেছে। এ কি তার চোখের জল? জানালায় তাকিয়ে দেখলুম, আকাশ রঙিন হ'য়ে আসছে সূর্যোদয়ের আভাসে। তবে? তবে এতক্ষণ ধ'রে আমি এ কী শুনলুম? এ কী দেখলুম? আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম তবে? আমি মাটিতে

পা ছোঁয়ালাম, আবছা-আবছা ভোরের আলোয় কোথাও তাকে দেখতে পেলুম না। কোথায় গেলো? কোথায় সে? হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের কষ্ট অনুভব করলুম। মনে হ'লো আমার কতকালের প্রিয়তম সঙ্গীটি কোথায় হারিয়ে গেলো। আমি অস্থির হ'য়ে ঘরে-ঘরে তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

ভোর হ'য়ে গেলো, লিচু গাছের মাথায় সূর্য চিকচিক করতে লাগলো। পৃথিবী ভ'রে গেলো শাদা আলোয়। চুপ ক'রে সেই ঘরে সেইখানটিতে বসলাম, খানিক আগেও যে সে এখানেই ছিলো বারে-বারে সে-কথা মনে ক'রে অস্থির হ'য়ে উঠলাম, তারপর এক সময় আমার সেই অতি আকাঙ্ক্ষিত সংসারকে পিছনে ফেলে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। প্রথমেই পোস্টাপিশে এসে মা-কে আসতে বারণ ক'রে তার করলুম, তারপর খুঁজে-খুঁজে একটি মেস্‌-এ আস্তানা ঠিক করলুম। মনের মধ্যে কেবল একটি প্রার্থনাই ভ'রে রইলো— হোক তার এই নির্জন প্রতীক্ষা সফল হোক—তার ব্যথিত বিরহী আত্মা যেন একদিন শান্তি পায়, আর সেই শান্তিতে আমি যেন কখনো ব্যাঘাত না হই।

বিচিত্র হৃদয়

আমার বাবা ছিলো না। এই অভাববোধটা খুব ছোটো থেকেই আমাকে বারংবার আঘাত করেছে। মাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তাঁর বিষণ্ণ মুখ আরো বিষণ্ণ ক'রে ধরা গলায় জবাব দিয়েছেন, 'তিনি স্বর্গে।' স্বর্গ কোথায়, স্বর্গ কী, কতদূরে—অনেকদিন ভেবেছি, কিন্তু সে-প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। আমার মা-র মুখশ্রী অতি সুন্দর, সমস্ত মুখখানাতে তাঁর এমন একটা মধুর বিষণ্ণতার আভা ছড়িয়ে থাকতো যে কোনো-কোনো সময় অপলকে সে মুখের দিকে তাকিয়েও আমার দেখার তৃষ্ণা মিটতো না। তিনি কালোপাড় শাড়ি পরতেন, হাতে সরু-সরু দু'গাছা বালা ছিলো—গলায় প্রায়-অদৃশ্য একছড়া সোনার হার চিকচিক করতো। কী যে সুন্দর দেখাতো তাঁকে—মসৃণ শ্যামল রংয়ে একটা বর্ষার সজল আভা ছিলো—আমি ফর্শা ছিলুম, কিন্তু তবু সকলে বলতো মা-র শ্রী আমি পাইনি। অত্যন্ত শান্ত আর দৃঢ় ছিলো তাঁর স্বভাব। আমি তাঁর অতি অল্প বয়সের একমাত্র সন্তান।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই তাঁর জীবনের সমস্ত আলো নিবে গিয়েছিলো। দাদামশাই ছিলেন সনাতনপন্থী—কাজেই বারো বছর বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়ে খুব একটা তৃপ্তিলাভ করলেন। বিয়ের পরে প্রথম বছর মা-র প্রায় পিত্রালয়েই কেটেছিলো। দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভে আমার সম্ভাবনার সূত্রপাতেই আমার বাবার মৃত্যু হ'লো। শোকে আমার মা কতটা মুহ্যমান হয়েছিলেন আমি জানি না, কিন্তু আমার দাদামশাই এ-আঘাত সামলাতে পারলেন না, এক বছরের মধ্যে তিনিও গত হলেন। মা-র আর দিদিমার পরিচর্যায় আমি বড়ো হলুম। আমাদের সঙ্গে কোনো পুরুষের সংশ্রব ছিলো না; দু'একজন আত্মীয়ই যা আসা-যাওয়া করতেন—আর অসুখ করলে ডাক্তার। স্ত্রী-পুরুষ সকলের কাজ একা আমার মা-কেই করতে দেখেছি। বিপদে-আপদে সুখে দুঃখে সব সময়েই তিনি অবিচলিত। দিদিমা যত না বুড়ো হয়েছিলেন তত হয়েছিলেন রুগ্ন—আর্থিক সচ্ছলতার অভাবও ছিলো প্রচুর, কাজেই কাজকর্ম সবই প্রায় মা-কে করতে হ'তো। সকালে উঠেই তিনি

একেবারে কলের মতো নিঃশব্দে কাজে লেগে যেতেন—তারপর নির্দিষ্ট সময়ে কলেজ এবং ফিরে এসেই আবার কাজের আবর্ত। বাচ্চা একটি থাকলেই যথেষ্ট—তার উপর আমার মা ছিলেন আমার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী—তাঁর চোদ্দ বছরের মাতৃত্ব আমি দেখিনি, কিন্তু যে-বয়সের কথা আমার মনে আছে —তখনো আমার মা খুব বুড়ো হ'য়ে যাননি—এখন সে-বয়সের মেয়েদের বিয়ের কথাও কেউ চিন্তা করেন না। আমার যখন ছ' বছর বয়েস মা তখন আই. এ. পাশ করলেন। ঠিক এই সময় হঠাৎ এক সকালে ঘুম ভেঙে আমি একজন ভদ্রলোককে আমাদের ঘরে দেখতে পেলুম—যাঁর চেহারা আমার মনের মধ্যে সেই মুহূর্তেই একটি গভীর দাগ কেটে দিলো।

সুন্দর লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ গড়ন, মুখের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ যা মানুষকে টানে—অত্যন্ত নিচু স্বরে কথা বলেন আর এমনভাবে মাঝে-মাঝে চোখ রাখেন মুখের উপর যে চোখে চোখ ফেলতে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। দিদিমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি ঘরে যেতেই আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন। আমি মিশুক ছিলুম না, বিশেষত কোনো পুরুষের সংশ্রব বর্জিত হয়ে মানুষ হবার দরুণ পুরুষ সম্বন্ধে আমার একটা অহেতুক ভয়ও ছিলো, কিন্তু তবুও আমি ঐ ভদ্রলোকের মৃদু আকর্ষণেই একটা ভয়মিশ্রত কৌতূহল নিয়ে কাছে গিয়ে মুখের দিকে তাকালুম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুন্দর ক'রে হাসলেন, তারপর পকেট থেকে লাল ফিতেয় বাঁধা এত বড়ো এক বাক্স চকোলেট বার ক'রে আমার হাতে দিলেন। নেবো কি নেবো না ভাবছিলুম হয়তো, এমন সময় এক কাপ চা হাতে নিয়ে আমার মা ঢুকলেন ঘরে—এই প্রথম তাঁর মাথায় কাপড় দেখলুম। কেমন একটা সলজ্জ সসংকোচ ভঙ্গিতে তিনি ভদ্রলোকের হাতে চা-টা দিয়েছিলেন সেই দৃশ্যটা আমার এখনো মনে পড়ে। দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই আগুন বুকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি, বাবা।' তাঁর চোখ সজল হ'য়ে উঠলো।

ভদ্রলোক মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—একটু সময়ের জন্য বোধ হয় তিনি অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন—দিদিমার কথায় সতর্ক হলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমি জানতুম না আপনারা এখানে, দেশে ফিরেছি মাত্রই দশদিন—হঠাৎ পশু আপনাদের ঠিকানা পেলুম। সুমন্ত্র আমার কতখানি ছিলো তা আপনাদের বোঝানো সম্ভব নয়। আমার বিলেত যাত্রার

রাস্তাটা বলতে গেলে ও-ই সুগম ক'রে দিয়েছিলো—' আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলুম বলতে-বলতে তিনি মা-র মুখের দিকে তাকালেন আর মা-র সাগ্রহ দৃষ্টি তখুনি নত হ'য়ে গেলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক—'আমার একটু দরকার আছে—আজ আর বসবো না।' নত হ'য়ে তিনি আমার দিদিমার পায়ের ধুলো নিলেন - মা-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কখনো ভাবিনি আপনাকে এ-অবস্থায় দেখবো। সবই ভাগ্য।' মা চুপ ক'রে রইলেন। আমি মা-র কাপড়ের আঁচল ধ'রে দাঁড়িয়েছিলুম, আমার গালে মৃদু টোকা দিয়ে বিদায় নিলেন।

তাঁকে দেখার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। তারপরে তিনি আবার এলেন, আবার এলেন—আমার জামা-কাপড়ের শ্রী বদলে গেলো, আমার মা-র মুখের বিষণ্ণতার পরিবর্তে ভ'রে থাকার একটা অদ্ভুত আভা দেখা দিলো—ক্রমে ক্রমে সংসারে যেন একটা নতুন আলো অনুভব করতে লাগলুম। শেষে আস্তে-আস্তে এমন হ'লো যে তিনিই এ-বাড়ির অভিভাবক হ'য়ে উঠলেন। মাকে আর অত পরিশ্রম করতে দেখতুম না, আমার পরিচর্যার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একজন স্ত্রীলোক এলো, বাড়িতে রাঁধবার জন্য ঠাকুর এলো—বাইরের কাজ করবার জন্য চাকর রাখা হ'লো। প্রথমটায় দিদিমা ও মাকে প্রায়ই এ নিয়ে নানারকম ওজর-আপত্তি আর অভিযোগ করতে শুনেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই সেই জেদ তাঁরা বজায় রাখতে পারেননি। আমার মা-র আত্মমর্যাদা ছিলো অসাধারণ, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বময় মানুষটির হৃদয়বৃত্তির কাছে নিশ্চয়ই তিনি হার মেনেছিলেন। একখানা ছোটো অস্টিন গাড়ি ছিলো ভদ্রলোকের ; সকালে-বিকালে সেই গাড়িখানা নিজেই চালিয়ে তিনি আসতেন। সকালের দিকে তিনি সবশুদ্ধ পনেরো মিনিটও হয়তো থাকতেন না—কেবল একটা খোঁজ-খবর নেয়া—তাঁর পায়ের শব্দ পেলেই মা-র মুখে একটা আলো ছড়িয়ে পড়তো—হাতের কাজ শিথিল হ'য়ে উঠতো, অকারণে এক কাজ থেকে আরেক কাজে নিজেকে নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করতেন। আমি চুপি-চুপি কানের কাছে মুখ এনে বলতুম, 'সাহেব এসেছেন, মা।' প্রথম দিন তিনি স্যুট প'রে এসেছিলেন আর আমার মনে গেঁথে গিয়েছিলো তিনি নিশ্চয়ই সাহেব। তারপরে দিদিমা কত বুঝিয়েছেন যে ইনি একজন

খাঁটি বাঙালি—আমার বাবার বিশেষ বন্ধু—তারপরে কতবার উনি ধুতি প'রে এসেছেন কিন্তু আমার মনের সেই সাহেবের ছবি কিছুতেই মুছে যায়নি। কাজ করতে-করতে মা ঈষৎ মুখ তুলে বলেছেন, 'আসুন। তুমি পড়তে বোসো গে।' এ-কথায় আমি দুঃখিত হ'য়ে যাই যাই ক'রেও ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতুম। এ-ভদ্রলোকের সান্নিধ্যের কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিলো আমার কাছে। এত দেখে-দেখেও তাঁর কাছে আমি সহজ ছিলুম না। সেই বালিকা বয়সেও আমি বুকের মধ্যে বড়ো মেয়েদের লজ্জা অনুভব করতুম। একটু পরেই ভদ্রলোক নিজেই মা-র ঘরে আসতেন। 'কেমন আছেন?' রোজই এক প্রশ্ন। আমি ভেবে পেতুম না এই তো কাল রাত দশটা পর্যন্ত দেখে গেছেন—আজ এটুকু সময়ের মধ্যে আবার কী হবে যে এই প্রশ্ন। মা-ও রোজকার মতোই মাথা নিচু ক'রে জবাব দিতেন, 'ভালোই।' একটু চুপচাপ কাটতো। তারপর মা চোখ তুলে তাকাতেন—আমি দেখতাম ভদ্রলোকও তাকিয়ে আছেন মা-র দিকে। তাঁদের দু'জনের মিলিত দৃষ্টির এমন একটা অনুভূতি আমার অপরিণত মনের মধ্যে ক্রিয়া করতো যে দুজনকে দু'জনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য আমি অস্থির হ'য়ে উঠতুম। মা তক্ষুনি বুঝে ফেলতেন আমার মনের কথা। সতর্ক হ'য়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসতো তাঁর মুখ দিয়ে। ভদ্রলোক বলতেন, 'কী হবে?' মা জবাব দিতেন না—আমার আঁচড়ানো মাথায় হাত দিয়ে ধীরে-ধীরে আরো পরিপাটি করতেন। তারপরে তাঁরা মৃদুকণ্ঠে আরো দু'একটা কথা বিনিময় করতেন—সে-সব কথার আমি মানে বুঝতে পারতুম না।

একদিন দিদিমা বললেন, 'তোমাকে বাবা আর কত কষ্ট দেবো, তুমি যা করলে—'

'ও-কথা বলছেন কেন?' ভদ্রলোক একটু আহত স্বরে বললেন, 'সুমন্ত্রর কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী ছিলুম। ঋণ তো কখনো শোধ হয় না, কিন্তু তবু যদি তার হ'য়ে কিছুটাও করতে পারি, সেইটাই আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ।'

'ও-কথা বোলো না—সে যদি তোমাকে কিছু ক'রেই থাকে তার একশো গুণ তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো আমাদের। যে-সময়টায় তোমার দেখা পেয়েছিলুম

—বলতে আর লজ্জা নেই যে সে-সময় আমাদের সম্ভ্রম রক্ষা করাই দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠেছিলো।'

'আমাকে আপনি পর ভাবেন কেন? আমার এই উপার্জনে যে আপনাদেরও একটা ন্যায্য দাবি আছে সেটা কেন ভাবতে পারেন না। আত্মীয় হ'লে কি কখনো এমন কথা বলতে পারতেন কি ভাবতে পারতেন?'

'কথাটা যে কত সত্য তা আমি বুঝি। আত্মীয়রা সর্বদাই শত্রু, অথচ তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতেও আমাদের লজ্জা নেই, কিন্তু—'

'এর মধ্যে কিন্তু নেই। এবার তো আমাদের আরো দরকার বাড়ছে,' হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'আমাদের বুলুমণিকে এবার ইস্কুলে দিতে হবে না? কী বলো, অ্যাঁ?'

আমি তখন আট বছরের হয়েছি। ঘাগরা দেয়া সুন্দর-সুন্দর ফ্রক পরি—দু'পাশে লাল রিবন দিয়ে বেণী ঝুলিয়ে দি—আর সব সময় মনের মধ্যে কেমন একটা অহংকার বোধ করি। কয়েকদিন থেকে ইস্কুলে ভর্তি নিয়ে মা-র সঙ্গে কান্নাকাটি করছিলুম—এ কথায় সুখী হ'য়ে লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে থাকলুম। ভদ্রলোক বললেন, 'খুব ভালো ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবো—ইস্কুলের বাস আসবে ভোঁ ক'রে—আর তুমি বেণী দুলিয়ে ছুটে গিয়ে উঠে বসবে। আমাদের তো তখন চিনবেই না।'

আমি একগাল হেসে লজ্জায় তাঁরই কোলের মধ্যে মুখ লুকোলাম।

'শোনো, শোনো - ' আমি মুখ তুললাম না। এর পরে তিনি মা-র ঘরে গেলেন। আমি সেখানেই চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তাঁর বুকের কাছটায় মুখ রেখেছিলুম, তাঁর গায়ের সৌগন্ধ লেগে রইলো আমার প্রাণে।

তার কয়েকদিন মধ্যেই আমি ইস্কুলে ভর্তি হ'য়ে গেলুম। লেখাপড়ায় আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিলো, ইস্কুলের আবহাওয়া আমার ভালো লাগলো। তাছাড়া বাড়িতে আমি নিঃসঙ্গ ছিলুম, এখানে অনেক মেয়ের বন্ধুতা. অনেক দিদিমণিদের স্নেহ আমার জীবনে যেন একটা নতুন জগৎ এনে দিলো। প্রথম বছরটা আমি ইস্কুলের বাস্-এ যেতাম. দ্বিতীয় বছরে আমাদের একখানা বড়ো গাড়ি এলো। আমাদের মানে ভদ্রলোকের। তাঁর ছোটো গাড়িখানাও ছিলো, সেটা তিনি নিজে ব্যবহার করতেন আর এ-গাড়ি রইলো আমাদের জন্য।

মা ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বললেন, মিছিমিছি অর্থ নষ্ট, কী দরকার ছিলো আবার এ-গাড়িটা কেনবার?'

'শস্তায় পেলাম।'

'শস্তায় পেলেই সব যদি যদি কিনতে হয় তাহ'লে—'

'চুপ করো তো—'

ইদানিং মা-কে তিনি তুমি বলতেন। আমার ভালো লাগতো না কিন্তু আমার তো কোনো হাত নেই। মা বললেন, 'আমি তো চুপ ক'রেই থাকি! কিন্তু সত্যি এ আমার ভালো লাগছে না।'

'আচ্ছা, তোমার ভালো না লাগে আমি আর বুলু ঘুরে বেড়াবো। কেমন?'

মা-র পিছনে দাঁড়িয়ে পেন্সিলের কাঠ চিবোচ্ছিলাম—মৃদু হেসে মুখ নামালাম। আমাকে সম্বোধন ক'রে উনি যখনই কোনো কথা বলেন ভিতরে-ভিতরে আমি যেন কেমন-এক রকমের শিহরণ অনুভব করি। আজ প্রায় তিন বছর ধ'রে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের এ-রকম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—বলতে গেলে তিনিই বাড়ির কর্তা, অথচ একদিনের জন্য, তাঁর মুখোমুখি আমি লজ্জা কাটাতে পারিনি—আজ পর্যন্ত তাঁকে আমি কোনো সম্বোধন করি না। আমার দিদিমা বলেন, 'এ আবার কী! বাবার বন্ধু, তাছাড়া এমন মানুষ, কত ভালোবাসেন, কত যত্ন করেন, তার কাছে আবার লজ্জার কী আছে? কাকা ব'লে তো একদিন ডাকতেও শুনি না।'

মা বলেন, 'ও বুনো হ'য়ে গেছে, মা। জ'ন্মে থেকে তো মা আর দিদিমা—অন্য মানুষ তাই ওর বরদাস্ত হয় না।'

বরদাস্ত হয় না—এ-কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। সত্যিই তিনি আমাদের এত ভালোবাসেন, এত যত্ন করেন, সংসারের সমস্ত সুখ আমাদের জন্যই আহরণ করেন তিনি, তথাপি আমি তাঁকে বরদাস্ত করতে পারি না। এমন নয় যে আমি তাঁকে ভালোবাসি না—তাঁকে পছন্দ করি না কিংবা তাঁর কোনো ব্যবহারই আমার মনের প্রতিকূল হয়েছে বিশেষ ক'রে আজ জীবনের এইখানে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার উপলব্ধি করছি যে আমি তাঁকে দেখামাত্রই অতিরিক্ত ভালোবেসে ফেলেছিলুম ব'লেই তাঁর প্রতি আমার একটা অহেতুক বিদ্বেষ ভাবও ছিলো। আমার বয়সের মেয়ের প্রতি যতটা মনোযোগ দেয়া

উচিত এবং যে-রকম মনোযোগ দেয়া উচিত, তিনি কেবলমাত্র সেটাই কেন দিয়েছিলেন সেটাই ছিলো আমার পরম হতাশার কারণ। আমার শিশু-মন যেটা বোঝেনি, আজকের অভিজ্ঞ মন দিয়ে সেটা বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে পারছি যে আমাকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্য কারো প্রতি তাঁর একতিল বেশি আসক্তিও ছিলো আমার পক্ষে দুঃসহ। মাত্র ঔচিত্যের মাপে যে মনোযোগ তিনি আমাকে দিলেন, বন্ধুপত্নীর প্রতি সে-মনোযোগের প্রশ্নই উঠলো না—তাঁর জন্য তিনি সারা পৃথিবী জয় ক'রে আনতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। আমি আমার শিশু-মনের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে প্রথম দিন থেকেই সেটা উপলব্ধি ক'রে ভিতরে-ভিতরে যন্ত্রণা পেতুম। হয়তো মা-র প্রতি আমি ঈর্ষাকাতরই হয়েছিলুম।

আস্তে-আস্তে বড়ো হ'তে লাগলুম। আমার সতেরো বছর বয়স হ'লো—সুখে সমৃদ্ধিতে সাচ্ছল্যে ভরা সংসারে আমার কোনোই দুঃখ ছিলো না, তবু আমার ভিতরে-ভিতরে কেমন একটা ভালো-না-লাগা-বোধ অবিশ্রান্ত আমাকে কষ্ট দিচ্ছিলো। একদিন পড়তে-পড়তে হঠাৎ উঠে এলাম মা-র কাছে। মা সোয়েটার বুনছিলেন। মা-র নতদৃষ্টি সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁর মসৃণ রংয়ের সুগঠিত দু'টি হাতের ওঠা-পড়া দেখতে দেখতে তাঁকে আমার সমবয়সী মনে হ'তে লাগলো। হঠাৎ চোখ তুলে তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে বললেন, 'কী রে?'

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বুনছো?'

'তোমার সাহেব-কাকার জন্য একটা সোয়েটার। কিছু বলবে?'

কোনো ভূমিকা না-ক'রে হঠাৎ বললাম, 'আচ্ছা মা, এ-ভদ্রলোক তো সত্যিই আমার কাকা নন, তবু কেন আমরা তাঁরটাই ভোগ করি?' মা চকিত হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এ-রকম একটা প্রশ্ন যে আমার মনে উঠতে পারে, এ-কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'সত্যি কাকা বলতে কী বোঝায় তা কি তুমি জানো?'

'বাবার বন্ধু, এই তো? কিন্তু বাবার বন্ধু বাবাও না কাকাও না—লোকে তাঁকে পরই বলবে। তাঁর গাড়ি চ'ড়ে ইস্কুলে যাই—তাঁর টাকা দিয়ে ভালো বাড়িতে থাকি—তাঁর দয়াতে ভালো-ভালো পোশাক পরি—আত্মসম্মানে লাগে আমার।'

হাতের সোয়েটারটা মা যেন ঝেড়ে ফেলে দিলেন, সোজা উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বললেন, 'ভালো যিনি বাসতে জানেন তিনিই পরম আত্মীয়—ভালোবাসাই সম্মান—ভালোবাসাই জীবন—তার চাইতে বড়ো কিছু নেই।'

'লোকে যদি বলে—'

'লোকে কী বলে না বলে তা তোমাকে ভাবতে হবে না, বুলু।'

মরীয়া হ'য়ে বললাম, 'কেন ভাবতে হবে না—লোক নিয়েই তো আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।'

'বুলু!' মা একটা মর্মভেদী গলায় আমাকে সম্বোধন ক'রে সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম। এত বছরের অভ্যস্ত জীবন সম্বন্ধে যে আমার মনে কেন এই অকারণ প্রশ্ন ধাক্কা দিচ্ছে, তা কি আমিই জানি? আট বছর বয়স থেকে যে-ক্ষোভ প্রতিদিন প্রতি পলে আমার মনের মধ্যে সযত্নে লালিত হয়েছে, এতদিনে তার একটা সুস্পষ্ট উপস্থিতিতে আমার সারা অন্তর ভ'রে গেলো।

বিকেলবেলা ভদ্রলোক যখন এলেন আমি লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হ'য়ে গিয়ে নিজের ঘরে লুকোলাম। ছ' বছর বয়স থেকে এই ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত আমি তাঁকে দেখছি, তাঁর যত্নে তাঁর ভালোবাসায়ই এই দেহ মন ভ'রে আছে, আর তাঁর সম্বন্ধে আজ আমি এত বড়ো কথাটা উচ্চারণ করেছি ভেবে দুঃখে বুক ভ'রে গেল। তিনি কি আমার পর? তিনি কি আমাদের দয়া করেন? তাঁর অর্থ কি কখনো সাহায্যের পর্যায়ে পড়ে? আমি জানলা দিয়ে তাঁকে উঠে আসতে দেখলাম। সেই দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, উন্নত চেহারা—ঘন কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা—আর এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল চামড়া। সহসা আমি আমার আঙুল গুনে-গুনে তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের হিসেব করলাম।

যথারীতি তিনি দিদিমার কাছে গিয়ে বসলেন। আমি আমার ঘর থেকেই সেটা অনুভব করলাম, কেননা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আমি সেদিকেই নিবিষ্ট ক'রে রেখেছিলাম। দিদিমার শরীরের অবস্থা ভালো ছিলো না। কিছু-দিন থেকে তিনি আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং আমি লক্ষ্য করেছি সেই ব্যাকুলতার সঙ্গে এই ভদ্রলোকেরও পরিপূর্ণ সায় ছিলো।

কাছাকাছি ঘর—আমি তাঁদের কথোপকথনে কান দিলাম। দিদিমা বললেন, 'যদি তুমি ভালো মনে করো তাহ'লেই ভালো—আমি কী বুঝি।'

'তাহ'লে একদিন নিয়ে আসি ছেলেটিকে!'

'আনো। ওর মায়ের সঙ্গে কথা ব'লে দ্যাখো।'

'বুলুকেও জিজ্ঞেস করতে হয়!'

'বুলু!'—দিদিমা বোধ হয় একটু হাসলেন, 'ও আবার কী বোঝে?'

'না না, ওকে আপনি অবহেলা করবেন না। ওর মতো বুদ্ধিমান মেয়ে বিরল।'

'তোমরা দ্যাখো ওর বুদ্ধি। ওর মা-ই আমার কাছে শিশু, আর ও তো তার মেয়ে।' আর অল্প দু' একটা টুকরো কানে ভেসে এলো, তারপরে তিনি উঠে এলেন মা-র কাছে।

মা-র ঘরসংলগ্ন ছোট্ট এক ফালি বারান্দা ছিলো—সেই বারান্দায় এসে জুতোর শব্দ থামলো—বুঝলাম, মা ব'সে আছেন সেখানে। অত্যন্ত মৃদু স্বরে ভদ্রলোক কী বললেন আমি বুঝতে পারলাম না, অত্যন্ত ক্লিষ্ট গলায় মা জবাব দিলেন, 'কিছু না।'

আমি অত্যন্ত নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দার পাশের ঘরে এসে বসলাম।

ভদ্রলোক বললেন, 'বুলুর বিয়ে সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।'

'আমি কী বলবো, তুমি যা ভালো বোঝো তা-ই হবে।'

মা-র তুমি সম্বোধনে আমি আঁৎকে উঠলাম। যে-সন্দেহ আমাকে প্রতিদিন ক্ষয় করছিলো, মা-র সংযত আচরণ প্রতি মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে এমন একটি প্রমাণও পাইনি যা থেকে সেই সন্দেহকে আমি রূপ দিতে পারি। সমস্ত শরীরে একটা বৈদ্যুতিক অনুরণন অনুভব করলাম।

'তোমার মেয়ে—'

অত্যন্ত উদাস গলায় মা বললেন, 'মেয়েই আমার—আর সবই তো তুমি করেছো—'

'তাহ'লে তোমার মত আছে কিনা, বলো।'

'আছে।'

'তোমার আজ কী হয়েছে?'

'তোমাকে একটা কথা বলবো।' মা-র গলা অত্যন্ত দৃঢ়।

'বলো।'

'এগারো বছর ধ'রে তুমি যত ঋণ দিয়েছো সব আজ আমি শোধ ক'রে দেবো!'

'ঋণ! মণি, ঋণ? আমি তোমাকে ঋণ দিয়েছি, আর সেই ঋণ তুমি আজ শুধে দেবে?' ভদ্রলোকের গলা ধ'রে এলো। মা বললেন, 'কেন এত করছো তা তো আমি জানি—প্রতি মুহূর্তে যে-আবেদন তোমার চোখ দিয়ে তুমি আমাকে জানিয়েছো—সে আবেদন আমি হৃদয়ের মধ্যে অনেক আগেই গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।'

'সামাজিক অনুষ্ঠান? যা আমার প্রত্যহের স্বপ্ন—সমস্ত জীবনের বিনিময়ে একমাত্র যা আমার কাম্য—তুমি কি সত্যি সেই কথা বলতে চাইছো?'

'হ্যাঁ। আমি মনস্থির করেছি—তোমার আমার যুক্ত জীবনকে এ-ভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখার কোনো যুক্তি নেই, সেটাই পাপ।'

'এ কি সত্যি?'

'হ্যাঁ। এতদিন ঈশ্বর সাক্ষী ছিলেন, এখন মানুষকে সাক্ষী ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই—'

আমি ঘরের মধ্যে সহসা দুই কানে হাত চেপে ধরলাম, তারপর একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ছুটে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। দিদিমার মুমূর্ষু দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তিনি কঁকিয়ে উঠলেন। 'কী, কী, কী হয়েছে?' দুর্বল হাতে জড়িয়ে ধ'রে অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমি কান্নার বেগে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না—একটু শান্ত হ'য়ে বললাম, 'আমি বিয়ে করবো না, দিদিমা, বিয়ে ভেঙে দাও।' 'সে কী কথা—' আশ্চর্য হ'য়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি নির্লজ্জের মতো বললাম, 'যাকে মন দিয়েছি—তাকে ছেড়ে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।' আমার কথা শুনে দিদিমা হতবাক্ হ'লেন। আমাকে ঠেলে নিজের গায়ের উপর থেকে তুলতে চেষ্টা ক'রে বললেন, 'বলছিস কী তুই? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।' আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'আমি বিমলেন্দুবাবুকে বিয়ে করবো।'

'বিমলেন্দু—? বিমল? তোর সাহেব-কাকা?' দিদিমা কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসলেন—আমি তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলাম, 'হ্যাঁ, তাঁকেই। তিনিই আমার স্বামী?'

দিদিমার মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না। স্তব্ধ হ'য়ে মরা মানুষের মতো ব'সে রইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভ'রে গেলো ঘর। খানিক পরে নিঃশব্দে মা ঘরে এসে আলো জ্বাললেন—আমাকে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকতে দেখে অবাক হ'য়ে বললেন, 'এ কী, বুলু! কী হয়েছে?'

আমি জবাব দিলাম না। দিদিমা বললেন, 'মলিনা, শোনো।' মা কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বিমলের সঙ্গেই বুলুর বিয়ে ঠিক কর। বয়সে একটু বড়ো, তা আর কী! আমার শাশুড়ি আর শ্বশুরও কুড়ি বছরের ছোটো-বড়ো ছিলেন।'

'এ কী বলছো, মা?'

'ঠিকই বলছি, এর চাইতে ভালো আর তুই কী আশা করিস?'

'ছি ছি,' মা শিহরিত হ'য়ে উঠলেন, 'ও ওঁর কন্যার মতো—এমন অসংগত কথা তুমি ভাবলে কেমন ক'রে, মা?'

'কিছুই অসংগত নয় সংসারে। তুই তাকে বলবি এ-কথা।' মা-র মুখে একটি কালো ছায়া বিস্তীর্ণ হ'লো। আমার মাথায় ঈষৎ ঠেলা দিয়ে বললেন, 'দিদিমা কী বলছেন শুনলে, বুলু?'

আমি নিঃশব্দে প'ড়ে রইলাম। মা আবার বললেন, 'দিদিমা কী বলছেন—বুলু—'

আমি নিঃশব্দ।

'হুঁ—' মা-র মুখ দিয়ে এ-শব্দটি এমন একটি মূর্তি নিলো আমার কাছে যে আমার মনে হ'লো সমস্ত ঘরে যেন আগুন লেগেছে, পুড়ে এক্ষুনি ছাই হ'য়ে যাবে।

অত্যন্ত একটা অশান্তি আর অস্বস্তিতে কাটতে লাগলো সময়। বাড়িময় যেন একটা ভূতের ফিশফিশানি, কেমন-এক অদৃশ্য ভয়ে মুহুর্মুহুঃ আমি কেঁপে উঠতে লাগলাম। রাত্রিতে মা-র সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে সময় কাটতে লাগলো —আমি অনুভব করলাম তিনি ঘুমোননি—তিনিও হয়তো অনুভব করলেন

যে আমার চোখ নির্ঘুম। অনেক রাত্রে আমার গায়ের উপর হাত রেখে মা ডাকলেন, 'বুলু, ঘুমিয়েছো?'

'না।'

'তোমার দিদিমা যা বললেন, তা-ই কি তোমার মত?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি জানো এতদিন ধ'রে এ-সংসারকে তিনি লালন-পালন করেছেন কার জন্য?'

'জানি।'

'কী জানো?'

'তোমার জন্য।'

'তাহ'লে তুমি জানো যে আমি তাঁর জীবনের প্রধান কেন্দ্র? আমাকে ঘিরেই তাঁর সুখদুঃখ।'

'জানি।'

'তবে?'

'আমি তাঁকে ভালোবাসি। তিনি তোমাকে যত ভালবাসেন তার চাইতে অনেক, অনেক বেশি আমি তাঁকে ভালোবাসি।'

অত্যন্ত ধীর স্থির গলায় মা বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস করো না যে তাঁর অতখানি ভালোবাসা আমিও অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছি? আর তা সার্থক করবার একমাত্র বাধা ছিলে তুমি? তোমার জন্যই আমি আমার সমস্ত ইচ্ছাকে এতকাল গলা টিপে রেখেছি।'

'বাবার মৃত আত্মাকে তুমি অসম্মান করছো।'

'আমি ম'রে গেলে কি তোমার বাবা আমার আত্মার কথা ভাবতেন?'

'তুমি স্ত্রী, তিনি স্বামী।'

'সে তো সমাজের অনুশাসনের প্রভেদ! আত্মার তো কোনো ভেদাভেদ নেই।' হঠাৎ আমি ভেবে পেলাম না এ-কথার কী জবাব দেবো। একটু পরে মা-ই বললেন, 'তুমি আমার সন্তান। শরীরের বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়ে তিলে-তিলে আমি তোমাকে লালন করেছি, প্রাণের অধিক ভালোবেসে, সাধ্যের অতিরিক্ত যত্ন দিয়ে তোমাকে বড়ো হ'তে সহায়তা করেছি, সত্যি বলতে, এ-ভদ্রলোকের সাহায্য তোমার কথা ভেবেই প্রথম গ্রহণ করেছিলাম।

কিন্তু আজকের দিনে তুমিই আমার পরম শত্রু। আজ এই অন্ধকারে শুয়ে তোমার সঙ্গে যে-কথা আমাকে বলতে হ'লো সেটা মা-মেয়ের কথা নয়, আমার পক্ষে তার চাইতে লজ্জার, তার চাইতে মর্মান্তিক আর কী থাকতে পারে? কিন্তু তবু তোমাকে বলি, অনেক দিন আগেই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, আমি রাজি হইনি কিন্তু কাল আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলুম—'

'মা!'

'বুলু!'

'মা—' কান্নার বেগে আমার সমস্ত শরীর উদ্বেলিত হ'তে লাগলো। একটু পরে মা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন – একটা নিশ্বাস নিতে-নিতে বললেন, 'অদৃষ্টের এ কী বিড়ম্বনা!'

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙেও বিছানায় প'ড়েছিলুম। মা কখন উঠে গেছেন জানি না। জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছিলো বিছানায়, বুঝলাম বেলা হয়েছে। সহসা ঐ ভদ্রলোকের গলা শুনে ধড়মড় ক'রে উঠে গেলাম। দ্রুত পায়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন, আমাকে তখনো বিছানায় দেখে অবাক হ'য়ে বললেন, 'ও মা, এখনো ঘুমুচ্ছো? ওঠো, ওঠো, মা কই? শিগগির একবার বসবার ঘরে এসো।'

চোখ তুলতে পারলাম না সংকোচে। ততক্ষণে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে অদৃশ্য হলেন। দেয়ালে ঠেকানো তক্তপোশে হেলান দিয়ে ব'সে রইলাম চুপ ক'রে। হাত-পা যেন কেমন শিথিল হ'য়ে এলো।

খানিক পরে মা এলেন ঘরে। সেই কালো-পাড় শাড়ি, মাথার আঁচল ঈষৎ তোলা—সরু হার গলায় চিকচিক করছে—সেই রকম শান্ত, গম্ভীর মুখশ্রী। এতদিনের দেখা মাকে আবার দেখলুম। মাথার কাছের আধো-ভেজানো জানলা খুলে দিয়ে বললেন, 'ওঠো, কত বেলা হ'লো।' একটু থেমে—'কাল বিমলবাবু বলেছিলেন একটি ছেলেকে নিয়ে আসবেন—তিনি এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

ভ্রূ কুঞ্চিত হ'লো। উঠছিলাম, থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, 'জানি কেন।'

ক্ষিপ্রহস্তে বিশৃঙ্খল বিছানা পাট করতে-করতে মা জবাব দিলেন, 'সেই কেন আজ আর নেই—তোমার ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টাই আমি করবো। কিন্তু বাড়িতে যখন অতিথি আসেন তাঁর সঙ্গে শোভন ব্যবহারই ভদ্রতা।'

আমি মেনে নিলাম। একটু পরে মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে—আমি বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে যথারীতি ভদ্র হ'য়ে এ-ঘরে এলাম।

আমার বয়স এবং বুদ্ধির যোগ্য এ-পাত্র। বিমলবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন—অত্যন্ত লাজুক চোখে একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিলো ছেলেটি।

বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়, ঈষৎ ঢেউ খেলানো বড়ো-বড়ো ঘন আর বিশৃঙ্খল চুল মুখ ঘিরে আছে। ভালো ক'রে তাকে দেখবার অবকাশ ঘটলো—কেননা সে নিজে নতদৃষ্টি—আর বিমলেন্দুবাবু মাকে ডাকতে গেলেন। খুব যে একটা বলবান পুরুষ তা নয়—কিন্তু স্বাস্থ্যের আভায় ভরা মুখ। কালো আর সুসন্নিবিষ্ট ভুরুর তলায় দুটি ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখ। একটু কেশে, একটু লাল হ'য়ে ছেলেটি মুখ তুললো এবার—ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললো, 'আপনি তো স্কটিশেই পড়ছেন, আমিও ঐ কলেজে পড়তুম।'

'ও।'

'খুব ভালো লাগতো, আমাদের একটা আলাদা দলই ছিলো—'

'আমার ভালো লাগে না—'উৎসাহের মুখে পাথর চাপা দিয়ে ব'লে উঠলাম আমি। আমার নিষ্করুণ জবাবে হঠাৎ থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেলো ছেলেটি। আমি বললাম, 'ভারি খারাপ ছেলে সব। এ-দেশে নাকি এখন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে শিক্ষার সময় হয়েছে—আমার তো মনে হয় না।' ঈষৎ প্রতিবাদের গলায় (যদিও খুব স্তিমিত) বললো, 'তা দেখুন—সব মেয়েও তো কিছু ভালো হয় না—ছেলেদের মতো তাঁদের মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে।'

'জানি না।'

আমার কথাবার্তা যে অত্যন্ত উদ্ধত ও স্পষ্ট ছিলো সে-বিষয়ে আমি অচেতন ছিলাম না। বিরক্তির বাষ্পে ওকে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে আমার ভালো লাগছিলো। ও যে এসেছে আর সে-আসা যে ওর পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হয়েছে সে-কথা ওকে জানানো ভালো। আমার জবাবের পর একটুখানি থেমে রইলো ওর জিহ্বা, আমি উঠে যাবার জন্য মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, সহসা মুখ তুলে বললো, 'আজ কখন যাবেন?'

'যাবো! কোথায়?'

'কেন, বিমল-দা যে বললেন—'

'কী বলেছেন বিমলবাবু?'

'আমাকে তো ধ'রে নিয়ে এলেন—'

ওর কথার মধ্যিখানেই মা আর বিমলবাবু ঘরে ঢুকলেন। ও থেমে গিয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মৃদুহাস্যে মা বললেন, 'উঠছো কেন? বোসো। বুলু, যাও তো, চা নিয়ে এসো। আমি সব ঠিক ক'রে রেখে এসেছি।'

মা-র এই আদেশ আমি মনে-মনে অপছন্দ করলুম। চাকর দিয়েও অনায়াসে এটা চলতো। তবু উঠতে হ'লো।

চায়ের পর্বটি কিছু বিরাট ছিলো না, তবু অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি। নিজে হাতে ক'রেই সব নিয়ে এলাম। বিমলবাবু সাহায্য করলেন। আমাকেও বসতে হ'লো ওদের সঙ্গে চা খেতে। এতক্ষণে দেখলুম ছেলেটি সহজ হয়েছে, অত্যন্ত আগ্রহভরে কথা বলছে মা-র সঙ্গে। অবশেষে সেই অর্ধসমাপ্ত প্রসঙ্গ ফিরে এলো।

'কখন যাবেন, বিমল-দা?'

আমি একচোখ প্রশ্ন নিয়ে তাকালাম বিমলবাবুর দিকে। মা-র মুখ দেখে মনে হ'লো এই যাওয়ার খবরটা মা জানেন।

বিমলবাবু হাতঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, 'বাবা! এর মধ্যেই সাড়ে-আটটা! এক কাজ করো, অসিত, তুমি আর আজ যেয়ো না, এখানেই যা-হয় দুটো খেয়ে নাও—আমি এদিকে বারোটার মধ্যে কাজকর্ম সেরে চ'লে আসি, তারপরে—'

মা ব'লে উঠলেন, 'সেটাই সবচেয়ে ভালো।'

'না, না,' অপাঙ্গে একবার আমাকে দেখে নিয়ে অসিত ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'আপনারা কখন যাবেন বলুন, আমি ঠিক সময়ে আসবো।'

'কোথায় যাবে, মা?' আমি আর কৌতূহল রাখতে পারলাম না।

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার সাহেব-কাকা আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাচ্ছেন তোমাদের নিয়ে।' মুখ থেকে কথা শেষ না-হ'তেই বিমলবাবু ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন, 'তুমি বুঝি বাদ?'

সাহেব-কাকা ব'লেই মা আমার মেজাজ খারাপ ক'রে দিয়েছিলেন। কালকের ঐ ব্যাপারের পরেও মা যে কী ক'রে তাঁকে আমার কাকা ব'লে উচ্চারণ করলেন জানি না—উপরন্তু মা যাবেন না ব'লে বিমলবাবুর এই

ব্যাকুলতা আমাকে চাবুক মারলো। দুর্বিনীতের মতো উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে—আলস্য ভাঙতে-ভাঙতে অবহেলার ভঙ্গিতে বললাম, 'তোমারই যাও, মা—আমি যাবো না।'

'কেন?' বিমলবাবু বললেন, 'তোমার জন্যেই তো যাওয়া—তুমি না-গেলে নাকি হয়?'

'আমার জন্যে কিনা জানি না—তবে হ'লেও আমি যাবো না, এটা ঠিক।'

'তোমার আবার কী হ'লো?'

'এর মধ্যে একটা হওয়া-না-হওয়ার কী দেখছেন, বিমলবাবু?' আমার বিমলবাবু সম্বোধনে উনি অবাক হ'য়ে গেলেন—মা-র মুখ, রাগে কি লজ্জায় জানি না, মুহূর্তে লাল হ'য়ে উঠলো। আমি গ্রাহ্য না-ক'রে অতিরিক্ত সহজ-ভাবে তাকালাম সেই আগন্তুক আর অপ্রস্তুত ছেলেটির মুখে—সহাস্যে বললাম, 'আচ্ছা নমস্কার, আশা করি আবার দেখা হবে।' প্রত্যভিবাদনের আর অপেক্ষা না-ক'রে তিনটি প্রাণীকে বিমূঢ় ক'রে দিয়ে সোজা চ'লে এলাম নিজের নির্জন ঘরে।

তারপরে সমস্ত ব্যাপারটা মা অবশ্যই কোনোরকমে তাঁর নিজের ভদ্রতা আর নম্রতা দিয়ে মানিয়ে নিয়েছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমার যখন মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো, মা তখন ঘরে এলেন। সোজা তিনি আমার মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'সমস্ত জীবনটা যে আমি তোমার জন্যই উৎসর্গ ক'রে রেখেছিলাম, তুমি কি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছো, বুলু?'

ভীরু চোখ চকিতে তুললাম। জবাব দিলাম না।

'বলো, জবাব দাও—আমার চোখের সামনে আমার হাতে গড়া সন্তান এত বড়ো উদ্ধত আচরণ করবে, অহেতুক অসম্মান করবে শ্রদ্ধেয়দের, আর আমি চুপ ক'রে তা দেখবো? বুলু, তুমি ভেবেছো কী?'

কথা বলতে-বলতে মা-র নিশ্বাসের উত্থান-পতন দ্রুত হ'লো। ছেলেবেলা থেকে মা আমাকে স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে, বন্ধুতার উত্তাপ দিয়ে বড়ো করেছেন—শাসন করেছেন তার ফাঁকে-ফাঁকে—আমি জানতে পারিনি। তাঁর সঙ্গ, তাঁর স্পর্শ, তাঁর স্বভাবের মাধুরী আমার সারা হৃদয়ের সকল অভাব মিটিয়ে রেখেছিলো, আর আজ দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেখলাম, তাঁর

চাইতে বড়ো শত্রু আমার কেউ না। হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম —তীব্র-কণ্ঠে মা ব'লে উঠলেন, 'আমারই অন্যায়, আমারই প্রশ্রয়ে আজ তোমার এতখানি দুঃসাহস। যিনি তোমার পিতৃতুল্য তাঁকে তুমি প্রেমিক ভাবো,—যে মুহূর্তে তুমি এ-কথা উচ্চারণ করেছিলে সে-মুহূর্তেই—'

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো—মুখে-মুখে ব'লে উঠলাম, 'কেন, কিসের জন্য ? কেন তুমি তাঁকে আমার কাকা ব'লে সম্বোধন করলে একটু আগে ?'

'তুমি তাঁকে যা-ই ভাবো তিনি তোমার পক্ষে তাছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারেন না।'

মুখে মুখে অসভ্যের মতো বললাম, 'স্বামীর বন্ধু হ'য়ে তিনি তোমার পক্ষে অন্য হ'তে পারলে আমার পক্ষেও হ'তে পারেন।'

'বুলু, আমি তোমার মা !' সহসা মা-র গলা যেন কান্নার আবেগে বুজে এলো। আমি নিবৃত্ত হ'তে পারলাম না—অনেকদিনের অনেক ক্লেদাক্ত ঈর্ষা মনের মধ্যে লালন করেছি এতদিন ধ'রে, আজ তা কথার রেখায় মূর্তি নিলো। যাঁকে বুকের মধ্যে পাবার জন্য অবিরত ইচ্ছার তীব্র আবেগে আমি ম'রে যাচ্ছি, যাঁকে না-পেলে সমস্ত জীবন আমার গভীর অন্ধকারে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে,—তাঁকে যে-মেয়ে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে, যে-মেয়ের জন্য তিনি আজ অন্যদিকে মুখ ফেরাতে পারেন না, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, মা হ'লেও না। চোখে চোখে তাকিয়ে বললাম—'তিনিও অবিবাহিত, আমিও কারো স্ত্রী নই—তোমার জন্য আমার সমস্ত জীবন আজ ব্যর্থ হ'তে বসেছে—তুমিই আমাদের জীবনকে যুক্ত করবার একমাত্র প্রতিবন্ধক।'

'কী হয়েছে ?'—ঘরের মধ্যে সহসা বিমলবাবু ঢুকলেন এসে, 'বুলুর আজ হ'লো কী ? মেজাজ এত বিগড়েছে কেন ?'

আমার কথা শুনে মা-র চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়ছিলো, তাঁকে দেখে আমি চুপ করলাম।

'হ'লো কী তোমাদের ?' আশ্চর্য হ'য়ে তিনি একবার মা-র দিকে, একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর আমার একান্ত কাছে এসে তাঁর সেই বলিষ্ঠ স্নেহভরা বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে বলো তো বুলু। লক্ষ্মী মা আমার।'

ছিটকে স'রে এলাম বুকের সান্নিধ্য থেকে। ক্রন্দন-বিজড়িত গলায় বললাম, 'আপনি আমাকে মা বলেন কেন?'

অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে থমকে গেলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ আমি দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁর বুকের উপর; দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে কেঁদে-কেঁদে মুখ ঘ'ষে-ঘ'ষে বলতে লাগলাম, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি—খুব ভালোবাসি—মা-র চাইতে বেশি, অনেক, অনেক বেশি।'

আমার এই অতর্কিত আবেগের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না—আমার এ-রকম অসংলগ্ন কথাবার্তাও অবশ্যই তাঁকে বিরক্ত ও বিস্মিত ক'রে থাকবে—আমাকে ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'শান্ত হও, কী হয়েছে খুলে বলো।' তাঁর গলার গম্ভীর স্বরে হঠাৎ আমি ভয় পেলুম।

তাঁর স্বভাবত ধীর কণ্ঠ আরো ধীর হ'লো, পিতৃত্বের গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়লো তাঁর মুখে, মা-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যাও, অসিতকে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

মা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন—ভাবে মনে হ'লো না কোনো কথাই তাঁর কানে ঢুকেছে। বিমলবাবু মুখের দিকে তাকিয়ে একটু উদ্বিগ্ন হ'লেন। আবার বললেন, 'আমি বুলুর সঙ্গে কথা বলবো—তুমি অসিতের কাছে গিয়ে বোসো।'

মা আস্তে ব'সে পড়লেন মেঝের উপর।

'কী হোলো, মণি, কী হোলো,' উদ্‌ভ্রান্ত গলায় ব'লে উঠলেন বিমলবাবু, 'বুলু, শিগগির জল নিয়ে এসো।'

চ্যাঁচামেচিতে বাড়ির সব ক'টি প্রাণীই জড়ো হ'লো সেই ঘরে—দেখলুম, অসিতও এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়। কেবল অসহায় দিদিমা ও-ঘর থেকে কাৎরাতে লাগলেন। ব্যাকুল হ'য়ে বিমলবাবু বললেন, 'এই অসিত, তুমি শিগগির ডক্টর মুখার্জিকে নিয়ে এসো—একটুও দেরি না—' তারপর মা-র মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'মণি, মণি,—শোনো, এই শুনছো?' তাঁর গলার সুরে কী ছিলো সে-কথা আমি কেমন ক'রে বোঝাবো? হয়তো ভালোবাসার অতলস্পর্শী সম্মোহন ছিলো তাঁর কণ্ঠে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে।

বিশেষ কিছু না—একটুখানি সময়ের জন্য হয়তো মা-র চৈতন্য লুপ্ত

হয়েছিলো, খানিক পরেই তিনি চোখ খুললেন। ডান হাতটি একটু নেড়ে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'বুলু, আয়।'

মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে মা-র কপালে হাত রাখলাম—তাঁর সুন্দর মুখে দুঃখবেদনার লীলা। একটু আগে যে-মা আমার পরম শত্রু ছিলেন, যাঁর অস্তিত্বই ছিলো আমার জীবনের চরম সুখের পক্ষে সর্বপ্রধান অন্তরায়, সেই মা-র এইটুকু অচৈতন্যের ব্যবধানই আমাকে তাঁর অনেক কাছে এনে ফেললো। মা আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সুগভীর লজ্জায় দু' হাতে মুখ ঢেকে নিতান্ত অসহায়ের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন।

অসিত ফিরে এলো ডাক্তার নিয়ে। তার মুখেও উদ্বেগের ছায়া। ফিশফিশিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছিলো?' আমি বললাম 'এই একটু অজ্ঞান মতো—'

'এ-রকম আরো হয় নাকি?'

'না।'

আমার সংক্ষিপ্ত জবাবে আর-কিছু জিজ্ঞাসা করতে সে ভরসা পেলো না, বোধহয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মা স্বাভাবিক হ'য়ে উঠলেন। বিমলবাবু নিজেও গেলেন না—অসিতকেও ধ'রে রাখলেন সে-বেলার জন্য। আবহাওয়াটা সহজ করবার জন্য হাসিমুখে বললেন, 'আমার এত সাধের রবিবারটাই মাটি করলে তোমরা। কোথায় ভেবেছিলাম বোটানিকেলে গিয়ে গাছের ছায়ায়-ছায়ায় চমৎকার ঘুরে বেড়াবো—চারটা না-বাজতেই মাঠে ব'সে চর্ব্যচোষ্য সহযোগে চা পান—কী কাণ্ডই হ'লো বলো তো? কী আর করবে, অসিত, তোমারই ভাগ্য। বুলু, অসিতকে ভালো ক'রে বলো—ও কিছুতেই থাকতে চাইছে না। আমিই জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিলাম—'

'আমি যাই, বিমল-দা, আমার আজ—'

মা বললেন, 'বোসো।' তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গিতে অপরিমিত স্নেহ ও আদেশ ছিলো। তিনি যেন মা আর অসিত তাঁর ছেলে। অসিত বাধ্য ছেলের মতো বসলো, আর কথা বললো না। আমি উঠে গেলাম সেখান থেকে। বিমলবাবু গুরুজনের মতো বললেন, 'যাও, মা-র খাবার ঠিক করো গে।'

এ-বেলা বিমলবাবু মা-কে উঠতে দিলেন না। কিন্তু বিকেলে আবার তিনি ওঠা-হাঁটা করতে লাগলেন, কাজকর্ম করলেন, আর সুস্থ মায়ের দিকে তাকিয়ে আবার সেই লজ্জা আর বিরোধ ফিরে এলো আমার হৃদয়ের মধ্যে। দু'দিন আমি প্রায় নিজেকে লুকিয়েই রাখলুম তাঁর কাছ থেকে। বিমলবাবু যথারীতি এলেন, অসিতও পরের দিন খবর নিতে এলো—আমার সঙ্গে দেখা হ'লো না কারুরই। আত্মগোপন করা ছাড়া আর আমার কী উপায় ছিলো?

মুশকিল হ'তো রাত্তিরে। নিঃশব্দে মা-র পাশে গিয়ে শুতুম, কিন্তু গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়েও যে কত বড়ো ব্যবধান থাকতে পারে দু'জন প্রাণীর মধ্যে আমরা মা-মেয়ে তা প্রতি পলে অনুভব করতুম। বলি-বলি ক'রে মা-ও কথা বলতে পারতেন না, আমিও পারতাম না। দুর্লঙ্ঘ্য এক দেয়াল উঠলো দু'জনের মধ্যে।

তৃতীয় দিন ভোর রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো—জেগে দেখলুম, গুনগুনিয়ে মা কাঁদছেন। মা কাঁদছেন! আমি তো তাঁকে কাঁদতে দেখিনি কোনোদিন। বুকটা ধড়াশ ক'রে উঠলো—অন্ধকারে হাত বাড়ালাম তাঁর দিকে—ডাকলাম,—'মা।' মুহূর্তে মা-র গুনগুনানি বন্ধ হ'য়ে গেলো—একটা কাতরোক্তি ক'রে তিনি পাশ ফিরলেন। উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললাম, 'কী হয়েছে?'

'একটু জল দাও।'

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম। তীব্র উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললাম, জল দিলাম—তারপর দৌড়ে গিয়ে ভৃত্যের ঘুম ভাঙিয়ে বিমলবাবুকে ডাকতে পাঠালাম। হয়তো তখনো ট্র্যাম চলতে শুরু করেনি, হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তবু সেই অন্ধকারেই আমি তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে মা-র কাছে ফিরে এসে বসলাম, একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কার ভারে বুক যেন বোঝাই হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে। সূর্য ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিমলবাবুকে নিয়ে ভৃত্য ফিরে এলো। লাল দুই চোখ মেলে মা তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

কপালের উপর হাত রেখে উনি ভুরু কুঁচকোলেন। দু'বার মাথায় হাত বুলিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'তুমি কাছে থাকো, বুলু, ডাক্তার নিয়ে আসি।'

ডাক্তার এসেছিলো। তার চাইতে বড়ো ডাক্তারও এসেছিলো দু'দিন পরে—আর তারও পাঁচদিন পরে কলকাতা শহরের সমস্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের দিকে মুখ ফিরিয়ে মা সমস্ত সুখদুঃখের অতীত হলেন। মৃতোন্মুখ দিদিমার বুক-ফাটা আর্তনাদে সমস্ত পৃথিবী ভ'রে গেলো। শুষ্ক চোখে ব'সে-ব'সে দেখলুম, বিমলবাবু নিজ হাতে সাজিয়ে দিচ্ছেন মা-কে। বহুমূল্য বেনারসিতে শোভিত করলেন তাঁর মৃতদেহ, ফুলের গহনা দিয়ে মুড়ে দিলেন আপাদমস্তক—তারপর রাশি-রাশি সিঁদুরে শোভিত করলেন তাঁর ললাট আর মাথা। তাঁর এই পাগলামি দেখে কে কী ভেবেছিলো জানি না—আমি নিজেও যে কী ভেবেছিলাম তাও জানি না—বুকের মধ্যে একটা চাপা আর দম-আটকানো গুমরানি অনুভব করলাম অত্যন্ত তীব্রভাবে—আস্তে এগিয়ে গিয়ে মা-র নরম বুকের উপর মাথা রাখলাম, ধীরে-ধীরে আমার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

তবু দিন কাটলো। একটা দণ্ড যার অস্তিত্ব না-থাকলে এই ছোটো সংসার আবর্তিত হ'য়ে উঠতো—সেই মানুষের অভাবেও এ-বাড়িতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত তাদের আলো-ছায়া ফেললো—কয়েকদিন পরে বিমলবাবুও আবার আপিশে যেতে লাগলেন—আপাদমস্তক শাদা কাপড়ে মোড়া দিদিমাও মুখের ঢাকা খুললেন—আমি আবার প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়ালাম, সকল কর্তব্যই সকলে ন'ড়ে-চ'ড়ে করতে লাগলাম, কেবল প্রাণশক্তির চাবিকাঠিটা নিয়ে মা আর ফিরে এলেন না এই সংসারে।

মা-র অসুখ থেকে শুরু ক'রে আমাদের এই অবর্ণনীয় দিনের দুঃখময় জীবনের সঙ্গে অসিতও এ-ক'দিন জড়িত ছিলো। প্রথমটায় বিমলবাবু অত্যন্ত বেশিরকম উদ্‌ভ্রান্তই হ'য়ে পড়েছিলেন। বলতে গেলে এ-বাড়ির সব ক'টি প্রাণীই আমরা এমন একটা অবস্থায় ছিলাম যে অসিত না থাকলে হয়তো কিছুতেই চলতো না। বিধাতার আশীর্বাদের মতোই সকলের সেবার ভার নিয়ে সে মুখ গুঁজে প'ড়ে ছিলো এখানে। কিন্তু বিদায় নেবার সময় হ'লো তার।

মাস দু'য়েক পরে কোনো-একদিন চুপ ক'রে শুয়ে ছিলাম ঘরে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ঘর ভ'রে গিয়েছিলো। দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে

চঞ্চল হ'য়ে উঠলাম। বুঝলাম বিমলবাবু এসেছেন। মৃদু গলায় উনি আমার নাম ধ'রে ডাকতেই আমি তাঁকে আসতে ব'লে উঠে বসলাম। আলো জেলে দিলাম ঘরের। চায়ের জোগাড়ে যাচ্ছিলাম, উনি বললেন, 'এখনো শুয়ে ছিলে ?'

'এমনি'।

'এ-বাড়ি আর ভালো লাগে না, না ?' বলতে গিয়ে তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। আমি মুখ নিচু করলাম।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'বোসো। আমি এখন চা খাবো না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

সে কী কথা তা আমি বুঝলাম। ক'দিন থেকেই উনি যেন কী বলতে চান আমাকে। বারংবার বলবার জন্য মুখ খুলেও থেমে যান। কিন্তু অসুখী বোধ করলেও প্রস্তুত হ'য়ে বললাম, 'বলুন।'

একটুও ভূমিকা করলেন না তিনি। তিনিও সেদিন প্রস্তুত ছিলেন হয়তো। ধীর গম্ভীর গলায় স্বভাবোচিত নিচু স্বরে বললেন, 'অসিতকে কী বলবো ?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

'তোমার মত না নিয়ে তো হ'তে পারে না।'

তাঁর চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললাম, 'কী হ'তে পারে না ?'

একটু পলক নড়লো না তাঁর, কেবল কেমন-একটা কঠিনতা ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে—বললেন, 'বিয়ে।'

'বিয়ে !'

'হ্যাঁ, বুলু—তোমার বিয়ের কথাই বলছি আমি। তোমার কোনো ব্যবস্থা করতে না-পারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি একটু শান্তি চাই।'

কথা শুনে আহত হ'লাম। নিজেকে সংযত রেখে যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'আপনাকে তো সবই বলেছি। সবই তো জানেন।'

'জানি।'

'তবে ?'

'সে তোমার ভুল, বুলু, সে তোমার শিশু-মনের একটা খেলা।'

'জানি না খেলা কিনা—আমাকে অবকাশ দিন ভুল ভাঙবার।'

'শোনো—' তাঁর গলার স্বরে অদ্ভুত কান্নার শব্দ পেলাম। চকিত হ'য়ে

চোখ তুলতেই তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন, 'তুমি তো জানো তোমার মা ছাড়া এ-পৃথিবীতে আমার কাছে এমন-কোনো মেয়ে ছিলো না, যার প্রতি ক্ষণিকের জন্যও আমার মন বিভ্রান্ত হ'তে পারে। ও যে আমার কী ছিলো—ও যে আমাকে কতখানি ভ'রে দিয়েছিলো শুধু ওর অস্তিত্ব দিয়ে, তা আমি তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাবো। তোমাকে এইটুকু থেকে ভালোবেসে বড়ো করেছি, আমার স্নেহে এতটুকু খাদ ছিলো না—তোমার প্রতি আমার অপরিসীম আকর্ষণ—অপরিসীম মমতা—সুমন্ত্র বেঁচে থাকলে আমার চাইতে বেশি ভালোবাসতে পারতো কিনা জানি না—সেই তুমি—'

আমি দু' হাতে মুখ ঢেকে বললাম, 'জানি, জানি—'

'শান্ত হও, শোনো—তোমার মৃত মায়ের আত্মার কথা চিন্তা করো—'

কান্নাভরা গলায় বললাম, 'তিনি তো আপনাকে লিখে গেছেন, আমার সুখই তাঁর সুখ,—তাঁর কোনো আলাদা সুখ নেই।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি, ব্যথিত গলায় বললেন, 'এই তোমার শেষ কথা?' 'এই শেষ বিমলবাবু, এই শেষ।' আমি নিচু হ'য়ে তাঁর পায়ে মাথা রাখলাম। একটু ব'সে রইলেন চুপ ক'রে—একটু হাত বুলোলেন মাথায়—তারপর নিঃশব্দে উঠে গেলেন সেখান থেকে। আমি সেই পরিত্যক্ত জায়গায় মাথা কুটে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদতে লাগলাম।

অসিত এলো ঘণ্টাখানেক পরে। ভৃত্য এসে খবর দিতেই সংযত হ'য়ে উঠে বসলাম। আমার মুখ-চোখ দেখে ও যেন আঘাত পেলো। একটু তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। চোখের এ-দৃষ্টি আমার অপরিচিত নয়। বুকটা কেঁপে উঠলো। বললাম, 'বসুন।'

'আপনি আজ বড্ড বিচলিত রয়েছেন।'

'না।'

'কিন্তু কী করবেন—'

চুপ ক'রে রইলাম। একটু দ্বিধা ক'রে বললো, 'আমার তো চ'লে যাবার সময় হ'লো—ছুটির দুটো মাস কাটিয়ে দিলাম—'

'আপনি যাবেন?'

'হ্যাঁ, মা বার-বার চিঠি লিখছেন—'

'ও।'

'আমার তো যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু—'

'না, যাবেন না কেন—মা আশা ক'রে আছেন।'

অসিত আমার কাছে থেকে যাবার উৎসাহ প্রার্থনা করেনি—কী প্রার্থনা করেছিলো তা আমি জানি। ব্যথিত হ'লাম, কিন্তু উপায় নেই।

একটু চুপচাপ কাটলো। তারপর মৃদু স্বরে বললো, 'আমাকে কি আপনার কোনোই প্রয়োজন নেই?'

নিশ্বাস নিয়ে বললাম, 'আপনার জন্য আমার কত কৃতজ্ঞতা জমা হ'য়ে আছে মনের মধ্যে—'

বাধা দিয়ে অস্থির গলায় বললো, 'কৃতজ্ঞতার কথা কেন তুলছেন—আমি তার কথা বলছি না—আপনি কি বোঝেননি আমার কথা?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম, তারপর পরিষ্কার গলায় বললাম, 'বুঝেছি, কিন্তু সে হ'তে পারে না, অসিতবাবু—কিছুতেই না।'

'কিছুতেই না?'

'না।'

খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো ব'সে রইলো অসিত—তারপর ঠিক বিমলবাবুর মতো ক'রেই ধীরে-ধীরে উঠে গেলো ঘর ছেড়ে। আবার আমার দু'চোখ ছাপিয়ে জল এলো—বুক ভেসে গেলো উদ্বেলিত অশ্রুর প্লাবনে।

পরের দিন সকালবেলা কিছু আগে পরে দু'খানা চিঠি পেলাম ভৃত্যের মারফৎ—

'বুলু,

তোমার সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখে গেলাম—আশা করি কোনো আর্থিক কষ্ট তোমাকে পেতে হবে না।

যেখানেই থাকি আমার অন্তরের সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সততই তোমাকে ঘিরে থাকবে।

হতভাগ্য বিমলেন্দু।'

'সুচরিতাসু,

প্যাণ্ডোরার অদম্য কৌতূহলের দোষেই সমস্ত পৃথিবীতে দুঃখ ছড়িয়ে পড়েছিলো—কিন্তু আশার কৌটোটি সে খুলতে পারেনি—তাই সে-আশা যতই

দুরাশা হোক, মানুষ তাকে চিরকাল ধ'রে লালন করে আপন বুকের মধ্যে—আমিও সেই আশাটি মনের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখলাম—যদি কখনো সময় আসে আপনি নিশ্চয়ই ডাক দেবেন আমাকে।

হতভাগ্য অসিত।'

দু'খানা চিঠি হাতে নিয়ে শুদ্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম খানিকক্ষণ। মনের মধ্যে ভ্রমরের একঘেয়ে গুনগুনানির মতো একটি কথাই কেবল গুঞ্জিত হ'তে লাগলো : গেলো—সব গেলো।

অন্তহীন

হৃদয়টা মানুষের এক অজ্ঞাত রহস্য। যত বড়ো পণ্ডিতই তুমি হও না কেন, এখানে এসে তার চেয়েও বড়ো কোনো শক্তির কাছে তোমাকে নিচু হ'তেই হবে। এই সুদীর্ঘ আটতিরিশ বছর বয়সেও সুশান্তর মন আবার পূর্ণিমার চাঁদের মতো ভরপুর হ'য়ে উঠলো। অনেক আকাঙ্ক্ষা আর অনেক দুঃখের অলিগলি পেরিয়ে এই এতদিনে একটু নিশ্বাস নিয়ে বসেছিলো মাত্র, এর মধ্যেই হুড়মুড় ক'রে এলো আবার ঝড়। প্রথম ঝাপটাটা সে তার এতদিনকার অর্জিত স্থৈর্য দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলো বটে, কিন্তু যেখানে এত সুখ, আনন্দ, ভবিষ্যৎ দুঃখের এত বড়ো তীব্রতার আভাস, সেখানে কি মানুষ স্থির থাকতে পারে? নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সে নিশ্চিন্ত হ'লো। মনে-মনে ভাবলো, 'যা হয় হোক, আর পারি না।'

জীবনের আরম্ভটা মন্দ ছিলো না। বিধবা পিসির অপর্যাপ্ত শাসন আর পিতার প্রচুর আদর দুটো মিলে তার জীবনে একটা ভারসাম্য স্থাপন করেছিলো। মা বেচারা স্বামী আর ননদের ছায়া হ'য়েই দিন কাটাচ্ছিলেন, কাজেই পুত্রের প্রতি তাঁর কোনো ভাবই প্রকট ছিলো না। অল্প বয়সের প্রথম সন্তান—বরং কেমন একটা লজ্জা-লজ্জা ভাবই ছিলো যেন। চৌদ্দ বছরের ছোটো-বড়ো—অনায়াসেই তারা ভাইবোন হ'তে পারতো। কিছুকাল পর্যন্ত এ-সংসারের সে-ই একমাত্র শিশু ছিলো—একাদিক্রমে পাঁচ বছর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবার পরে এলো একটি ফুটফুটে ছোটো বোন। সুশান্তর হৃদয় যেন ভ'রে গেলো—তার পরিপুষ্ট লাবণ্য-ভরা ছোটো বুকের মধ্যে তার চেয়েও অনেক ছোটো একটি প্রণীর পাখির মতো উষ্ণ আর নরম স্পর্শ তাকে শিহরিত করলো। তার মুখচুম্বন ক'রে এইটুকু-টুকু শাদা মোমের মতো মসৃণ হাতে-পায়ে গাল ঘ'ষে-ঘ'ষে জীবনের চরম আনন্দের আস্বাদ পেলো সে। এত ভালো লাগা যে পৃথিবীতে আছে তা কে জানতো? তার পরের বছর আরো একটি—দু'বছর পরে আরো একটি—এমনি ক'রে-ক'রে পনেরো বছরে পাঁচটি ভাইবোনের দাদা হ'লো সে। ততদিনে সে কুড়ি বছরের যুবক।

তার কালো-কালো টানা চোখে সারা পৃথিবীর স্বপ্ন। মফস্বলের গণ্ডি ছেড়ে সে কলকাতা এসেছে, ছেলেবেলাকার শাসনকণ্টকিত ছাটা চুল এখন কুঞ্চিত হ'য়ে এসে নেমেছে কপালে—মোটা জিন কোটের পরিবর্তে বাঁকা-গলা পাৎলা পাঞ্জাবির তলা দিয়ে তার সুন্দর লাবণ্য-ভরা বুকের আভাস পাওয়া যায়। কলেজের সহপাঠিনীদের দিকে তাকাবার অদম্য ইচ্ছাকে পর্যন্ত সে অনেকটা প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে।

কলকাতায় পড়তে আসার এইটেই ছিলো পিসিমার সব চাইতে বড়ো আতঙ্ক। এত কষ্টে ভাইপোকে তিনি ঐ ফ্রক-পরা পাকা মেয়েগুলোর সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখন না ঐ শাড়ি-পরা ছুঁড়িগুলো বিগড়ে দেয়। নরেনবাবু বললেন, 'তোমার যত—শান্ত আমার তেমন ছেলে নাকি?' আসলে শান্ত কিন্তু তেমনি ছেলে। মেয়েদের প্রতি ওর একটা সহজাত আকর্ষণ। পড়তে-পড়তে ও অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়—বড়ো-বড়ো ঘন চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে কী যে মনে পড়ে, কাকে সে আকাঙ্ক্ষা করে বুঝে উঠতে পারে না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে চুপ ক'রে—ঝিরিঝিরি হাওয়া দিক কি অসম্ভব গুমোট হোক—সবটাই ওর কেমন অস্বাভাবিক ঠেকে। মনে হয় এমন তো আর হয়নি, আর তো এমন হবে না। হঠাৎ যেন মন কেমন করতে থাকে—মাথা নিচু ক'রে অচেতনভাবেই বইয়ের পাতার উপর পেন্সিল দিয়ে সুন্দর-সুন্দর মুখ আঁকে, তারপর সেই মুখের উপর নিজের মুখ রেখে চোখ বোজে। সেই ছোটোবেলায় পাঁচ বছর বয়সের সময় বোনকে কোলে নেবার রোমাঞ্চের পুনরাবৃত্তি হয় তার বুকের মধ্যে।

কিন্তু সত্যি বলতে জীবন্ত শরীরের প্রতি তেমন আকর্ষণ ওর নেই, বরং বেশ খানিকটা উদাসীনতা আছে। নিজের মধ্যেই ও সম্পূর্ণ। কেমন একটা উন্মনা আর ঝিমুনো-ঝিমুনো ভাব—অতিরিক্ত নম্র আর পাঁচজন থেকে আপনাকে আলাদা রাখার সহজ ক্ষমতা। এজন্যেই কিনা জানি না, না কি ওর সেই আশ্চর্য লাবণ্য-ভরা বুকের আভাস আর দুই চোখের বিভোরতাই অন্যদের ক্রমাগত ওর প্রতি আকৃষ্ট করে। চোখের তারার অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যও হয়তো এজন্য দায়ী। পুরুষের পায়ের পাতা আলোচনার যোগ্য নয়, কিন্তু ওর পঞ্চাশ ইঞ্চি লোটানো কোঁচার তলা দিয়ে স্যাণ্ডল-পরা দুটি পায়ের যে-কোনো অংশই মেয়েদের চোখে পড়ুক না কেন, স্বতই সে-চোখ সেখানে

আবদ্ধ হ'য়ে থাকতো। কী জানি কেন, সে-পায়ে একটু হাত ছোঁওয়াবার দুর্লোভও হ'তো তাদের। বি. এ. পড়বার সময় একটি মেয়ের সঙ্গে তার সামান্য প্রণয়-সম্ভাবনা হয়েছিলো, এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আর-একবার হ'লো। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র সে, প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড হ'তে-হ'তে এখানে এসেছে, শোনা গেলো ললিতকলাতেও তার অসামান্য দখল। মেয়েদের মধ্যে ফিশফিশানি উঠলো এবং ছবি আঁকার সূত্র ধ'রেই একটি মেয়ে অত্যন্ত কাছে এসেছিলো তার। আর এই কাছে আসাই শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় দাঁড়ালো যে সেটা সুশান্তর পক্ষে সত্যি বিস্ময়ের হয়েছিলো। স্ত্রী-পুরুষে মেলামেশার এই চরম পরিণতি সম্বন্ধে সে সচেতন ছিলো না, তার পক্ষে প্রার্থনার ছিলো শুধু সঙ্গ-মাধুর্য, দৈহিক সংস্পর্শ নয়। কিন্তু কোনো-একদিন মেয়েটি মুখ ভার ক'রে ছলোছলো চোখে বললো, 'এ-রকম ক'রে আর ক'দিন চলবে? কেবল দূরে থাকা, কেবল—'

আশ্চর্য হ'য়ে সুশান্ত জবাব দিলো, 'দূরে থাকা মানে?'

'এ অসম্ভব।'

বুঝলো সুশান্ত। বললো, 'তুমি কী চাও।'

'কী চাই, সে কি মুখ ফুটে বলতে হবে? সে চাওয়া কি তোমারও না?'

'আমি তো আর কিছু চাইনে। প্রতিদিন তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ভালো লাগছে তোমাকে—তোমার সঙ্গে আমার একান্তই—'

'চুপ করো! চুপ করো!' তীব্রতায় মেয়েটির গলা রুক্ষ শোনালো। চুপ ক'রে রইলো সুশান্ত। দুর্নিবার অভিমানে মেয়েটির নিশ্বাস দ্রুত হ'লো—রাগ আর হতাশা মিলিয়ে জল দেখা দিলো তার চোখে। সুশান্ত মৃদুকণ্ঠে বললো, 'রাগ করলে?'

অস্ফুট গলায় জবাব এলো, 'অপদার্থ!'

'আমি তো বুঝতে পারিনে যে—'

মেয়েটি অক্ষম রাগে হাত তুলে বাধা দিলো তাকে। তার ইচ্ছা করলো ঠাশ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দেয় গালে। আশ্চর্য—! এমন নিরুত্তাপ পুরুষ-মানুষ দিয়ে সে করবে কী? কতদিনের কত সুযোগ ও নষ্ট করেছে, কতদিনের কত প্রার্থনা ও ব্যর্থ করেছে—ও কি মানুষ? হঠাৎ মেয়েটি স্পষ্ট ভাষায় বললো, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি কি আমাকে নিয়ে খেলা পেয়েছো?'

এতটুকু হ'য়ে গেলো সুশান্তর মুখ। বিয়ে? বিয়ে করবে কেন? আর খেলাই বা কী করলো! বন্ধুতা কি অন্যায়?

বলাই বাহুল্য, তারপর ছাড়াছাড়ি হ'তে ওদের আর [illegible]। কয়েকদিন সত্যিই খুব খারাপ লেগেছিলো সুশান্তর। রাত্রিতে কতদিন ঘুম ভেঙে ওর মনে পড়েছে মেয়েটিকে, তারপর একদিন মুছে গেছে মন থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে।

আসলে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বন্ধুতাটাও ওর বন্ধুতার পর্যায়েই আবদ্ধ থাকতো। অন্যের চোখে এটা স্বাভাবিক ছিলো না, কিন্তু দৈহিক সংস্পর্শের আকাঙ্ক্ষা ওর শূন্য ছিলো—কেন কে জানে। এ-রকম একটা অস্তিত্বহীন প্রণয় নাকি সম্ভব? ক্রমে-ক্রমে মেয়েরা ওকে দুর্নাম দিতে লাগলো। এটা যে তার একটা খেলা, একাধিক মেয়ে ভোগ করবার অপূর্ব কৌশল এবং এর নামই যে দুশ্চরিত্রতা এ-বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রইলো না। এমনিতেই নানা দিক থেকে সে একটা আলোচনার পাত্র ছিলো—কুড়ি বছরের ছেলের পক্ষে অত পরিণত চেহারা বা বুদ্ধি, সংসারের পক্ষে অমন উদাস বা অদ্ভুত, পণ্ডিতের মতো হাবভাব—সমবয়সীদের মধ্যে কিছুটা ভক্তি, কিছুটা ঈর্ষা, কিছুটা হাসিহাসি—সব মিলিয়ে সে যেন একটা বিচিত্র বিস্ময়। প্রোফেসররাও তাকে যেন খানিকটা সমীহ করতেন। কিন্তু এই মেয়ে-ঠকানো ব্যাপারটায় সবাই একটু আরাম পেলো। তাকে খানিকটা নামাতে পেরে শান্তি পেলো মনে। একটা মানুষ কেবলই জিতবে, কেবলই অন্য-জগতের একটি উঁচু আসনের আদর্শ হ'য়ে থাকবে, এটা যেন ঠিক সহনীয় ছিলো না। কাজেই একটা শান্তির হাওয়া বইলো তাদের মনে। কাকের মুখে কথা ভাসে। শোনা গেলো রাত একটার আগে সে হস্টেলে ফেরে না, শোনা গেলো কোনো কোনোদিন নেশা ক'রেও ফিরে আসে। কথাটা অবিশ্যি একদিক থেকে মিথ্যা নয়। ভালো লাগলে সারারাত গঙ্গার ঘাটেই সে ব'সে থাকে। চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে জলের দিকে—নৌকোর ফাঁকে-ফাঁকে আলো-ছায়ার লীলা বেঁধে রাখে ওর মনকে। হাওয়া বইলে যখন সবাই জানলা বন্ধ করে—সে তখন অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়; ডেকে তার সাড়া পাওয়া যায় না, চোখের তারার পাশে-পাশে শিরাগুলো সব লালচে হ'য়ে ওঠে। কোনোদিন হয়তো কলেজে

না-গিয়ে সারাদিন ছবিই আঁকে ব'সে-ব'সে। আসলে মনের গড়নটাই তার আলাদা। লোকের আকর্ষণ উদ্রেক করে, কিন্তু নিজে সে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। তার অত্যন্ত লাল আর সুদৃশ্য হাতের তেলোর দিকে তাকিয়ে কত মেয়ের বুক থরথর করে, আর সমবয়সী ছেলেরা ভালোবাসায় পড়ে। নিঃশব্দে হেঁটে-হেঁটে যখন সে করিডর পার হয়—পাশে-পাশে ছেলেমেয়েরা কেমন একটা সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

দুর্নাম হ'লো তার। আর সেই দুর্নাম ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়াল ভেদ ক'রে মাস্টারদের কানেও গেলো—মাস্টারদের কুঞ্চিত কপালের রেখা থেকে পরিচিত মহলেও তা ছড়িয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে সে বাড়ি গেলো। পিসিমার অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা কিছুই বুঝলো না, বাবার গম্ভীর মুখও তাকে বিস্মিত করলো। নিভৃতে খবরটা দিলেন মা।

'তুই নাকি উচ্ছন্নে গেছিস ?'

'আমি! উচ্ছন্ন কী, মা ?'

'কী জানি বাপু, ভাইবোনে তো ক'দিন থেকে রাতদিন এ-ই জপছেন। তোর বিয়ে ঠিক করেছেন ওঁরা।'

'ও।' সুশান্ত বুঝলো এবার কথার তাৎপর্য—'তা বিয়েটা বুঝি এই রোগের ওষুধ ?'

'বোধহয়—' বিয়েতে যে মা-র সম্মতি নেই তা তাঁর কথার স্বর থেকেই বোঝা গেলো। সুশান্ত জিজ্ঞাসা করলো, 'তা তুমি কী ভাবো আমাকে ?'

'আমি!' সস্নেহে হেসে মা মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমাকে তো ওরা ভাবতে শেখায়নি, শান্ত, আমি কেবল তোকে ভালোবাসতেই পারি।' এমন আবেগভরে মা কথাটা বললেন যে সুশান্তর অন্তর আপ্লুত হ'য়ে গেলো —নিঃশব্দে মা-র হাত দুটো জড়িয়ে ধরলো কেবল। গলার স্বর নিচু ক'রে মা বললেন, 'আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তো কোনো মূল্য নেই, কিন্তু সত্যি বলতে এক্ষুনি তোকে বিয়ে দিয়ে হাত-পা বাঁধতে আমার ইচ্ছে করে না।'

সুশান্ত চুপ ক'রে রইলো। বলাই বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত মা বা ছেলে কারো ইচ্ছাই তাঁরা গ্রাহ্য করলেন না। নরেনবাবু যদি বা কিছুটা ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু দিদির কথার উপর কিছুই বলতে পারলেন না। সুশান্ত ছেড়ে দিলো নিজেকে, তারপর পিসিমারই এক দূর সম্পর্কের ভাসুরঝির সঙ্গে এক মাসের

মধ্যেই বিয়ে হ'য়ে গেলো তার। বিয়ের দিন মনটা অত্যন্ত ভারি রইলো সুশান্তর, তাছাড়া হাঙ্গামাতেও কাটলো। তার পরের দিন কালরাত্রি—একেবারে ফুলশয্যার দিন সে নিভৃত হ'লো স্ত্রীর সঙ্গে। সমস্ত ঘরময় ফুলের নিবিড় গন্ধ, বিছানাটি বেলফুলে সাজানো, খাট বেয়ে-বেয়ে নেমেছে ফুলের ঝালর। লাল টুকটুকে জরির পাড়-বসানো শাড়ি-পরা ফুলের গহনা-মোড়া বৌটির দিকে এবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো সে। শাদা-শাদা পুষ্ট হাত, শাদা পাথরের মতো মুখের উপর একজোড়া ভাবলেশহীন বড়ো চোখ, শাদা গলা, ঝিরিঝিরি পাতাকাটা চুলের তলায় ছোটো শাদা কপাল—দেখতে দেখতে সুশান্তর হঠাৎ মনে হ'লো মানুষটা যেন বেঁচে নেই, যেন কফিন থেকে নিষ্প্রাণ একটি দেহ উঠে এসে বসেছে তার কাছে, ভয়ে বিস্ময়ে বুকের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠলো। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলো জানালার বাইরে—উঠে এলো তার পাশ থেকে, মৃদু শব্দে একবার কাশলো—একবার নিশ্বাস ফেললো, তারপর সারা রাত ধ'রে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে কোনো-এক সময়ে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজেই চোখ বুজলো। বৌটি কী ভেবেছিলো কে জানে—একটুখানি ব'সে থেকে ঐ ফুলের মধ্যেই নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে।

বিয়ে উপলক্ষ্যে এমনিতেই পড়াশুনোর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিলো। পিসিমা বললেন, 'এক্ষুনি ওকে পাঠিয়ে দে, নরেন। তা নইলে বৌয়ের আঁচল ধরলে আর যেতে চাইবে না।'

পাঁচদিনের দিন চ'লে এলো সে আবার কলকাতা। আর বৌ গেলো তার পিত্রালয়ে। বাবা আর পিসিমা নিশ্চিন্ত হ'লেন, আর মা র মনে হ'লো, 'এ ভালো হ'লো না।'

খবরটা রটতে দেরি হয়নি। তার বিবাহের খবরে বিশ্ববিদ্যালয় সচকিত হ'লো। মেয়েদের মনে নামলো মেঘের ভার। যে-মেয়েটির সঙ্গে সম্প্রতি একটু বেশি মেলামেশা চলছিলো, সে একদিন নিরালা পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো। কিন্তু সুশান্ত নিজে কিছুই পরিবর্তন অনুভব করলো না। জীবনে যে একটি নতুন মেয়ে অতি ঘনিষ্ঠ অত্যন্ত আপন হ'য়ে তার কাছে এসেছে, একবারও মনে পড়লো না সে-কথা। আপন পরিচিত জীবনের সীমাতেই সে রইলো আবদ্ধ হ'য়ে। তেমনি সে বিভোর হ'য়ে ছবি আঁকে—কখনো সারারাত গঙ্গার ঘাটের নরম ঘাসের উপর ব'সে তাকিয়ে থাকে জলের

দিকে—কৃষ্ণচূড়ার সমারোহে এখনো বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিশ্ব সংসার ভুলে যায়। কখনো বইয়ের অতলে ডুবে থেকেই নিঃশব্দ দিন কেটে যায় অলক্ষিতে।

পরীক্ষা এসে গেছে। ছাত্র-ছাত্রী প্রোফেসর সকলেই ঈষৎ চঞ্চল, সুশান্তও মনকে একাগ্র করেছে বইয়ের পাতায়। সে যে ফার্স্ট হবে এ-কথা সবাই জানে। সবচেয়ে ভালো জানে সে নিজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো তরফে বলাবলি চলেছে তাকে নিয়ে—পরীক্ষার পরে স্কলারশিপ দিয়ে বিলেত পাঠানো হবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ঝকঝক করতে লাগলো সুশান্তর চোখে। কিন্তু ঔজ্জ্বল্য এজন্য নয় যে ভবিষ্যতে সে একজন খ্যাতনামা লোক হবে, ভাবীকাল তাকে চিরকাল মনে রাখবে—তা নয়, সমুদ্রের অকূল জল তাকে টানে। চিত্রতীর্থ ইটালির মাটিতে একদিন সে পা রাখবে—এ-কথা ভাবলেও বুকের মধ্যে শিরশির করে তার। দুই চোখ ভ'রে দেখে নেবে সভ্যতার সব কেন্দ্রস্থল —যাবে প্যারিসে, যাবে বার্লিনে—তারপর? তারপর ভাবনা তার বেশিদূর এগোয় না; বিহ্বল হ'য়ে একটা ভরা মন নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে কেবল।

পরীক্ষার দশদিন আগে সে চিঠি পেলো, তার বাবা মৃত্যুশয্যায়। পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে তাকে জানানো হয়নি আগে। ভালো ক'রে একটা চিকিৎসা পর্যন্ত করানো গেলো না। তাকে দেখে মা কেঁদে ফেললেন। গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে তার হাতের উপর হাত রেখে ব'সে রইলেন স্থবির হ'য়ে। কথা বেরলো না মুখ দিয়ে। বাবা দুর্বল হাতে সুশান্তকে টেনে নিলেন কাছে—কত আকাঙ্ক্ষার এই তাঁর প্রথম সন্তান। ভিতরে ভিতরে কত স্নেহ সঞ্চিত ছিলো তাঁর ওর জন্যে, ভবিষ্যতের কত আশা-জড়ানো এই ছেলে! স্তিমিত গলায় বললেন, 'শান্ত, ওগুলো ফিরিয়ে দে তোর মাকে। আমার ডাক এসেছে, কেন মিছিমিছি সর্বস্ব খোয়াবি।'

'বাবা, তুমি চুপ করো।'

'চুপ করবার সময় তো হ'লো, বাবা।'

'বাবা?'

'বাবা।'

'আমি তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাবো—'

'অবুঝ হোসনে।'

'আমি আজই সব বন্দোবস্ত ক'রে আসবো। নিউমোনিয়া আজকাল তো একটা ছেলেখেলা—'

'তুই কি বোকা হ'য়ে গেলি? আমার সহায়-সম্বল কী, তুই জানিসনে? তুই চ'লে যা, পরীক্ষা দে।'

'সে হবে, তুমি কিছু ভেবো না—'

'ভাববো না?—কোটরগত দুই চোখ জলে ভ'রে গেলো নরেনবাবুর। 'কত ভার দিয়ে গেলাম—'

মা ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'তুই ওঁর কথা শুনিসনে খোকা—আমার সর্বস্ব-র বিনিময়ে ওঁকে তুই ফিরিয়ে আন—কী হবে, কী হবে আমার এ-সব দিয়ে!' আবর্জনার মতো সব গহনাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি, আর সুশান্ত দুই হাত মুঠো ক'রে নিজের ব্যাকুলতাকে সংযত করবার চেষ্টা করলো।

একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা ক'রে সুশান্ত নরেনবাবুকে কলকাতা নিয়ে এলো—ভাইবোনেরা সজল চোখে দাঁড়িয়ে রইলো দরজা ধ'রে—পিসিমা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। মা এলেন সঙ্গে। কিছুতেই কিছু হ'লো না। প্রায় তিন সপ্তাহ ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে মারা গেলেন নরেনবাবু। শুষ্ক চোখে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো সুশান্ত—মৃতদেহের বুকের উপর অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে রইলেন মা।

কোথায় রইলো প্যারিসের স্বপ্ন, কোথায় গেলো চিত্রতীর্থ ইটালির মায়া—আর কোথায় বা তার পরীক্ষা। একটা ফুৎকারে যেন ঈশ্বর সমস্ত আলো নিবিয়ে দিলেন তার চোখ থেকে। সদ্যবিধবা মায়ের দুটি রিক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে তার বুক একেবারে হু-হু ক'রে উঠলো। গঙ্গাতীরে বাবাকে শেষ ক'রে মাকে নিয়ে সে যখন ফিরে এলো—ছোটো-ছোটো ভাইবোনেরা কান্না-ভরা চোখে ঘিরে দাঁড়ালো তাকে, শীর্ণ বুকে করাঘাত হেনে আপন মৃত্যু-কামনায় উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন পিসিমা। সুশান্ত আর সময় পেলো না শোক করবার। তার পরিণত চেহারা দায়িত্বের গুরুভারে আরো গম্ভীর হ'লো।

অসুখের সময় খবর দেওয়া হয়েছিল বৌকে। শরীর খারাপের অজুহাতে সে এতদিন আসেনি, এবার তার বাবাই এলো তাকে সঙ্গে নিয়ে। বিয়ের

আটমাস পরে এই আবার স্ত্রীর সঙ্গে সুশান্তর প্রথম মিলন। কিন্তু অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত আর বিমর্ষ অবস্থায় দিন কাটছিলো তার, আড়ালে আবডালে দেখা করবার মতো ইচ্ছা বা অবকাশ কিছুই তার ছিলো না। দুশ্চিন্তার ভারে প্রপীড়িত মন, কী হবে, কী ক'রে চলবে—মাথাটা এক-একবার যেন কেমন ক'রে ওঠে। কোথায় গেলো তার আকাশচুম্বী স্বপ্নের জাল বোনা, কে এমন ক'রে ছিঁড়ে এনে ফেললো তাকে এই সংসারের আবর্তে, কিছু ভেবে যেন দিশে করতে পারে না। ভিতরে-ভিতরে অতল জলে হাবুডুবু খায়, বাইরের চেহারা প্রশান্তিতে স্থির। সজল চোখে মা তাকিয়ে থাকেন অসহায়ের মতো—পিসিমা বিলাপ করেন—আর ভাইবোনেরা এর মধ্যেই তার উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে।

শ্বশুর বললেন, 'কী করবে ভেবেছো? পরীক্ষাটা তো আর দেওয়া সম্ভব দেখছি না।'

'না।'

'তবে?'

সুশান্ত মাথা নিচু ক'রে রইলো। মুখ গম্ভীর ক'রে শ্বশুর বললেন, 'নরেন-বাবুর বোঝা উচিত ছিল যে এতগুলো ভার তোমার উপরে ফেলা ঠিক না।'

বিস্মিত চোখে শ্বশুরের দিকে তাকালো সুশান্ত। মৃত্যু কি কোনো আইন মানে?

'এত ফাইফুটুনি না-করলেও চলতো। তার উপরে নির্ভর ক'রেই আমি মেয়ে দিয়েছিলাম,—এখন তো দেখছি ঢাকের বাদ্যির মতো সবই ফাঁকি। এত বড়ো পরিবার ফেলে গেলেন, অথচ খাবার সংস্থান রেখে গেলেন না।'

আহত হ'য়ে সুশান্ত বললো, 'অত্যন্ত অসময়ে গেলেন তিনি, নইলে—'

'মৃত্যুর আবার সময় অসময় কী হে।' ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় ব'লে উঠলেন শ্বশুর, 'সে যখন খুশিই আসে—সেইজন্যেই তো ব্যবস্থা করতে হয় আগে থেকে।'

নিজেকে সংযত রেখে সুশান্ত বললো, 'তা যখন নেই তখন কী করতে বলেন আপনি?'

'সে সব ব্যবস্থা করতেই আমার আসা। মেয়ে দিয়েছি যখন দায়িত্ব অবশ্যই আমার। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে এদের সবাইকে তুমি দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে

দাও—সীতা আমার ওখানেই থাকবে যতদিন সুবিধা না হয়। তুমি নিশ্চয় জানো, আর যাই থাক অর্থাভাব আমার নেই, ইচ্ছা করলে আমার কাপড়ের দোকানেও তুমি বসতে পারো, লগ্নি কারবারের ভারও আমি তোমার হাতে দিতে পারি—আর চাও তো চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ঘুষটুষ দিয়ে একটা চাকরিতেও—'

বাধা দিয়ে সুশান্ত গম্ভীর গলায় বললো, 'কী করবো তা আমি নিজেই স্থির করেছি।'

জামাইয়ের ঔদ্ধত্যে স্তম্ভিত হ'লেন ভদ্রলোক। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। ততোধিক গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'তাহ'লে তা-ই করো। আমার এই প্রথম মেয়ে—তোমার অন্নাভাব তাকে আমি ভোগ করতে দেবো না।'

'বেশ তো, নিয়ে যাবেন তাকে।'

'বেশ।'

দস্তুরমতো একটা বিরোধের আবহাওয়া নেমে এলো শ্বশুর জামাইয়ের মধ্যে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে বৌ ঘরে এলো—এ দু'দিন সে শাশুড়ির ঘরে শুয়েছিলো—আজ তিনি এ-ঘরেই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। হারিকেনের মৃদু আলোতে তার আবছা মূর্তির দিকে তাকিয়ে সুশান্ত বললো, 'এসো।' দরজা বন্ধ ক'রে সীতা কাছে এসে বসলো। এই ক'মাসে সে অনেক বড়ো হয়েছে মনে হ'লো সুশান্তর। ষোলো বছরের মেয়েকে যেন বাইশ বছরের যুবতী মনে হয়। একটু চুপ ক'রে থেকে সুশান্ত বললো, 'ভালো ছিলে?'

'ছিলুম।'

আবার চুপচাপ। কেউ যেন কোনো কথা খুঁজে পেলো না। অথচ এমনও মনে হ'লো না যে পরস্পর যেন পরস্পরের অস্তিত্বেই বিহ্বল হ'য়ে আছে। তারা যেন কতকালের মানুষ—কতকাল এক সঙ্গে বসবাস করতে-করতে পুরোনো হ'য়ে গেছে—অবসন্ন হয়েছে। একটা নিশ্বাস পড়লো সুশান্তর। বললো, 'এই তো অবস্থা দেখছো, পরীক্ষাটাও দিতে পারলুম না। দুঃখ সইতে হবে তোমাকে।'

'শ্বশুরমশাই কি টাকা-পয়সা কিছুই রেখে যাননি? এতগুলো লোক কি তোমার ঘাড়েই?'

ষোলো বছরের তরুণী আর বাইশ বছরে যুবকের এই প্রথম দাম্পত্য আলাপ। স্ত্রীর কথায় একটু অবাক হ'লো সুশান্ত। এ-ধরনের কথা সে আশা করেনি। বিছানা থেকে আদ্ধেক উঠে ব'সে বললো, 'আমিই তো ওদের সব, কার ঘাড়ে যাবে?'

'আমার মা তবে ঠিকই বলেছিলেন।'

'কী বলেছিলেন?'

খুব সহজ গলায় সীতা বললো, 'বুড়ো তো শুধু ম'রেই গেলো না, মেরেও গেলো। সেইজন্যেই তো বাবা এলেন।'

বিস্বাদে ভ'রে গেলো সুশান্তর মন। কথা বলতে ইচ্ছে করলো না—আবার শুয়ে পড়তেই সীতা বললো, 'তুমি আমাকে এত মাসের মধ্যে একটাও চিঠি লেখোনি কেন? সবাই তোমাকে নিন্দে করেছে।'

'কী বলেছে?'

'কী আবার বলবে, বলেছে যে কলকতায় থাকে—কত সব মনভোলান মেয়ে আছে, তাই আর বৌকে মনে পড়ে না।'

'কে বলেছে?'

'সবাই! কেনই বা বলবে না, আমার বয়সী বন্ধুদের বরেরা হপ্তায় দুটো চিঠি লেখে—এমনকি কেউ-কেউ রোজও লেখে।'

'তাই নাকি! তা তোমার বন্ধুরাও বোধহয় রোজ লেখেন।'

'আমিও তো লিখতুম।'

'রোজ লিখতে?'

'রোজ লিখবো কেমন ক'রে, তুমি কি জবাব দিয়েছো?'

'কিন্তু ও-চিঠিও কি তুমি লিখেছো?'

সীতার মুখে একটা ছায়া ভেসে উঠলো। একটু কুণ্ঠিত গলায় বললো, 'বা রে! আমি না-লিখলে কে লিখবে?'

'হ্যাঁ, ঐ মোটা-মোটা অক্ষরগুলো নিশ্চয়ই তোমার, কিন্তু চিঠির কথাগুলো বোধহয় তোমার মা-র রচনা।'

'যাঃ!'

'সত্যি বলো।'

সীতা চুপ।

'ঠিক বলেছি কিনা—'

সীতা তবু চুপ ক'রে রইলো। সুশান্ত চোখে হাত চাপা দিয়েই কথা বলছিলো—সরিয়ে নিয়ে বললো, 'ও-সব প্রাণের দেবতা-টেবতা আর লিখোনা, বুঝলে? একটা মানুষ আবার প্রাণের দেবতা হয় কেমন ক'রে?'

এতক্ষণকার চুপ-করা সীতা এবার লাফ দিয়ে উঠে বসলো—বললো, 'হয় গো, হয়। স্বামী মেয়েমানুষের দেবতা ছাড়া আর কী?'

নির্লিপ্ত গলায় সুশান্ত বললো, 'মেয়েমানুষের বলে না, মেয়েদের বলতে হয়। যাকগে, এবার ঘুমোও তুমি।' বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে এসে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। ধীরে-ধীরে রাত গভীর হ'য়ে এলো।

পরের দিন সকালবেলা উঠেই দেখা গেলো শ্বশুর যাবার জন্য প্রস্তুত। কন্যাকে রেখে যাবার ইচ্ছা নেই, কিন্তু অশৌচ। এটা না-কাটা পর্যন্ত থাকতেই হবে তাকে। অন্তত পিসিমা সেই অনুরোধই জানালেন। সুশান্ত পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো। শোনা গেলো, সুশান্ত স্ত্রীকে ভরনপোষণ করবার যোগ্য না-হওয়া পর্যন্ত কন্যা তার কাছেই থাকবে। আপাতত মেয়েকে তিনি রেখে গেলেন বটে, কিন্তু কাজ চুকে গেলেই যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর খরচ-বাবদ পিসিমার হাতে একশো টাকার নোটও একখানা রেখে গেছেন। সুশান্তর মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। দুই চোখের দৃষ্টি দিয়ে পিসিমাকে সে দগ্ধ ক'রে দিয়ে একশো টাকার নোটটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো তক্ষুনি। মনি-অর্ডার ক'রে ফেরৎ পাঠিয়ে শান্ত হ'লো।

দু'হাজার টাকার একটি লাইফ ইনশিওর ছাড়া নরেনবাবু আর-কিছুই রেখে যেতে পারেননি। গেলেনও অসময়ে, তাছাড়া এত বড়ো পরিবার প্রতিপালন ক'রে আর উদ্বৃত্তও থাকতো না কিছু। সুশান্ত মানুষ হবে, বড়ো হবে—এই আশাটাই মস্ত নির্ভর ছিলো তাঁর জীবনে। সাধ্যের অতিরিক্তও তিনি ব্যয় করেছেন তার পিছনে। পারিবারিক কোনো অস্বাচ্ছন্দ্যই তিনি পছন্দ করতেন না। ছেলেপুলের খাওয়া থেকে শুরু ক'রে জামা-কাপড় আবদার সবই তিনি অম্লানবদনে স্বীকার ক'রে নিতেন। স্ত্রীর প্রতিও তাঁর অসীম যত্ন ছিলো। মাঝে-মাঝে দিদির মুখ-ঝামটা শুনতে হ'তো বটে কিন্তু

তবু তিনি হাত গুটোতে পারেননি। অতএব পিতার বিরাট রিক্ত পরিবার নিয়ে কুড়ি বছরের কাঁচা মাথায় পঞ্চাশ বছরের দায়িত্বে সুশান্ত নীরবে মাথা নিচু করলো সংসারের উদ্যত দণ্ডের তলায়। মনকে সে বেঁধে নিলো শক্ত ক'রে, তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে, সকলের যথারীতি ব্যবস্থা ক'রে ধার-দেনা মিটিয়ে তার হাতে রইলো মোট তিনশোটি টাকা। টাকার দিকে তাকিয়ে মা-র চোখে ধারা নামলো, নিঃশব্দে তাঁর কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে সুশান্ত বললো, 'আমিই তো আছি মা।'

আগের মতোই রইলো সব ব্যবস্থা, দু'শো টাকা মার হাতে রেখে একশো টাকা নিয়ে ফিরে এলো সে কলকাতায়। অভ্যস্ত শারীরিক আরাম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললো নিজেকে। কতগুলো মুখ হাঁ হ'য়ে আছে তার দিকে—টাকা চাই, টাকা চাই। এই হ'লো তার একমাত্র মূলমন্ত্র। যে ক'রেই হোক করতেই হবে কিছু—নিতেই হবে যে-কোনো কাজ—যদি বিনিময়ে পাওয়া যায় অর্থ। প্রতিভা আর বুদ্ধি রইলো পিছনে প'ড়ে, উদয়াস্ত ছুটোছুটি করতে লাগলো উদ্‌ভ্রান্তের মতো। অন্তত মাসের শেষে শো দুই টাকা তো তার দরকার। নিজের স্ত্রী, বাবার স্ত্রী, পিসেমশায়ের স্ত্রী—আর একান্ত অসহায় সেই ছোটো-ছোটো পাঁচটি ভাইবোন। খরচ কি কম! দিক্‌বিদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো একটি চাকরির সন্ধানে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই—দেখতে-দেখতে মানুষটি যেন একেবারে বদলে গেলো। মাথার অবিন্যস্ত ঘন চুল পাৎলা হ'য়ে গেলো, ফুটো হ'লো জামা জুতো—মসৃণ ত্বক ধূসর হ'লো রুক্ষতায়।

এদিকে মাসতিনেক মা চুপ ক'রে ছিলেন, কিন্তু আর পারলেন না। সকালবেলা ধারের দোকানে চা প্রত্যাখাত হ'য়ে ফিরে এসে সুশান্ত একখানা মোটাসোটা চিঠি পেলো তাঁর। পিসিমা বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী—মালিশ কেনবার পয়সা কই, ছোটো ছেলেটা জ্বরে ধুঁকছে সাত-আটদিন, তার আগে বড়ো মেয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে উঠলো—ইস্কুলের মাইনে বাকি দু'মাসের—তারা নাম কাটতে চায়—দোকানি ধার দেয় না, উপরন্তু কথা শোনায়, ইত্যাদি ইত্যাদি—তার উপরে বৌমার মুখভার—এই কষ্ট সে সইতে রাজি নয়, বাপকে লিখেছে নিয়ে যাবার জন্য। ঝি-চাকর তিনি উঠিয়ে দিয়েছেন, ছোটো একটা অল্প ভাড়ার বাড়িও দেখে রেখেছেন—কিন্তু তাহ'লেও তো—

চিঠিটা ঝাপসা হ'লো সুশান্তর চোখে। চোখের কোণে দুশ্চিন্তার কালো রেখাটা আরো একটু ঘন হ'লো। খানিক ব'সে রইলো চুপ ক'রে—তারপর নিশ্বাস নিয়ে তাকালো সে বাইরের দিকে—সঙ্গে-সঙ্গে চোখ তার নিবদ্ধ হ'লো আকাশের উপর। কী সুন্দর! স্বপ্নে ভারাতুর হ'য়ে উঠলো চোখ—আশ্চর্য আকাশ এত নীল, এত সুন্দর—আকাশে এত শান্তি!

ক'দিন থেকেই একটা প্রাইভেট টিউশনির কথা ভাবছিলো সুশান্ত। ইতিমধ্যে ক'মাস একটা ইস্কুলমাস্টারিও করছিলো, কিন্তু মাসের শেষে তা থেকে যে ক'টা টাকা উপার্জন হয়, তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে নানাদিক ভেবে সেটা সে ছেড়ে দিয়েছে। তার চাইতে সে-সময়টায় ছবি আঁকলে তার উপার্জন বেশি হবে—অথচ কাজও খানিকটা মনের মতো। খানিকটা এইজন্য যে সব ছবিই তো কোনো-না-কোনো বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হবার জন্য আঁকা। একেবারে মনের মতো আঁকার তার অবসর কই? প্রাইভেট টিউশনি করতে কোথায় যেন তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে-ঘুরে ছাত্র পড়ানো বা ছবি আঁকায় তালিম দেয়া কিছুতেই ভালো লাগে না তার। কিন্তু ভালো-মন্দ বা মান-সম্মানের তো আর প্রশ্ন নেই তার জীবনে—ঘন-ঘন টাকার তাগাদা আসছে মা-র কাছ থেকে—ছোটো বাড়িতে গিয়ে, সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে, ছেলেমেয়েদের জামাজুতো সংক্ষেপ ক'রে, কিছুতেই তো কিছু হচ্ছে না—কেবলি বাড়ছে ধার—এর পরেও কি মান আর সম্মান, ভালো লাগা আর মন্দ লাগার প্রশ্ন উঠতে পারে? মন স্থির ক'রে ফেললো সে। কিন্তু এক্ষুনি কিছু টাকা না-পেলে যে ভাইবোনদের ইস্কুলে নাম কাটা যাবে, এ-কথা ভেবে সে ব্যাকুল হ'লো।

কী করি! কী করি! খশখশিয়ে কাগজের বুকে রং লাগাতে বসলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবলো ভাবনা চিন্তা, মন শান্ত হ'য়ে এলো—অস্নাত অবস্থায় কোনো কষ্ট হ'লো না। তারপর সূর্য যখন আকাশ-পরিক্রমা শেষ ক'রে পশ্চিমের দরজায় থরোথরো, তখন ভাঙলো তার তন্ময়তা। চোখ তুলে তাকালো একবার বেলার দিকে—চোখ ফিরিয়ে ঘরের মেঝেতে নামালো দৃষ্টি—ধামা-চাপা আছে মেসের ঠাণ্ডা ভাতের রাশি।

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে একবার একটা কথা উঁকি দিলো তার মনে। তার শ্বশুর কি এই দুঃসময়েও কিছু ধার দেবেন না তাকে? অন্তত তাঁর কন্যা! কথাটা মনে হ'তেই অসম্ভব ব'লে সুশান্ত অন্য চিন্তায় মন দিলো, কিন্তু ঘুরে-ফিরে একটি কথাই বারে-বারে গুঞ্জন করতে লাগলো তার মাথায়। যুক্তি খুঁজলো মনে-মনে—কেন দেবেন না,—তিনি না দিন, তাঁর কন্যা তো দেবে? তার হাতেও যথেষ্ট টাকা আছে। আমি প্রতিনিয়ত যে লাঞ্ছনা ভোগ করি, তাতে কি তার কোনো অংশ নেই—কোনো বেদনাবোধ নেই? কেন থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। ভাবতে-ভাবতে উত্তেজনা বোধ করলো সুশান্ত। ভালো ঘুম হ'লো না সারা রাত। পরের দিন ভোরে উঠেও দেখলো সেই একই চিন্তা ঘুরছে তার মাথায়। সারাদিন নানা কাজের ভিড়ে কাটলো। তারপর বিকেলবেলা স্নান ক'রে কাপড় বদলে প্রায় নিজের অজান্তেই সে শেয়ালদ স্টেশনে এসে হাজির হ'লো। নৈহাটি এমন কিছু দূরের রাস্তা নয় কলকাতা থেকে, কিন্তু বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে এই তার প্রথম যাত্রা। শ্বশুরেরও অবিশ্যি কোনো আহ্বান ছিলো না।

ভিড়ে ভারাক্রান্ত ট্রেন। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ফেরবার সময় এটা। পকেটে হাত দিয়ে একটু চিন্তা ক'রে একখানা থার্ড ক্লাশের টিকিট কিনলো সে। তারপর গুঁতোগুঁতি ক'রে উঠে বসলো সেই হাটের মধ্যে। চলতে লাগলো ট্রেন—কলকাতার ইট-কাঠ ছাড়িয়ে সবুজ সবুজ পানাভরা ডোবা দেখা দিলো,—দেখা দিলো ঝোপঝাড়। ধানের খেতের আল বেয়ে হাঁটা, বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকা মানুষ—উলঙ্গ শিশু—ময়লা শাড়িপরা ঘোমটা-টানা বধূ—তারপর নামলো অন্ধকার। চলন্ত ট্রেনের জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ নাম-না-জানা কোনো-একটা স্টেশনে নেমে পড়লো সে। তা'কে নামিয়ে আধ মিনিটের মধ্যেই হুশহুশ ক'রে যখন আবার ছেড়ে দিলো ট্রেন, একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস নিয়ে চোখ ফিরিয়ে সে স্টেশনের নামটা পড়তে চেষ্টা করলো, তারপর একটা মালগুদামের পাশে একটা কাঠের উপর ব'সে রইলো চুপ ক'রে। কখন আবার গাড়ি আসবে কে জানে—তখন সে ফিরতে পারবে—কিংবা পারবেই কি না—কোনো ভাবনাই তার মনে এলো না। শক্ত কাঠের উপর ব'সে-ব'সে সে দেখলো আবছা-আবছা সন্ধ্যা রাত্রির কালোতে গভীর হ'য়ে এলো। দূরে রেললাইনের ওপারে জ্ব'লে উঠলো

অগুনতি জোনাকি—ঝিঁঝিঁর ডাকে রাত্রি যেন থমথমে হ'য়ে উঠলো তখুনি, টিমটিম ক'রে স্টেশনে দুটো আলোও জ্বলছিলো। ট্রেনটি আসবার সময় হঠাৎ যেন কারা ভিড় করছিলো—ট্রেনটা চ'লে যেতেই আবার তারা মিলিয়ে গেলো কোথায়। কেমন একটা অটল নিস্তব্ধতার শান্তিতে নিজেকে খুঁজে পেলো সুশান্ত, মায়ের চিঠির অশ্রুভরা বেদনা আর তার মনকে বিবশ ক'রে রাখলো না। কোনো দুর্বল মুহূর্তে শ্বশুরের কাছে সাহায্য প্রার্থনার দাবি, স্বামী দরিদ্র ব'লে যে-স্ত্রী সুখভোগের লিপ্সায় পিত্রালয়ে চ'লে যায় তার কাছে দুঃখের আবেদন—এ থেকে মুক্তি পেলো সে। নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়ে রইলো তারা-ভরা আকাশের দিকে।

এর কয়েকদিন পরে ঘরে ব'সে একটি বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকছিলো সুশান্ত —ভেজানো দরজাটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে এক ভদ্রলোক মাথা গলালেন ভিতরে, তারপরেই আনন্দিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—'এই তো!' শব্দ ক'রে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে নিজে ঢুকলেন, পিছনে তাকিয়ে বললেন, 'এসো'। সচকিত হ'য়ে চোখ তুললো সুশান্ত, ভালো ক'রে না-তাকিয়েই অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলে, 'কে?'

'আমি হে, আমি। তুমি কোথায় ডুব মেরেছিলে এতদিন—কত খোঁজ ক'রে—'

এইবার সেই কণ্ঠস্বর গিয়ে হাতুড়ির ঘা মারলো সুশান্তর বুকের ভিতর। 'মাস্টার মশায়!' দ্রুতপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিচু হ'য়ে পায়ের উপর হাত রাখলো সে। পিছনে মিসেস চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে আবেগে চোখ জলে ভ'রে গেলো।

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, 'আজকেই একটি ছাত্রের মুখে খবর পেলাম তুমি এখানে আছো। এই দ্যাখো, ইনিও এলেন তোমাকে দেখতে—তারপর? ব্যাপার কী বলো তো?'

জবাব দিতে গিয়ে একসঙ্গে এক সমুদ্র কথা ভিড় ক'রে উঠলো তার বুকের মধ্যে। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা—কোথায়? কোথায় গেলো সব? বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ছাত্র—বৈজ্ঞানিক চ্যাটার্জির প্রিয়তম শিষ্য সুশান্ত—কোথায়? কোথায় সে? সংসারের নিষ্পেষণে বিচূর্ণ এই যে মানুষটা এতক্ষণ ধ'রে বিজ্ঞাপনের জন্য চুল-এলানো স্তন্যদাত্রী বিগলিত মায়ের ছবিতে রং দিচ্ছিলো,

তার সঙ্গে কোথায় তার যোগসূত্র? খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে সে কথা বার করতে পারলো না। কতদিন পরে সে দেখলো এঁদের—এঁদের সস্নেহ মুখশ্রী যেন মুহূর্তে ফিরিয়ে আনলো তার পুরোনো দিন, যে-সব দিনের তিলতম স্মৃতিও সে মুছে দিতে চেয়েছিলো মন থেকে, তা যেন একেবারে ঝলমলে হ'য়ে উঠলো সূর্যালোকের মতো। ব্যস্ত বিব্রত হ'য়ে দু'হাতে খাটের উপরকার রং তুলি বই আবোল-তাবোল সব সরিয়ে ফেলে অসহায় গলায় বললো, 'কোথায় যে বসতে দেবো আপনাদের, এই তো আমার ঘর।'

'সুন্দর ঘর—' সস্নেহে মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'তুমি যে বৈজ্ঞানিকের চেয়ে শিল্পী বেশি, তারই প্রমাণ এই ঘর।' মৃদুহাস্যে মাথা নিচু করলো সুশান্ত। নানা উপলক্ষ্যে তাকে কত যেতে হয়েছে এঁদের বাড়িতে। এই ভদ্রমহিলার সযত্ন মার্জিত ব্যবহারে কতবার সে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু তার অদর্শনে তাঁরা যে কখনো এমন ক'রে কাছে আসতে পারেন,—এ-কথা সে কল্পনাও করেনি। নিজের ভাগ্যের জন্য অদৃশ্য দেবতার কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানালো। একটু পরে মুখ তুলে বললো, 'আমার যাওয়া উচিত ছিলো।'

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, 'আমরা তো ভাবছি হঠাৎ তোমার কী হ'লো। তোমার বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলাম—কিন্তু তার জন্য তুমি যে পরীক্ষাটাও দিতে পারবে না তা ভাবিনি। তুমি আমার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় ছিলে, তোমার মতো ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র আমি আমার পঁচিশ বছরের শিক্ষকতায় দেখিনি।' মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'তা ও-বছর না-হয় গেছে—পরীক্ষাটা তো তুমি এ-বছরও দিতে পারতে।'

নিশ্বাস ফেলে সুশান্ত বললো, 'সে আর হয় না।'

'কেন? কী তোমার এমন অসুবিধে। সব তো তোমার প্রস্তুতই ছিলো।'

'আমি কেমন ক'রে বোঝাবো যে কতগুলি প্রাণী একমাত্র আমাকে নির্ভর ক'রেই বেঁচে আছে? আমার পক্ষে পরীক্ষার কথা এখন স্বপ্ন।'

ডক্টর চ্যাটার্জি মাথা নেড়ে বললেন, 'শুনেছি কিছু-কিছু, কিন্তু—'

'তোমার বাবা কি কিছুই রেখে যাননি?' মিসেস চ্যাটার্জি বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'অন্তত একটা বছরও চলতে পারে এমন-কিছু—'

অত্যন্ত কুণ্ঠিত গলায় সুশান্ত বললো, 'অত্যন্ত অসময়ে গেলেন, তা ছাড়া—' কথা শেষ না-ক'রেই সে চুপ করলো।

একটু চুপ ক'রে রইলো সকলেই। ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, 'তুমি তো আমার কাছেও থাকতে পারো। এই মেসটা তত ভালো দেখছিনে।'

'ভালোমন্দ ছেড়ে দিলেও তুমি যদি আমাদের ওখানে গিয়ে থাকো আমরা খুবই খুশি হই।' মিসেস চ্যাটার্জির গলায় আন্তরিকতা ফুটে উঠলো।

'আমার পক্ষেও তো সেটা কম সৌভাগ্যের নয়, কিন্তু—'

'কিন্তু কী বাবা—আমি তোমার মায়ের মতো, আমার কাছে তোমার তো সংকোচের কারণ নেই।'

ডক্টর চ্যাটার্জি সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন স্ত্রীর কথা। বললেন, 'তুমি বোধহয় জানো না যে আমার ছেলেটি মাসখানেক যাবৎ বিলেতে গেছে, এঁর মন আর টিঁকছে না বাড়িতে। ক'দিন থেকে ক্রমাগত তোমার কথা বলছিলেন ইনি। আর ভাবছি ওখানে গেলে হয়তো কিছু-কিছু পড়াশুনোও হবে তোমার —আমি তো আছি।'

সুশান্ত কী বলবে। এই অযাচিত ভালোবাসার কি কোনো তুলনা আছে? এখানে কি আত্ম-সম্মানের প্রশ্ন তুলে এঁদের অসম্মান করবে? দু'একবার আপত্তি জানিয়েই সে রাজি হ'তে বাধ্য হোলো। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'আমার মেয়েকে কিন্তু পড়াতে হবে। লেখাপড়ায় সেও খুব ভালো। আই. এস.-সি. দিচ্ছে সামনের বছর।' একটা যে কিছু বিনিময় করতে পারবে এ-কথাটা ভেবে সুশান্ত খুব লাঘব বোধ করলো—খুশি হ'য়ে বললো, 'নিশ্চয়ই।'

পরের দিনই মেসের পর্ব চুকিয়ে একরাশ তুলি আর ছবির কাগজ বুকে ক'রে উঠে এলো সে চ্যাটার্জির বাড়িতে। মেসের বাচ্চা চাকরটা ছলোছলো চোখে কাছে এসে দাঁড়ালো, বদমেজাজি ঝিটা বিষণ্ণ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে, ঠাকুর এসে মুখ নিচু করলো—মমতায় বুক ভ'রে গেলো সুশান্তর। ব্যাগের মুখ খুলে উপুর ক'রে ঢেলে দিলো তাদের হাতে—তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এলো রাস্তায়।

যাবার সময় সায়েন্স কলেজটার পাশ দিয়ে ইচ্ছে ক'রেই ঘুরে গেলো সে। কত মধুর সকাল, কত বিনিদ্র রাত্রি কেটে গেছে তার এখানে কাজ করতে-করতে; সাফল্যের আভায় উদ্ভাসিত চ্যাটার্জির প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে

তাকিয়ে কত সময় ভক্তিতে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হ'য়ে উঠেছে তার মন। অনেক-দিন পরে বড়ো ভালো লাগলো তার। একটুখানি সময়ের জন্ম অভাব অভিযোগ মুছে গেলো মন থেকে। মিসেস চ্যাটার্জি হাসিমুখে দরজা খুলে দিলেন। তাঁতের আটপৌরে শাড়ি আর ব্লাউজে যেন তাঁকে আরো কাছের মানুষ ব'লে মনে হ'লো আজ। তাঁর পিছনে-পিছনে তাঁর মেয়েও এসে দাঁড়ালো। এর আগে যতদিন সে এসেছে, এসেছে অতিথির মতো। আর আজ এলো সে ঘরের ছেলে হ'য়ে। তাই মা-মেয়ের যুক্ত অভ্যর্থনা নিতান্ত আপনজনের মতো অভিনন্দিত করলো তাকে। চকিতে একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'উনি এতক্ষণ তোমার আশায় থেকে এইমাত্র বেরুলেন একটু। এসো। কণা, যা তো বাবা, হরিকে পাঠিয়ে দে, ওর জিনিশগুলো তুলে নিক।'

কৌতুহলী হ'য়ে কণা বললো, 'ঐ ইজেলটা কার? আপনি ছবি আঁকেন?'

'জানিসনে?'—মিসেস চ্যাটার্জি জবাব দিলেন—'ওর হাত অত্যন্ত ভালো। সেদিন তো ডক্টর রায় ওর কথাই বলছিলেন। নানা কাগজেই তো আজকাল ওর ছবি বেরুচ্ছে।'

'মজা তো—'অত্যন্ত ছেলেমানুষের মতো কণা বললো, 'আমি বেশ শিখতে পারবো আপনার কাছে।'

'যতটুকু পারি নিশ্চয়ই আপনাকে শেখাবো।' মৃদু হেসে বিনীত গলায় বললো সুশান্ত।

হরি এলো। অতি সামান্য জিনিশ। তুলে নিতে সময় লাগলো না। মিসেস চ্যাটার্জির নির্দেশমতো সে এবার তার জন্য নির্ধারিত ঘরটিতে গিয়ে নিঃসঙ্গ হবার সুযোগ পেলো।

এখনো, এত বছর পরেও সুশান্তর মনে পড়ে তাঁদের কথা। মিসেস চ্যাটার্জির সস্নেহ সযত্ন নিখুঁত ব্যবহার, ডক্টরের শুভকামনা; তাঁদের কথা-বলার ভঙ্গি, এমন কি তাঁদের কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পায় সে। অথচ তাদের মেয়েটি—মেয়েটিকে কী জানি কেন কিছুতেই মনে পড়ে না আর—তার ব্যবহারটা পর্যন্ত আজ আবছা হ'য়ে এসেছে সুশান্তর কাছে। কিন্তু সেই সময়ে কত কাছে এসেছিলো সে, কত দুঃখ পেয়েছিলো সে সুশান্তর জন্য। দুঃখের

উপলক্ষ্য হ'লেও তার নিজের তো কোনো দোষ ছিলো না। মন্ন [redacted] পড়িয়েছে তাকে, ছবি আঁকা শিখিয়েছে, তার পরীক্ষার সময় অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে নিজের শরীর পর্যন্ত খারাপ ক'রে ফেলেছিলো। কিন্তু তার মধ্যে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর-কিছু কি ছিলো? এমন-কী কিছু ছিলো যাতে কণা তিলমাত্রও ভুল বোঝার অবকাশ পায়? অথচ কোনো-একদিন হঠাৎ সে অনুভব করলো কণা তাকে ভালোবেসেছে। যেন একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে। কেমন অগোছালো হাবভাব, চলাফেরার মধ্যে যেন কেমন একটা বেদনার ছায়া, আগের মতো কথা বলে না, তার সঙ্গে চোখাচোখি হ'লে নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নেয়। মেলামেশার সেই সহজ ভঙ্গি কে যেন শুষে নিয়েছে তার ভিতর থেকে!

অত্যন্ত বিপর্যস্ত ছিলো সেদিন সুশান্তর মন। মা-র চিঠি এসেছে, বাবার বাৎসরিক কাজের জন্য কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। তাছাড়া অন্যান্য অভাবের বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। উপরন্তু তার শ্বশুরের লেখা একখানা চিঠি। পিসিমা এ-সময় বৌকে আনাবার কথা লিখেছিলেন, না এলে ভালো দেখায় না—তারই জবাব। চিঠিখানার ভাষা সুখশ্রাব্য নয়, এবং তার ভিতরে জামাইয়ের প্রতি যে-মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছেন তাও অসহ্য, কিন্তু সব চাইতে অসহ্য তাঁর অভদ্র ইঙ্গিত তাদের দারিদ্র্য নিয়ে, তার মৃত বাবার উদ্দেশে অপমান জানিয়ে। পিসিমা কিছু অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন হয়তো, তারও জবাব আছে পুনশ্চ দিয়ে, 'আমার এত অর্থ নেই যাতে কাউকে সাহায্য করতে পারি—তাছাড়া এটা আমি নীতিবহির্ভূত ব'লেই মনে করি, কেন না অযোগ্যকে সাহায্য করা মানেই তাকে প্রশ্রয় দেওয়া। সুশান্ত যদি আমার এখানে এসে থাকে আমি আমার কাপড়ের কারবারে তাকে বসিয়ে দিতে পারি—মাইনে পাবে—খাওয়া-দাওয়ার খরচ লাগবে না—'

ক্ষোভে, অপমানে, সুশান্তর সর্বশরীর জ'লে গেলো, পিসিমার উপরেই তার রাগ হ'লো বেশি। এই ভদ্রমহিলাই তো ডেকে আনলেন এত বড়ো অপমান—আর এঁর জন্যই তো সুশান্ত বাধ্য হয়েছিলো বিয়ে করতে। চিঠিটা হাতের মুঠোয় পাকাতে-পাকাতে ছিঁড়ে ফেললো, একটা অসহ্য উত্তেজনায় পাইচারি করতে লাগলো সারা ঘরে। এক সময় লক্ষ্য ক'রে দেখলো, কখন কণা এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দরজা ধ'রে—অত্যন্ত শুকনো মুখ—

বিষাদে বিবর্ণ চেহারা। নিজের উত্তেজনাকে তক্ষুনি সংযত ক'রে হাসিমুখে বললো, 'আসুন, আমি ভুলেই গিয়েছিলুম আজ আমাদের ছবি আঁকার দিন।'

কণা নড়লো না সেখান থেকে, একটি কথা বললো না—একবার কেবল চোখ তুললো—সুশান্ত দেখলো সে-চোখ জলে ভরা।

'কী হয়েছে? কোনো অসুখ করেনি তো?'

'না।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'আপনাকে কেমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে। তাছাড়া ক'দিন থেকে—'

'আমার কিছু হয়নি—' কণার গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা, এগিয়ে এসে দাঁড়ালো সে।

সুশান্ত একটু চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তারপর বললো, 'পাঁচ মাস হ'য়ে গেলো এখানে আছি, কেবল তো আপনাদের যত্ন নয়, আপনাদের সঙ্গসুখেও যে আমি কত সুখী, কত কৃতজ্ঞ—'

'আপনি কি কেবল কৃতজ্ঞ হ'তেই জানেন, আপনার মনে কি আর-কিছুই নেই?' কথা বলতে-বলতে থরথর ক'রে কাঁপছিলো কণার গলা।

সুশান্ত অবাক হ'য়ে বললো, 'এ-কথা বলছেন কেন?'

'কেন?' কণা দু'হাতে মুখ ঢাকলো নিচু হ'য়ে—দু'পাশ থেকে ভিজে-ভিজে কালো চুল ছড়িয়ে পড়লো বুকের উপর। সুশান্ত স্তব্ধ হ'লো। নির্জন দুপুর, নিরালা ঘর—বুকের মধ্যে যেন কেমন ছমছম ক'রে উঠলো তার। মুহূর্তকাল থমকে রইলো, তারপর বললো, 'বুঝেছি।'

'কিছুই বোঝেননি, কিছুই বোঝেননি আপনি—'

সস্নেহে কণার মাথার উপর একখানা হাত রেখে খুব শান্ত স্বরে সুশান্ত বললো, 'আপনি তো জানেন আমি বিবাহিত।'

'জানি।'

'তবে?'

'এও জানি যে স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সংশ্রব শিথিল।'

'কিন্তু কর্তব্য?'

'জীবনে কি কেবল কর্তব্যটাই বড়ো? হৃদয়ের কি কোনোই মূল্য নেই?'

'হৃদয়বৃত্তিটা একটু যদি কম থাকতো আমার তাহ'লে আমি বেঁচে যেতাম। কিন্তু এ আপনি কী করলেন? কেন এই অযোগ্যকে এতখানি সম্মান দিলেন?'

'অযোগ্য! তুমি অযোগ্য! হায়রে!' কণার কান্না-ভরা মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। জলে-ভেজা মুখ আর গালের উপর উড়ে-পড়া ছোটো-ছোটো চুল মিশে গেলো সেই হাসির সঙ্গে। সুশান্তর শিল্পী মন আর চোখ হঠাৎ স্থির হ'লো সেখানে, ক্ষণেকের জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা তাকে আত্মবিস্মৃত করলো, ধীরে-ধীরে মুখ নিচু করলো সে কণার মুখের উপর। কিন্তু পরমুহূর্তেই দ্রুত স'রে দাঁড়ালো, ধিক্কার দিলো নিজের অসংযমকে, তারপর ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে-যেতে বললো, 'আপনি শান্ত হোন, আমি আসছি।' তারপর দু'দিন পর্যন্ত ভারি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে রইলো সুশান্ত। কী যে করবে, কী যে করা উচিত কিছুই ভেবে পেলো না। এতদিনের অত ঘনিষ্ঠ পরিবেশ, সুযোগ সুবিধের মধ্যেও এ-ভুল তো তার কখনো হয় নি। কণা আশা করেছে, অভিমান করেছে—অনেক কথা যা কোনোদিন সুশান্ত ভাবেনি, আজকের কণাকে দেখে সে-সব কথা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো তার মনে—কতদিন কণার চোখে একটা তীব্র বেদনার ছায়া ছড়িয়ে পড়তে দেখেছে সে, অথচ কেন, সে-প্রশ্ন কোনোদিন মনে ওঠেনি তার। দৈহিক সংস্পর্শ সম্বন্ধে আসলে সে অচেতন। কেন অচেতন? কেন তার ভালো লাগে না ও সব? এ-প্রশ্ন সে নিজেকেই অনেকবার করলো—তারপর তৃতীয় দিন রাত্রির কোনো-এক মুহূর্তে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ডক্টর চ্যাটার্জির সৌম্য প্রশান্ত মূর্তিকে স্মরণ করলো মনে-মনে—মিসেস চ্যাটার্জিকে অনুচ্চারিত গলায় দু'বার মা ব'লে ডাকলো—অসংখ্য প্রণাম রাখলো তাঁদের জন্য—প'ড়ে রইলো বিছানা, বালিশ, বাক্স—কেবলমাত্র রং তুলি আর প্রায় শূন্য মণিব্যাগটি তুলে নিয়ে কোনো-এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় পা বাড়ালো চোরের মতো নিঃশব্দে।

সে আজ কোন যুগের কথা—মনেও পড়ে না ভালো ক'রে। দশ বছরের পলিমাটি পড়েছে স্মৃতির উপরে। কত ফুটপাথ আর পার্কের বেঞ্চি—সারা রাত জেগে পোস্টারে রং লাগানো—বিনিদ্র রাত্রির পরে কত স্নিগ্ধ সকাল আর সকালবেলার রাজপথে কত মানুষের বিচিত্র মিছিল, কত দৃশ্যের পুনরুক্তি—

ছবির মতো ভেসে-ভেসে ওঠে আজ। শিখদের মোটা রুটি আর মাটির গেলাশে ক'রে কালো রংয়ের চা। কচি-কচি ভাইবোনেদের বিষণ্ণ বিবর্ণ চেহারা, মায়ের ব্যথিত মুখচ্ছবি, দরিদ্র স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনাসক্তি— কিছুই কি ভুলে যাবার? কিন্তু কে তার সাক্ষী? সেই সুদীর্ঘ বছরের পর বছর পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাস আজ কে মনে রেখেছে? ভাইবোন? স্ত্রী? কে? মেয়ের বিয়ের সময় মা বলেছেন, 'গরিবের ঘরে বাবা মেয়ে দেবো না—হোকগে ভালো পাত্র। গরিবদের মন বড়ো নিচু।' সুশান্তর মন কি নিচু ছিলো? কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে-কথা? পিসিমা দেখে যাননি এই সমৃদ্ধি, তিনিই ছিলেন জ্বলন্ত সাক্ষী, তিনি নেই। বুড়ো বয়সের অনেক লোভ আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি মরেছেন। আজো কোনো ভালো জিনিশ খেতে গেলেই তার পিসিমাকে মনে পড়ে, চোখ জলে ভ'রে যায়।

আজ স্ত্রী ফিরে এসেছেন তাঁর ধনী স্বামীর উপর স্ত্রীত্বের সকল অধিকারের দাবি নিয়ে কর্তব্য করতে, প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়ায় ভাইদের শরীর মসৃণ—বোনেরা বড়ো বড়ো ঘরের বৌ, মা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর তিলতম ইচ্ছাটিও অপূর্ণ রাখে না সুশান্ত। কিন্তু তার নিজের? এই যে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিজের সকল অস্তিত্বের বিনিময়ে এত স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে সে সকলের জন্য, সে-কথা কি কেউ একবার চিন্তা করে? তার এই বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনেও যে কোনো চাহিদা আছে, কেউ কি মনে করে সে-কথা? সে নিজেও কি মনে রেখেছিলো এতদিন? ঘুম ভেঙে উঠে সকলের সব চাহিদা মাথায় নিয়ে কাজে ঢুকতো, আর ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে ফিরে আসতো আলো জ্বললে। মাঝে-মাঝে কোন-এক অনির্দেশ্য ব্যথায় বুকটা যেন কেমন ক'রে উঠতো—কিন্তু সে তো ক্ষণিক। জীবনের এই মধ্যাহ্নে এসে সকল ইচ্ছাকেই সে ভুলে যেতে পেরেছিলো। উঠতে হবে, দাঁড়াতে হবে, দারিদ্র্যের সমস্ত লাঞ্ছনার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে হবে, এই মন্ত্রটিই ছিলো তার যৌবনের সাধনা—সুখ-দুঃখের সকল চেতনাকে সবলে উৎপাটিত করেছিলো হৃদয় থেকে। অভাব যে কী ভয়ংকর, গরিব হ'য়ে বেঁচে থাকা যে কত দুঃখের, সংসার যে কত নিষ্ঠুর—তার তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন মন প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত প্রতিপলে তা অনুভব করেছে—আর আজ? নিয়েছে তার যোগ্য প্রতিশোধ! তার সম্মান, তার প্রতিপত্তি—তার প্রতি সকলের অহেতুক মনোযোগ—সব সে

আদায় ক'রে নিয়েছে কড়ায়-ক্রান্তিতে। কিন্তু তবু তৃপ্তি কই? তার মন কি এই চেয়েছিলো? মাঝে-মাঝে কাজ করতে-করতে আকাশটা চোখে পড়ে, মন উধাও হ'য়ে যায়। কী যেন সে পায়নি, কী যেন পাবার ইচ্ছায় আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছটফট করে। নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতোই তার সেই চাওয়া, কিন্তু হাত বাড়ালে দেখে সেই সামান্য পাওনাটুকুও তার জন্য কেউ সঞ্চয় ক'রে রাখেনি।

ছবি আঁকারই কাজ করে সুশান্ত। কিন্তু সে বিজ্ঞাপনের ছবি। হাজার টাকা পায় বিজ্ঞাপনের আপিশে, তাছাড়া প্রয়োগশিল্পে তার মতো ওস্তাদ আজ ভারতবর্ষে ক'জন? আজকের দিনে সারা ভারতবর্ষে এমন-কোন বিশেষ বাড়ি আছে, যার মধ্যে সুশান্তর মাথা এক ঘণ্টার জন্য নিবিষ্ট হ'লেও তিলমাত্র দ্বিধা না-ক'রে তারা মুঠো-মুঠো টাকা বার ক'রে দিতে না পারে? তার মতো রঙের সমাবেশ আনতে পারে ক'জন? তার প্রতিভার দাম সে অর্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দিয়েছে। টাকা! টাকা! কত চাই? দু'হাতে আনবো, ছড়াবো, ছিটোবো,—আর হৃদয় হবে সেই টাকারই স্তূপের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত। এতদিনে নিবে এসেছে তার উত্তাপ, সে এবারে ঠিক মরেছে, বিক্রীত হয়েছে তার অশান্ত আত্মা এই পার্থিব সংসারের মোটা-মোটা টাকার অঙ্কে। জীবনের উপর এই তো তার চরম প্রতিশোধ। নাও, নাও, হে সংসার! কত নেবে নাও—রাশি-রাশি দিয়ে পূরণ করো তোমার গহ্বর। আর্থিক উন্নতির চরম শিখরে উঠে হৃদয়ের সকল সূক্ষ্ম অনুভূতিকে টিপে-টিপে মারলো সে। এই কিছুকাল আগেও যে নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবে একটা দুর্জয় অভিমানবোধ ছিলো তার মনে, সেটা সে মুছে ফেলতে পারলো এতদিনে। মনকে বোঝালো, এই তার জীবন। সকল প্রবৃত্তিকে পোষ মানালো কুকুরের মতো। আকাশে মেঘ করলে কে তাকায়? পূর্ণিমার রাত্রিতে আর কার হৃদয়ে সমুদ্রের জোয়ার নামে? বর্ষায় আর বসন্তে যদি রসের প্লাবন নামে ধরণীতে, তাতে তার আমন্ত্রণ নেই। সে-মানুষ হারিয়ে গেছে।

আসলে জীবনের সুখদুঃখের সকল চেতনাই আজ তার কাছে লুপ্ত। বদ্ধ জলের মতো গতিহীন আর স্থির তার মন। বিরক্তি নেই, আসক্তি নেই, দুঃখ নেই, সুখ শান্তি কিছু নেই। তার মনের সকল প্রবৃত্তিকেই জয় ক'রে এতদিনে

নিরুদ্বেগ হয়েছিলো সে। স্ত্রীর সঙ্গে শিথিল সম্পর্ক শিথিলতর হয়েছে, স্ত্রীর আসক্তি টাকায়—নাও! যত খুশি নাও!—তার ঈর্ষার বিষে সমস্ত সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলেছে, জ্বলুক। ভাইয়েদের বিয়ে হয়েছে, ছেলেপুলে হয়েছে। সীতা বরদাস্ত করতে পারে না এত লোকের ভিড়- হও আলাদা —সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, অর্থ—যা তুমি চাও, তাই নাও। ভাইয়েদের বড়োমানুষি অভ্যাস, নিজেদের উপার্জনে তা পোষায় না- গহ্বর পূরণ করে সুশান্ত। কেবল মা মাঝে-মাঝে পুরোনো দিনের মতো বিষণ্ণ চোখে কাছে এসে দাঁড়ান—মেনে নিতে পারেন না বৌয়ের কর্তৃত্ব, ছেলেদের স্বেচ্ছাচারিতা—সুশান্তকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের প্রাচুর্য—দাঁত দিয়ে তখন ঠোট কামড়ায় সুশান্ত—এই স্নেহের ছোঁওয়ায় একটা দোলা লাগে হৃদয়ের মধ্যে—তার পরেই জলের উপর একটি ভাসমান যন্ত্রের মতো আবার সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় সদম্ভে। কিন্তু সব স্থৈর্য আর এতদিনের অর্জিত সকল শক্তি যেন কে হরণ ক'রে নিলো, হঠাৎ কে যেন তাকে আবার স্বপ্ন দেখালো সীমাহীন আকাশের। জীবনের এক অপূর্ব মাধুর্য আবার কে উপলব্ধি করালো নূতন ক'রে। এত ফুল, এত গন্ধ, এত রূপ, এত রস—কে আবার তাকে নিমগ্ন করলো তার মধ্যে। সব তো মুছে গিয়েছিলো, আবার কেন ঘুম ভাঙলো—আবার কেন ঝংকৃত হ'য়ে উঠলো হৃদয়ের সকল তন্ত্রী—কেন বেজে উঠলো সুরের আঘাতে। এ যে বন্যা—এ যে বন্যা। সুশান্ত একেবারে ছটফটিয়ে দিশেহারার মতো দিন কাটাতে লাগলো।

কত মেয়ের পদক্ষেপে তার জীবন কতবার পুষ্পিত হয়েছে, কত মেয়ের চোখের জল তাকে বিচলিত করেছে, তাকে কেন্দ্র ক'রে চলেছে কত পরিভ্রমণ, আর কী নির্লিপ্ততায় সে তা পরিত্যাগ করেছে অনায়াসে—কিন্তু আজ এ কী হ'লো তার। জীবনের মধ্যাহ্নে এসে কার দেখা পেলো। ঐ শুষ্ক সমুদ্রে কেন এলো এই প্রচণ্ড জোয়ার। মন লাগে না কাজে, কখন কত অসতর্ক মুহূর্তে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করে তাঁর নাম—আর অদ্ভুত মধুর এক তীব্র উপলব্ধিতে সারা দেহ মন অসাড় হ'য়ে যায়।

এমন মানুষকে যে এমন ক'রে জাগালো, সমস্ত জীবনের সব অতৃপ্তিতে যে ঢেলে দিলো এত মধু, যা জানতো না অথচ চাইতো, সেই চাওয়াকে যে রূপ দিলো, সে কে—কোথায় তার বাসা, কেমন সে দেখতে, এ-সব প্রশ্নই অবান্তর।

তিনি তিনিই। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি একমাত্র। তার সমস্ত তৃষিত অন্তরাত্মার একমাত্র অধীশ্বরী তিনি। এ ছাড়া তাঁর অন্য-কোনো পরিচয় নেই।

তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পরে বুকের মধ্যে যেন ভালোবাসার একটা দুরন্ত স্রোত ওঠা-পড়া করতে লগেলো দিনরাত্রি। নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় ক'রে দিয়েও তার মনে হ'লো নেই, নেই—কিছু নেই—কিছু নেই দেবার। ঈশ্বর, দাও, আরো দাও, আরো দাও, প্রভু—বুকের উপর দুটি হাত যুক্ত ক'রে রাত্রিতে শুয়ে-শুয়ে সুশান্ত এই প্রার্থনা করলো মনে-মনে।

অবশ্য এই বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠবার অনেক চেষ্টা করেছিলো সে—কিন্তু দৈবের কাছে মানুষের হার চিরকাল চ'লে এসেছে, তা নইলে সঞ্চিত সকল শক্তি কেন গেলো ভেসে? কেন অনিবার্য হ'য়ে উঠলো এই ভালোবাসার আবেগ? একটু দেখা, শুধু চোখ দিয়ে তাঁকে একটুখানি দেখতে পাওয়া—এ যে তার জীবনে কী, তার ব্যর্থ বিরস কর্মময় জীবনে কতখানি, এ-কথা কাকে বোঝাবে সে। নিজের কাছেই নিজেকে যেন নতুন লাগলো। দীর্ঘদিন ধ'রে সংসারের কত ভার সে নিঃশব্দে একা-একা বহন করেছে, কত ইচ্ছা সে অনায়াসে মিশে যেতে দিয়েছে মনের মধ্যে, কত দুঃখ-ব্যথার জগদ্দল পাথর আজো তো বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা তুলে কত দিন কত মুহূর্তকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে দেয়। তবে? উত্তর নেই এ-প্রশ্নের।

সুশান্ত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলো এখানে, দিনগুলো কাটতে লাগলো একটা মূর্ছার মতো, জীবনে শুরু হ'লো এক নতুন অধ্যায়। সমস্ত দিন কাজ, আর কাজের শেষে ক্লান্ত দেহ-মনে বাড়ি ফেরা—এ ছাড়া অন্য প্রয়োজন যার নিবে গিয়েছিলো, সে যেন জ্ব'লে উঠলো সূর্যের মতো। প্রদীপের পোড়া সলতের মতো তার শুকনো বুক আবার স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠতো তেলের প্রাচুর্যে। জীবনে এলো ছুটির প্রয়োজন। আপিশ থেকে শিগগির ক'রে বাড়ি ফেরার তাড়া দেখা দিলো—এমনকি সুযোগমতো কামাই করতেও সে দ্বিধা করলো না। সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরার যে একটা ব্যাকুলতা, জীবনে যেন এই সে প্রথম উপলব্ধি ক'রে রোমাঞ্চিত হ'তে লাগলো। এ যে কী, কত যে আনন্দ, তা কি আর কোনোদিন জেনেছিলো? যদিও এ-বাড়ি তার নয়, এ-বাড়ির যিনি রচয়িতা তিনিও তার কেউ নন—তবু সে-চিন্তা তাকে স্পর্শ

করলো না—তাঁকে যে দেখবে, শ্রবণ ভ'রে যে শুনবে তাঁর কোমল কণ্ঠস্বর, প্রসন্ন অভ্যর্থনার আলো নিয়ে তিনি যে আসবেন দ্রুত পায়ে এগিয়ে—এ-চিন্তাই তাকে সকল-কিছুর অতীত ক'রে রাখলো।

শৈশবে পিসিমার আদেশে বাড়ি ফিরতো, স্বেচ্ছায় নয়। সন্ধ্যাবেলা সূর্য যখন এইমাত্র ডুবলো—সমস্ত আকাশে যখন রাত্রির একটা আশ্চর্য কালো ছায়া বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো—সেই সময়টায়, সেই সন্ধিক্ষণটায় তার ইচ্ছা করতো না বাড়ি ফিরতে। চারটি দেয়ালে আবদ্ধ ঐ ছোটো ঘরটিতে ব'সে পাঠ্যপুস্তকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গিয়ে কতদিন ঝাপসা হ'য়ে এসেছে চোখ, একদিনও বাইরের সেই অস্পষ্ট আকাশকে দু'চোখ ভ'রে সে দেখে নিতে পারেনি। ঘরে ব'সেই সন্ধ্যার কেমন-একটা গন্ধ অনুভব করেছে, অথচ প্রাণশক্তিকে আবদ্ধ রাখতে হয়েছে লণ্ঠনের সেই কেরোসিনের কটু গন্ধে! চরিত্র খারাপ হবে, এই ছিলো পিসিমার ভয়। সূর্যালোক যেন চরিত্রের সতর্ক প্রহরী, আর রাত্রি যেন অধঃপতনের পিছল পথ। কিন্তু মনে-মনে যতই কষ্ট পাক, পিসিমাকে অস্বীকার করার মতো মনের জোর তার ছিলো না। তারপর পিতার মৃত্যুর পরে যে-স্বাধীনতা সে পেলো, তাতে বাড়িতে কিসের একটা ভয়াবহ অনুভূতিই তাকে বিরত করেছে। যতক্ষণ বাইরে থেকেছে ততক্ষণই শান্তি। অতগুলি ক্ষুধিত মুখের কাছে রিক্ত হস্তে দাঁড়াতে তার ভয় করতো, সারা বাড়িময় যেন একটা দারিদ্র্যের ফিশফিশানি—তাকে দেখলেই যেন তারা কথা ক'য়ে উঠতো। তার উপর ছিলো সকলের কেমন একটা অবোধ অহেতুক দাবি—দেবে না কেন, কেন করবে না, বড়ো হয়েছিলো কেন—মা পর্যন্ত কতদিন তাকে অযোগ্য বলেছেন, তাকে শুনিয়ে, অন্য ছেলেদের বাপ নেই ব'লে তাদের দুরবস্থা বুঝিয়েছেন, কিন্তু তারও যে পিতার অভাবেই সকল ভবিষ্যৎ মুহূর্তে চূর্ণ হ'য়ে গেছে সে-কথা কেউ মনে করেনি। সকলের সব নির্ভরতা শেষ পর্যন্ত যেন কেমন-একটা নিষ্ঠুর দাবিতে গিয়ে পর্যবসিত হয়েছিলো। কাজেই বাড়ি ফেরার জন্য যে কোনো ব্যাকুলতা আসতে পারে সেটা ছিলো তার স্বপ্ন। তারপর দারিদ্র্যের নাগপাশ এড়িয়ে যখন একটু শান্তির আভাস দেখা দিয়েছিলো জীবনে, মা-র বিষণ্ণ ব্যথিত চোখে একটা আনন্দের আভা ঝিলিক দিয়ে উঠে-ছিলো—ভাই-বোনেদের জড়িয়ে আস্তে-আস্তে গ'ড়ে উঠছিলো এক নতুন

জগৎ, এমন দিনেই এলেন স্ত্রী, দারিদ্র্যের অংশ এরা যতই ভোগ ক'রে থাক, ধনের অংশে অংশীদার তো একমাত্র তিনি। হাস্যমুখে সে-কথাটি নিবেদন ক'রে শ্বশুর স্বয়ং এলেন কন্যাকে রাখতে। সংসারে আবার নামলো কালো ছায়া— অভাবের দিনের প্রচ্ছন্ন স্নেহ আবার মা-র মনে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিলো, স্বাচ্ছন্দ্যের শান্তিতে ভাইবোনেদের শীর্ণ শরীর-মন উজ্জীবিত হয়েছিলো দাদাকে ঘিরে-ঘিরে— কিন্তু স্ত্রী এসে আবার নিঃশেষে মুছে দিলেন সেই শান্তি। স্বামী যে তার—তার বরাতের জোরেই যে আজ সকলে খেতে পাচ্ছে, সে-কথাটা তার মূঢ় মনের উপর পিতা-মাতা খুব ভালো-ভাবেই ছাপ দিয়েছিলেন—সেটা সে ভালো ক'রেই সকলকে উপলব্ধি করালো।—এই তো তার বাড়ি ফেরার ইতিহাস।

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়সমাজ সব থেকেই নিজেকে সে একেবারে নির্বাসিত ক'রে রেখেছিলো, দুঃখের দিনে এদের চিনে নেবার অবকাশ হয়েছিলো তার। কোনো প্রবৃত্তি ছিল না আর সঙ্গলাভের, কিন্তু জীবনের প্রায় প্রান্তে এসে মরুভূমির মধ্যে এ কী উদ্যান আবিষ্কার করলো সে?

কিন্তু ভালোবাসাও যত, দুঃখটাও কি ততই তীব্র নয়? প্রথমটায় এ-সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অচেতন ছিলো তার মন, মনের মধ্যে এ-কথাটাই তখন বড়ো ছিলো—'এই তো যথেষ্ট, এই যে তাঁকে দেখতে পেলাম, ভালোবাসলাম, যা চেয়েছিলাম সারা জীবন ধ'রে, মূর্তিমতী হ'য়ে সে যে দেখা দিলো, এই কি যথেষ্ট নয়? এমন মধুর, এমন উজ্জ্বল— হৃদয়বৃত্তিতে এমন যিনি পরিপূর্ণ তাঁর কাছে তো নিজেকে বিকিয়ে দিয়েই সুখ। কী তিনি দিলেন, কী হবে তার হিসাব-নিকাশে। সূর্যের উত্তাপে ফুল ফোটে, পরিপূর্ণ চাঁদ সমুদ্রে জোয়ার আনে—তিনিও তাঁর সংস্পর্শ দিয়ে বিকশিত করলেন আমাকে—আমার প্রাণ-প্রাচুর্যের উৎস হ'য়ে রইলেন।' কিন্তু ক্রমশ মন যেন হাত পাততে চাইলো বিনিময়ের আশায়। কিছুকাল পরে সুশান্ত স্পষ্ট বুঝতে পারলো, যা মানুষের প্রতি নিশ্বাসের কামনার ধন, তাকে পাওয়া ঠিক এ-ভাবে পাওয়া নয়। যৌবনে এই বন্ধুতাই ছিলো তার আদর্শ—মেয়েরা যখন তাকে অন্য ভাবে পেতে চেয়েছে তার অবাক লেগেছে, কিন্তু এতদিনে সে বিশ্বাস করলো সত্যিই সে-পাওয়া পাওয়া নয়, যাকে সত্যি ক'রে চাওয়া যায়, তাকে আরো চাই, আরো নিবিড় ক'রে চাই, সমস্ত দেহ-মন দিয়েই আমরা তাকে প্রার্থনা করি—এবং সুশান্তর

দেহমনের এই যে একাগ্র শুচিতা—এ কি সে এই পাওয়াটির জন্যই এতদিন রক্ষা ক'রে এসেছিলো? তার হৃদয় সর্বতোভাবে যা গ্রহণ করতে পারে, তা কি কেবলমাত্র এই মেয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়? যাঁকে একটু ছুঁতে পারলেও সমস্ত জীবন-মন শান্তিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে পারতো, সে-মানুষ কি একমাত্র তিনিই নন? আস্তেআস্তে এই চেতনা তাকে যেন একটা অশান্তিতে নিয়ে আসতে লাগলো। কেমন-একটা ব্যর্থ ব্যাকুল কান্নার ঢেউ যেন ক্রমাগত গড়িয়ে-গড়িয়ে ওঠা-নামা করতে লাগলো তার বুকের মধ্যে।

আর তিনি? তিনি তাঁর পরিবেশে শান্ত সমাহিত। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আছে, লোভ নেই, চাইবার আছে, না-পাবার বেদনা নেই। সকলের প্রাণকেন্দ্র হ'য়ে আপন হৃদয়ের মহিমাতেই তিনি মহান। তাঁর বন্ধুতার নিবিড় উত্তাপে এই যে তিনি সুশান্তকে পূর্ণ ক'রে রাখছিলেন, এও তাঁর প্রশস্ত প্রশান্ত হৃদয়েরই একটা প্রকাশ। তিনি কি জানেন না, তিনি কি বোঝেন না—বোঝেন না একটা মানুষ এই যে দিনের পর দিন এমন একটা ব্যাকুলতা নিয়ে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে-ছুটে আসে, সে কিসের জন্য? তিনি কি কিছুই বোঝেন না? সুশান্তর ঘন পল্লবে ঘেরা বড়ো-বড়ো চোখের দুটি কালো মণিতে কী লেখা আছে, কখনো কি তিনি তা পড়েননি? হয়তো ভালোবাসা যে কোথায় কত উঁচুতে উঠতে পারে, এই আবেগকে তিনি সেখানেই তুলে দেবার সহায়তা করেন। তাঁর অসীম নিথরতা হয়তো এ কথাটাই জানতে চায় যে অস্তিত্বটা কিছু নয়, সেটা ফাঁকা—আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন, সেটাই চরম, সেটাই সব। সেখানে যাও, সেখানেই শান্তি, সেখানেই মানুষের বঞ্চিত হৃদয়ের পরম আশ্বাস।

সুশান্ত ভাবতে পারে না, প্রাণ-মন অস্থির হ'য়ে ওঠে। কী হবে, কী হবে—এর পর কী—এ'ক'টি কথা তাকে অবিরাম শ্রান্ত-ক্লান্ত ক'রে ফেলে—সে যেন চূর্ণ হ'য়ে যায় একটা ব্যর্থ ভালোবাসার গুরু ভারে। তিনি যত্ন করেন, ভালোবাসেন—অবসরের সময়গুলোকে ভরিয়ে রাখেন নিজের অস্তিত্ব দিয়ে—কিন্তু এ কতটুকু! এ-বাড়িটা যেন তারও বাড়ি, এমনিভাবে ব্যবহার করেন তিনি—মিশিয়ে নেন নিজেদের সঙ্গে। সংকোচ করবার অবকাশ নেই, ছোটো হবার আশঙ্কা নেই—কিন্তু তাঁকে পাবার অনতিক্রম্য বাধারও তো ক্ষয় নেই কোনোদিন। নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে সুশান্তর। মনকে একাগ্র করে ছবির রেখায়, ভুলে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে—এক সময়ে তাকিয়ে

দেখে, কাগজভরা এ কার মুখ? এতক্ষণকার সকল শক্তির সমাধি দিয়ে এ সে কী সৃষ্টি করেছে? দুই চোখ ঝাপসা হয় – সকল শক্তিকে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে ছড়িয়ে ফেলে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। কেমন ক'রে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জানে না—একটি অতি আকস্মিক মূর্তির আকর্ষণ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে কেবল।

মনের যখন এ-রকম একটা উদ্দাম অবস্থা—সেই সময়ে একদিন প্রবলধারায় বৃষ্টি নামলো। চারদিক অন্ধকার ক'রে দিলো কালো মেঘ। আপিশের বন্ধ দরজার কাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সুশান্ত। কী মনে হ'লো, কী মনে করলো, দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এলো রুদ্ধশ্বাসে। রাস্তায় জল জ'মে গেছে এতখানি—ট্রাম নেই, বাস নেই, একটা ট্যাক্সি, একটা রিকশ—সব যানবাহন অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—একটা প্রাণীর সাড়া পর্যন্ত মেলে না, এই ঝাপসা পৃথিবীতে সেই প্রবল বর্ষণ মাথায় ক'রে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করলো দক্ষিণ দিকে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ বেয়ে-বেয়ে নামতে লাগলো জলের ধারা।

সেই বৃষ্টিস্নাত অদ্ভুত এক মূর্তি নিয়ে তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম ক'রে যখন সে এসে পৌঁছলো তাঁর দরজায়—কেউ দেখলে হয়তো আঁৎকে উঠতো। দরজায় আস্তে হাত রাখতেই ভেজানো দরজা খুলে গেলো। নিস্তব্ধ নিঃশব্দ বাড়ি। বসবার ঘরটায় ঢুকে থমকে দাঁড়ালো—কারো সাড়া পাওয়া গেলো না। শোবার ঘরের নীল পরদাটা ঈষৎ আন্দোলিত হ'লো হাওয়ায়—দেখা গেলো এক রাশ কালো লম্বা চুল মেলে দিয়ে তিনি শুয়ে আছেন খাটে। বাদামি রংয়ের একখানা শাড়ির আঁচল খ'সে পড়েছে—হাতের আঙুলে পেজ-মার্ক করা একখানা বই প'ড়ে আছে পাশে। গভীর নিদ্রায় মগ্ন তিনি। সুশান্ত একটু ভাবলো না, সেই জলসিক্ত দেহে ঢুকলো এসে শোবার ঘরে—কাছে, একেবারে খুব কাছে এসে দাঁড়ালো, তারপর ব্যগ্র ব্যাকুল দুই বাহু বাড়ালো আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে—পরমুহূর্তেই শিহরিত হ'য়ে দু'পা পিছিয়ে গেলো। এ কী! এ সে কী করতে যাচ্ছিলো? এই স্থূল শরীরটার কি এতই ক্ষমতা যে তাকে হার মানতে হবে সেখানে? যিনি আমার আত্মা, যিনি আমার হৃদয়ের অপার্থিব সম্পদ, তাঁকে আমি নামাবো এই পৃথিবীর ধুলো-মাটিতে!

সমস্ত শক্তি সে একাগ্র করলো হাতের মুঠোয়--দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকে যেন সে পিষে ফেললো তার চাপে—তারপর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই আর নিজিকে—সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে শেষ বারের মতো একবার দাঁড়ালো, তাকিয়ে রইলো খোলা শক্ত কাঠের দরজার দিকে—তারপর বৃষ্টির জলে আর চোখের জলে মেশা একটা বিস্বাদ জলধারা গড়িয়ে পড়লো তার গাল বেয়ে।

সহসা ঘুম ভেঙে গেলো ভদ্রমহিলার। কেমন-যেন একটা বিচ্ছেদের কষ্টে ভ'রে উঠলো মন—কে যেন চ'লে গেলো, কে যেন মুছে গেল জীবন থেকে—কে? কে? দুই চোখ মেলে রেখে তিনি খুঁজতে লাগলেন তাকে—অনুভব করলেন, যা গেলো তা আর আসবে না তাঁর জীবনে। অকারণে তাঁর চোখও জলে ভ'রে উঠলো।

অবিশ্বাস্য

এতোক্ষণে ভালো ক'রে গুছিয়ে ব'সে সহযাত্রীটির দিকে নজর পড়লো সিস্টার মালতী সেনের। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক শকের মতো আপাদমস্তক চমকে উঠলো সে। হয়তো বা তার সেই চমকানি ভদ্রলোকের দৃষ্টি এড়ালো না, একটু যেন অবাক হ'য়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন। মালতী সেন তাড়াতাড়ি আবার গুটিয়ে ফেললো এইমাত্র বিছিয়ে-বসা বিছানাটি, এইমাত্র বাঙ্কের তলায় ঠেলে-রাখা স্যুটকেসটি নিচু হ'য়ে টেনে নিলে হাতে, উঠে দাঁড়ালো চটপট,— তারপর দ্রুতহাতে দরজার হাতল ঘুরিয়ে নেমে যাবার চেষ্টা করতেই ব'সে পড়লো ঝাঁকানি খেয়ে। গাড়ি স্পীড দিয়েছে ততক্ষণে।

ব্যস্ত হ'য়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কি হ'লো ?' পরিষ্কার স্পষ্ট গলা, এতোটুকু জড়তা নেই, দ্বিধা নেই। পরিচয়ের এতটুকু চিহ্ন নেই কোনোখানে। লজ্জা পেলো মালতী। কান গরম হ'য়ে উঠলো। স্বভাবতই গোলাপী গাল আরো লাল হ'লো। মুখ তুলতে পারলো না সে, কুণ্ঠিত গলায় বললো, 'কিছু না।'

'কারো আসবার কথা ছিল ? ভুলে ফেলে এসেছেন কিছু ?' ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন হ'য়ে আরো খোঁজ নিতে চেষ্টা করলেন। তাঁর মৃদু গম্ভীর গলা মালতীর বুকের মধ্যে হাতুড়ির আঘাত দিল।

আবার কুণ্ঠিত গলায় আস্তে বললো, 'না, কিছু না।' গুটানো বিছানাটা ধীরে ধীরে পেতে নিল সে, স্যুটকেসটা ঠেলে দিলো বাঙ্কের তলায়। বুকের কাঁপুনি তখনো থামেনি। কিন্তু আত্মস্থ হয়েছে অনেকটা, অনেকটা শান্ত করতে পেরেছে নিজেকে। জানলায় যতটা সম্ভব মুখ বাড়িয়ে তাই দেখতে পাচ্ছে আকাশটাকে, আকাশের তারাগুলোকে। কিন্তু ভদ্রলোক একা কেন ? একাই চলেন নাকি এখন ? ভালো হ'য়ে গেছেন ? সত্যি ভালো হ'য়ে গেছেন ? আর তাই ব'লেই কি চিনতে পারলেন না মালতীকে ? না কি ভান্ ? না কি ঘেন্না ? কি ? না কি সেই জীবনের সঙ্গে এই জীবনের কোনো মিল না থাকায় তার স্মৃতিটাও মুছে গেছে হৃদয় থেকে ? বুকের ভেতরটা কোথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। শুধু তাই নয় চোখ দু'টো পর্যন্ত ঝাপসা হ'য়ে উঠলো তার। আট বছর ধ'রে যে মেয়ে কত মৃত্যু দেখেছে, কত কান্না শুনেছে,

অধৈর্যহীন হ'য়ে কত ব'সে থেকেছে রোগীর শিয়রে, কঠিন হ'য়ে ফিরিয়ে দিয়েছে হৃদয়ের সব আবেদন, আজ সাতাশ বছর বয়সে একটা মানুষের এই একটু সামান্য চিনতে না পারার বেদনাতেই, যেন কেমন অভিভূত হ'য়ে পড়লো। কিন্তু মালতী নিজেই কি মনে রেখেছে কারো কথা? তবে কী জন্যে তার এই অভিমান? সে স্বাধীন মানুষ, একা মানুষ, যা চেয়েছিল তা-ই হয়েছে। এই তো কেমন ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় একা বসে দিল্লি যাচ্ছে একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে, যাচ্ছে বিদেশ যাবার একটা স্কলারশিপ জোগাড়ের তদ্বির করতে। হাসপাতালের নিম্নতম নার্স থেকে উচ্চতম সিস্টারে পরিণত হয়েছে। তবে আর এখন কার তোয়াক্কা রাখে সে? কাকে চায়? কী দরকারে? একদিন সবাই মিলে যত শত্রুতা করেছিলো সকলকে তার যথাযোগ্য শিক্ষা দিতে পেরেছে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, একা হ'য়ে তাদের বুঝতে দিয়েছে যে সে-ও মানুষ। না, একদিনের জন্যও ভাবেনি ভুল করেছে, অন্যায় করেছে, তবে আর কিসের দুঃখ।

তাইতো, কিসের আর দুঃখ তার। কিন্তু তবু ঝড়ের পাখির মতো থর থর করছে সে, মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে নেমে যেতে চাইছে চলন্ত ট্রেন থেকে, গলা তার শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠেছে। কেন? ভয়ে? বিস্ময়ে? আতঙ্কে? না কি আর কিছু? কিন্তু ভয় তো আর নেই তার। আতঙ্কও নেই। ভয় করেছিলো সেদিন, যেদিন মা কান্নাভরা গলায় বলেছিলেন, 'তবে তাই স্থির?'

বাবা বলেছিলেন, 'তাই স্থির।'

তারপর মাকে ফুলেফুলে কাঁদতে দেখে বাবা নিষ্ঠুরের মতো আরো বলেছিলেন, 'বাড়াবাড়ি করো না। সর্বানন্দবাবু জেলা-জজ, মান সম্মান, প্রতিপত্তি, টাকাকড়ি কিসের অভাব তাঁর? ঢাকা শহরে কতো বড়ো বাড়ি, ছেলেমেয়েরা সব কতো ভালো ভালো জামা কাপড় পরে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, ঠাকুর, চাকর, আশ্রিত, পালিত একেবারে গম গম করছে বাড়ি। মেয়ে কি তোমার দুঃখে থাকবে?'

মা বলেছিলেন, 'চাইনা, চাইনা সে সুখ, মেয়ে আমার মরে যাক, তবু আমি চাই না।'

দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে মা বাবার সেই সব কথা শুনতে শুনতে বুক বন্ধ হ'য়ে এসেছিলো সেদিন মালতীর। সে-দিনের সেই ভয়ের তুলনা ছিলো না

কোনো। ভয় শুধু তারই হয়নি ভাই-বোনেরাও ভয়ে চুপ হ'য়ে গিয়েছিলো। প্রতিবেশীরা বলেছিলো, 'লোকটা কি চামার। এমন প্রতিমার মতো মেয়েটাকে শেষে—'

সারাবাড়ি থমথমে হ'য়ে গিয়েছিলো, যেন মধ্যাহ্ন সূর্যকে গ্রাস করছে গ্রহণ। মালতী মা-র কোলের উপর ঝাঁপিয়ে দাপিয়ে উঠেছিলো, 'না, না, এ আমি পারবো না, তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেলো, কেটে ফেলো, পদ্মায় ভাসিয়ে দাও।' আর তারও পরে একদিন সকলের চোখ এড়িয়ে সে বেরিয়ে গিয়েছিলো বাড়ি থেকে, উল্টোদিকের বাড়িতে কখনো সখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা ভদ্রলোকটির পা জড়িয়ে ধ'রে চোখের জলে ভেসে গিয়ে বলেছিলো, 'শুনেছি আপনি বিপত্নীক, আপনি আমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে পালিয়ে যান, আমি সমস্ত জীবন আপনার এই ঋণ মনে ক'রে দাসী হ'য়ে থাকবো।' দাদা, পিতার যোগ্য পুত্র, তখুনি ধ'রে এনে মেরে বাঁকিয়ে দিয়েছিলো পিঠ। তারপর সেই যে চুপ হ'য়ে গিয়েছিলো সে আর কোনোদিন একটা কথা বলেনি। সব জমা ক'রে রেখে দিয়েছিল বুকের ভেতর। তারপর পুরো দশটি হাজার টাকা বাবার হাতে তুলে দিয়ে পুত্রবধূ কিনলেন সর্বানন্দবাবু। টাকাটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সেই প্রথম মেয়ের জন্য কেঁদে উঠেছিলেন মালতীর বাবা, হয়তো বা নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাও হয়েছিলো কে জানে। ততক্ষণে উৎসর্গ হ'য়ে গেছে।

বিশেষ কোনো আয়োজন ছিলো না উৎসবের। সর্বানন্দবাবু দুজন চাপরাশি আর একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নিয়ে বিয়ে দিতে এসেছিলো ছেলেকে। অনুষ্ঠান যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হ'লো। স্বামীর সঙ্গে মালতীর নির্জন হ'তে দেরি হ'লোনা। আর একা হওয়া-মাত্রই মালতী কেঁপে উঠলো থরথর ক'রে, শৈলেনের অপলক দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে প্রায় দেয়ালে মিশে দাঁড়ালো। শৈলেন এবার নামিয়ে নিল তার চোখ। তারপর মালতীর ভয় দেখেই হোক, যে কারণেই হোক শান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। আর মালতী, তার নববিবাহিত ভীত বিবর্ণ স্ত্রী সরে এলো দেয়ালের আশ্রয় ছেড়ে, কেমন জানি গোলমেলে লাগলো তার সমস্ত ব্যাপারটা, কেন জানি মনে হ'লো সব কথা সে ভুল শুনেছে, ভুল ভেবেছে, সবাই যেন এতোদিন ধ'রে এই অসাধারণ সুন্দর মানুষটার বিরুদ্ধে সব কথাই বানিয়ে বলেছে, হিংসে ক'রে

ধোঁকা দিয়েছে তাকে। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এসে, গরদের ধুতি পাঞ্জাবী পরা লম্বা হ'য়ে শুয়ে থাকা ঋজু শরীর, বলিষ্ঠ যুবক স্বামীটির দিকে তাকিয়ে যেন সম্মোহিত হ'লো, ভালো লাগলো, এতোদিন ধ'রে যতো কান্না কেঁদেছে, যত ভয় সয়েছে সব যেন সার্থক মনে হ'লো সেহ মুহূর্তে। ইচ্ছে করলো—কী ইচ্ছে করলো তা সে জানে না।

নরম আলো জ্বলছে প্রদীপের, তার ছায়া কাঁপছে দেয়ালে, কেমন সুন্দর সাজানো ঘর, নতুন গন্ধে ভরা। মালতী সাহসে ভর ক'রে খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। আরো, আরো কাছে। আর তারপরেই একটা আর্তনাদ ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

সারাবাড়ির লোক দৌড়ে এসে ভিড় করলো সেখানে, সব আগে এলেন সর্বানন্দবাবু নিজে। তিনি বোধহয় সব সময়েই সচকিত ছিলেন, হয়তো বা ঘুম ছিলোনা চোখে। আজকের সিস্টার মালতীর মন নিয়ে সেই মালতী সেদিন দেখেনি তাঁকে নৈলে সে তাঁর সারা চেহারায় একটা ঘাতকের নিষ্ঠুরতা না দেখে অব্যক্ত যন্ত্রণার কাতরতাই দেখতে পেতো। বাজের তাড়ায় একটা ভীরু পায়রার মতো কম্পিত পুত্রবধূকে যখন তিনি বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'কি মা। কী হয়েছে? ভয় পেয়েছ? কোন ভয় নেই, লক্ষ্মী মা আমার।' তখন তার কথার মধ্যে চাতুর্য না দেখে মাধুর্যই খুঁজে পেতো। সেই রাত্রেই তিনি তার দু'হাত ধরে চোখের জলে ভেসে বলেছিলেন, 'আপন সন্তানের মঙ্গল চেয়ে আমি পরের সন্তানের জন্য যে দুঃখ ডেকে আনলাম তার জন্য ঈশ্বর আমাকে যে সাজাই দিন, তুমি কিন্তু ক্ষমা কোরো। যে যাই বলুক, আমি জানি এ অবস্থা ওর সাময়িক, তোমার যত্ন পেলে সঙ্গ পেলে নিশ্চয় ভালো হ'য়ে উঠবে। ডাক্তার বলেছেন'—হঠাৎ মালতী মুখ তুলে তার মস্ত বড়ো বড়ো দুই চোখ মেলে শ্বশুরের মুখের দিকে তাকালো, আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন আগুন জ্বলে উঠলো চোখে। সর্বানন্দবাবু মুহূর্তে চুপ হ'য়ে গেলেন।

শৈলেন তাকে কী করেছিল, কি জন্য এতো ভয় পেয়েছিলো সে, আজ সে সব ঝাপসা। সবাই যখন চলে গেল, ঘরে যখন শুধু সে আর সর্বানন্দবাবু রইল তখন দেখা গেল শৈলেন কাঁদছে। কান্নার বেগে ফুলে ফুলে উঠছে তার শরীর, শিশুর মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে। সর্বানন্দবাবু মাথায় হাত দিয়ে

ব'সে পড়লেন মেঝেতে, কপালে করাঘাত ক'রে বললেন, 'হা ঈশ্বর। এ আমার কী দুর্মতি হ'লো, কী করলাম আমি।' মালতী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, বাইরে কয়লা রাখা চৌবাচ্চার ধারে ব'সে রইলো চুপচাপ। দুঃখে নয়, ক্ষোভে আর ক্রোধে তার আঠারো বছরের সমস্ত শক্তি যেন একত্রিত হ'লো হাতের মুঠোয় আর মনের কোনো নিঃশব্দ সংকল্পে।

পরের দিন যখন নতুন বৌ হ'য়ে ও বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালো, তার সাজসজ্জা দেখে চমকে উঠেছিলেন শাশুড়ী। অবাক হ'য়ে বলেছিলেন, 'এ কী! এমন খালি কেন গা হাত পা? গয়না কোথায় বৌমার?' মালতী মুখ তুলে পরিষ্কার গলায় বলেছিলো, 'খুলে রেখেছি।'

এইমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে পিঁড়ির উপর, তার মুখে এমন স্পষ্ট জবাব তিনি আশা করেননি, আর জবাবের জন্যেও বলেননি কথাটা। বৌকে তাঁরাই গয়না পাঠিয়েছিলেন গা মুড়ে, বেনারসী পাঠিয়েছিলেন পরে আসবার জন্যে, তার বদলে এমন দুঃখী সাজ দেখেই কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিলো মুখ থেকে। জবাব শুনে হকচকিয়ে বললেন, 'পরোনি কেন?'

চোখে চোখে তাকিয়ে মালতী বললো, 'শাঁখাটাও খুলে রাখতে চেয়েছিলাম, মা দিলেন না।' একথা শুনে শাশুড়ার কেমন লেগেছিলো তা মালতী জানে না, কেবল দেখেছিলো দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে উদ্গত কান্নাকে তিনি বুকের ভেতর পাঠিয়ে দিলেন।

শুধু মালতীই নয়, গঞ্জনা তাকে সবাই দিয়েছিলো। পাগল ছেলেকে বিয়ে দেবার জন্য নিন্দায় অভিযোগে পঞ্চমুখ হ'য়ে সবাই শেল বিঁধে দিয়েছিলো শৈবলিনীর বুকে। সুখী শৈবলিনী, যে শৈবলিনীকে একদিন সকলে ঈর্ষা করতো। সেটা যথেষ্ট উপভোগ করেছিলো মালতী। আর শৈলেন? কী বুঝেছিলো সে কে জানে, শান্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলো মা-কে। যেন পৃথিবীর সব দুঃখ থেকে সে আড়াল করবে তাঁকে। কান্নাভাসা গলায় মা বলেছিলেন, 'সন্তু, বৌ দেখেছিস? তোর বৌ? কী সুন্দর!' সন্তু অপলকে শুধু তার মা-কেই দেখেছিলো। মা-কেই সে চায় বেশী, মা-ই তার একমাত্র বন্ধু, মা-ই সব।

তবু দিন কয়েকের মধ্যেই মালতী বুঝতে পারলো শুধু মা-ই নয়, স্ত্রীর প্রতিও অনুরক্ত হয়েছে নির্বোধ নিঃশব্দ মানুষটা। বলবার তার ভাষা নেই,

কিন্তু দৃষ্টি যেন অর্থ খুঁজে পেয়েছে। মালতীকে দেখলে তার দুই চোখে আলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু পাগলের আগ্রহও পাগলামি। মালতী স্বামীর ধার দিয়েও গেলো না। বিয়ের হাঙ্গামা মিটে যাওয়া মাত্রই সে বাড়ির অনেক ঘরের একেবারে প্রান্তের ঘরে গিয়ে ঠাঁই নিল। তার চলাফেরা, থাকা, খাওয়া, সমস্তটার মধ্যেই এমন একটা মরণান্ত জেদ ছিলো যে কেউ কিছু বলতে সাহস পেতো না। সর্বানন্দবাবু বা তাঁর স্ত্রী কিংবা তাঁদের ছেলেমেয়েরা সবাই শান্ত ছিলো, ভদ্র ছিলো, সচেতন ছিলো নিজেদের অপরাধের জন্য, মালতী হয়তো সেই সুযোগটাই নিয়েছিলো খুব ভালো ক'রে। বাপ-মাকে ত্যাগ করেছিলো তাঁদের বাড়ি ত্যাগ করে, এদেঁর ত্যাগ করলো এদেঁর বাড়ীতে থেকে। লজ্জার মাথা খেয়ে সভয়ে শাশুড়ী একদিন বললেন, 'সারাদিন ঘোরো, ফেরো, কাজ করো, না হয় করলে, রাত্রিটা অন্তত ওর কাছে থেকো। আমার ভাগ্য দোষে যত ক্ষতিই হোক, তবু ছেলে তো আমার উন্মাদ নয়?

'নয় বুঝি?' শাশুড়ীর দিকে তীর্যক দৃষ্টি হেনে ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসেছিলো মালতী।

'না নয়।' এই প্রথম রেগে উঠেছিলেন তিনি, 'কিন্তু এবার তুমিই তাই করবে। তোমার জন্যই ওর সর্বনাশ হবে।'

'বিয়ে দিলেন কেন?' রূঢ় হ'য়ে মুখে মুখে ব'লে উঠল মালতী। শৈবলিনী বললেন, 'তার কৈফিয়ৎ আমার কাছে চেয়ো না। আত্মা থাকলে তাকে জিজ্ঞেস কোরো। একটা অসহায় মানুষ, শিশুর মতো যে নির্ভরশীল, তার সঙ্গে তোমার এই প্রতিহিংসা কিসের? আমি বলছি একদিন এজন্যে শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।'

'অকারণেই ভগবান আমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন,' উদ্ধত মালতী শাশুড়ীর চোখের জলে একটুও ভেজেনি, 'কারণ দেখিয়ে আর লাভ কী। সত্য কথা বলাই ভালো আপনার পাগল ছেলেকে ভালোবাসার মতো মনের জোর আমার নেই, তাকে আমি কখনো কোনোদিন স্বামী বলে ভাবতে পারবো না।'

প্রায় পঞ্চাশের একজন দুঃখী পোড়া মহিলাকে প্রায় উনিশের একটি মেয়ে যে কী ক'রে অমন কঠিন কথা বলতে পারলো কে জানে। দু'টি জলভরা ঘোলাটে চোখ মেলে শাশুড়ী তখন তার মুখের দিকে যেন কেমন ক'রে তাকিয়ে রইলেন, সে দৃষ্টি আজো ভোলেনি মালতী। আরো একজন তাকিয়েছিলো।

শৈলেন। তার পাগল স্বামী। জানালায় বসেছিলো চুপচাপ। উদাস, গম্ভীর। একখানা বই আছে হাতে। সহসা দেখলে কে বলবে লোকটা পাগল, নির্বোধ। খেতে না দিলে খায়না, স্নান না করালে জল ঢালে না। এমন কি জামা কাপড়টা পর্যন্ত ছাড়তে জানে না নিজে। অকস্মাৎ কী ভেবে সে ও মুখ ফিরিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মালতীর চোখের দিকে তাকিয়েছিলো অনেকক্ষণ।

তারপরেই ধাত্রীমাসি। পাশের বাড়ীর আত্মীয়া, বেড়াতে এসেছিলেন ঢাকাতে। কালো কুলো মোটাসোটা মানুষ, আসর জমানো। এ বাড়ির কেউ পছন্দ করতো না তাকে, কিন্তু মালতীর ভালো লাগলো। হয়তো এ বাড়ির বিরোধিতা করবার জন্যই ভালো লাগলো। কিংবা তার স্বাধীন জীবনের আকর্ষণও হ'তে পারে। ধাত্রীমাসি বললো, 'কেন মেয়েরা কি মানুষ না? মন প্রাণ নেই? ঘটি বাটি নাকি যে টুটা ফুটা ভাঙা ফাটা সব একত্র করে রাখলেই হ'লো? তুই কেন সারাজীবন জ্বলবি এদের সঙ্গে? ত্যাখনা আমি কেমন আছি?' ঠোঁট উল্টে মুখ ভ্যাঙচালেন, 'ডাক্তার বলেছে বিয়ে দিলে ভালো হবে, আহা রে আমার—'

এইসব ব'লে ব'লে সেই ধাত্রীমাসিই তাকে স্বাধীন জীবনের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর একদিন কাউকে কিছু না ব'লে পালালো সে। শোনা গেছে তাই নিয়ে ঢাকা শহরে তোলপাড় হয়েছিলো। জজ সাহেব আর মুখ দেখাতে পারেননি লজ্জায়, জজ সাহেবের স্ত্রী কেঁদে কেটে শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন, আর তাঁদের পাগল ছেলে স্ত্রীর বিরহে সত্যি সত্যি বদ্ধ উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিলো। মাসি মুখ নেড়ে নেড়ে দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে বলেছিলো, 'খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে। যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুড়। এর পরে এদের মতো আর সব বাপ-মায়েরাও একটু সাবধান হ'তে শিখবে।'

কারো বাড়ির ঘরের বৌ বেরিয়ে গেছে, মুখে চুণকালি পড়েছে, এর মধ্যে মাসি যে কী এতো আনন্দ পেলো কে জানে। আসবার সময় মালতী প্রথমে শুধুমাত্র তার নিজের দু'চারখানা শাড়ি ব্লাউজ বগলে নিয়েই চলে এসেছিলো মাসির কাছে। মাসি চোখ বড় করলো, 'সে কী কথা রে বোকা মেয়ে। যা পারিস নিয়ে আয়। সম্বল চাই না? আর রেখেই বা

আসবি কার জন্যে? কে তোর আপন? কাজেই নিজের গায়ের ভারি ভারি সোনার গহনাগুলোও সঙ্গে এনেছিলো সে, নগদ টাকাও হাতের মুঠোয় মন্দ ছিলো না। তারপর ভোররাত্রে, কাকপক্ষী জাগবার আগেই মাসির সঙ্গে উধাও হ'লো।

এখনো সে দিনটার কথা পরিষ্কার মনে করতে পারে মালতী। এতোদিন পরেও একটু ফিকে হয়নি। ইষ্টিমারে উঠে ধু ধু জলের দিকে তাকিয়ে মুচড়ে উঠেছিলো বুকটা, দুই চোখের জলে দিগ্বিদিক ঝাপসা হ'য়ে গিয়েছিলো। আর এমন আশ্চর্য, যাদের উপর প্রতিশোধ-স্পৃহায় এমন ক'রে চিরকালের জন্য ঘর ছাড়লো সে তাদের জন্যই এক অনির্বচনীয় কষ্টে দাপিয়ে উঠেছিলো মনটা। আর তার সবচেয়ে যে বড়ো শত্রু, তার পাগল স্বামী তাকে মনে পড়েই যন্ত্রণাটা যেন আরো দুঃসহ হ'য়ে উঠলো। সেই কষ্ট তাকে শুধু সেইদিনই ছিন্নভিন্ন করেনি, অনেকদিন, অনেকরাত ভাসিয়ে দিয়েছে চোখের জলে। মালতী জানেনি, বোঝেনি, কখন অলক্ষ্যে বিধাতা রং ধরিয়েছিলেন তার মনে। কাঁচা মনের সতেজ ডালে কখন ফুল ফুটিয়েছিলেন। কখন কোন মুহূর্তে সে ঐ অর্ধবুদ্ধি সুন্দর যুবকটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো। গভীর প্রেম।

কলকাতা এসে প্রথমে মালতী ধাত্রীমাসির বাড়িতেই উঠলো। এক সরু রাস্তার সরু বাড়ি। নর্দমার পাশ দিয়ে রাস্তা থেকে উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি, টানা বারান্দার বাঁ হাতে তার ঘর। দরজায় তীর আঁকা—নেম প্লেট—'এই যে আসুন, এখানেই আপনাদের সুশিক্ষিতা নার্স—সুলোচনা দেবী থাকেন।' অত দুঃখেও সেদিন মালতীর হাসি পেয়েছিলো। পরে দেখলো ঠিক ঐ রকম নেম প্লেট শুধু সুলোচনা দেবীরই নয়, পর পর চারখানা ঘরেই ঐ একই রকম টাঙানো। মানে, চারজন ধাত্রীবিদ্যার পারদর্শিনী এখানে থাকেন। আরো পরে বুঝলো স্থানটা খুব পবিত্র নয়। ধাত্রীমাসির কোনো বিবেক নেই, তার দংশনে সে কখনো কাতর হয় না। টাকা রোজগারের জন্য সে যে কোনো অন্যায়েই প্রবৃত্ত হ'তে পারে। আর মালতীর প্রতি এই মনোযোগের মধ্যেও যে এর চেয়ে আরো কোনো অন্যায়ের বীজ লুকানো নেই তাই বা কে জানে। তবু

রক্ষে, দু'একদিনের মধ্যেই একটা হাসপাতালে কাজ শিখতে ভর্তি ক'রে দিল তাকে। খাওয়া থাকা ফ্রি, তবে মালতী বুঝলো কাজটা একেবারেই নিম্নতম। তা হোক, তবু ধাত্রীমাসির কবল থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার এই মাটিটুকু পেয়েই বর্তে গেল সে। চাকা চাকা সোনাদানা আর নগদ টাকার ভারি অঙ্কটা ধাত্রীমাসির জিম্মাতেই রয়ে গেল চিরকালের জন্য।

সেই নিম্নতম কাজ থেকে, নিজের যোগ্যতায় আজ তো এখানে এসে পৌঁচেছে মালতী? তার নিজের জগতে তার সুনাম সম্মান সবই অক্ষুণ্ণ। হাসপাতালে সিস্টার সেনের নাম আজ সকলের মুখে মুখে। দুদিন বাদে বিদেশেও যাবে, ফিরে এসে এরচেয়েও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এত দিনে সব ভুলেছে, সব দুঃখ ভুলেছে। নিজের মনে, নিজের সুখে ভালোই তো ছিলো সে, কেবল মাঝে মাঝে এর ওর কাছে নানাভাবে নানা খবর শুনে যতটুকু বিচলিত হওয়া। আগে ধাত্রীমাসিই অবিশ্যি সব কথা পৌঁছে দিতো। তার কাছেই শুনেছিলো সর্বানন্দবাবুর কপাল ভালো, ছেলেটা বুঝি শেষে সেরেই উঠ্‌লো। যেন বড়ো দুঃখের খবর। মেয়ের বিয়ে হয়েছে মস্তলোকের সঙ্গে, আরো কত কী? এ-ও শুনেছিলো বৌকে ধরাবার জন্য নাকি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। ধরতে পারলে কী করবেন? মনে মনে ভেবেছিলো মালতী, কিন্তু মাসিকে জিজ্ঞেস করা হয়নি সে-কথাটা। মাসি নিজে থেকেই বলেছিলো, 'তা হ'লে কি তোর ধড়ে আর মুণ্ডু থাকবে? কলঙ্কের শোধ নেবে না? অপমান কি ভুলেছে নাকি? মালতীর ইচ্ছে করতো সেই সাজাটা নিতে। ইচ্ছো করতো কোনো এক নির্জন দুপুরে, যখন সর্বানন্দবাবু কোর্টে গেছেন, চাকররা বিশ্রামে গেছে, শৈবলিনী ঘুমুচ্ছেন একটু, সেই সময়ে একবার গিয়ে দাঁড়াতে, যেখানে বড়ো সখ ক'রে নতুন খাটে নতুন শয্যা রচনা ক'রে রেখেছিলেন ওঁরা ছেলের বৌয়ের জন্য। যে ঘরের মস্ত জানালা দিয়ে মস্ত আকাশে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকতো তাঁদের পাগল ছেলে। আর কখনো কোনো নির্দিষ্ট পায়ের আওয়াজ পেলেই চকিত হ'য়ে ফিরে তাকাতো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে, কখনো উঠে আসতো কাছে, হাত বাড়াতো আর বিদ্যুতের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো মালতী।

সেই মানুষটাই তো। ঠিক তেমনি ভঙ্গিতেই তো ব'সে আছে চুপচাপ বইয়ের পাতায় চোখ রেখে। তবে চিনতে পারলো না কেন তাকে?

তাইতো ভালো। কেউ যে কারো স্মৃতির দরজা আগলে ব'সে নেই সেইটাইতো বাঁচোয়া। অন্তত আজকের এই মুহূর্তে তো নিশ্চয়ই। কবেকার সব পুরোনো দিনের কথা, সে-সব ভেবে কে কতকাল ব'সে থাকবে? প্রত্যেকেরই কাজ আছে কর্ম আছে, আলাদা আলাদা ক্ষেত্র আছে জীবন যাপনের।

কিন্তু তবু বুকের মধ্যে খচখচ করে মালতীর। কিসের কাঁটা? একটা কৈফিয়ৎ দেবার আছে তার এই ব্যক্তিটির কাছে, যে মানুষটা মেঘে মোছা আকাশের মতো ধোয়া মোছা হৃদয় নিয়ে পরম নিষ্ঠুরের মতো সব কথা ভুলে গিয়ে আজ বসেছে এসে তার মুখোমুখি নিশ্চিন্ত হ'য়ে। দুঃখের দিনে যাকে সঙ্গী করতে এতোটুকু বিবেকে আটকালো না, আজ বুঝি সুখের দিনে আর দরকার হ'লো না তার? কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! দুটো হাতের ফাঁকে মাথাটা দু'বার ঘষলো মালতী।

'আপনার কি কোনো অসুখ করেছে?' ভদ্রলোকের মৃদুগম্ভীর আওয়াজে আর একবার উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

মালতী চমকে চোখ ফেরালো, মুহূর্তে কয়েক যেন কিছু না বুঝেই তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে তারপর আরক্ত হ'য়ে চোখ নামিয়ে বললো, 'না।'

'মনে হচ্ছে অত্যন্ত অস্থির বোধ করছেন।'

'মাথা ধরেছে একটু।' নিজের অসংলগ্ন ব্যবহারের কৈফিয়ৎ স্বরূপ এই মিথ্যেটুকু অস্ফুটে বলতেই হ'লো মালতীকে।

'মাথা ধরেছে? ও। আচ্ছা, এককাজ করলে হয় না?'

'ও কিছু না, সেরে যাবে।'

'আমার কাছে ওডিকলোন আছে, জল মিশিয়ে ব্যবহার করলে তো হয়।'

ফ্যাকাসে মুখে ম্লান হাসলো মালতী। পরের স্ত্রী ভেবে যে যত্ন, নিজের স্ত্রী জানলে কি তা ইনি করতেন?

'কিচ্ছু দরকার নেই।' বেড কভারটা মালতী আস্তে পায়ের উপর টেনে দিলো। আবার মুখ ফেরালো জানালায়, অন্ধকারে বাইরের দিকে। কিন্তু তার দরকার না থাকলেও ভদ্রলোকের বোধহয় ছিলো, এটাচিকেস খুলে ওডিকলোন বার ক'রে যতখানি জল ঢাললেন কুঁজো থেকে, তার আর্দ্ধেকখানি

গ্লাশে আর বাকী অর্দ্ধেক ফেলে বিছানা ভিজিয়ে, শিশিটাকে প্রায় উজার ক'রে কাছে নিয়ে এলেন, 'মুখে মাথায় ছিটিয়ে দিন ভালো লাগবে।'

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে না ছিটিয়েও ভালো লাগলো মালতীর। যত্ন করাটা তার পেশা। তাকে কেউ কখনো যত্ন করেনি। হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাতের সুগন্ধি জলটা তার ছিটোতেই হ'লো মুখে মাথায়। মৃদু হেসে বলতেই হ'লো, 'অনেক ধন্যবাদ।'

নিজের জায়গায় বসতে গিয়ে বিছানার ভেজা জায়গাটা গুটিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, মুখখোলা কুঁজোটাতে গ্লাশ চাপা দিতে দিতে বললেন, 'আমরা পুরুষেরা সত্যি বড়ো অকর্মণ্য।'

'ভিজে গেজে ? অতখানি ?'

'এক গ্লাস জল ভরতেই এই দশা।' স্মিতহাস্তে আর একখানা শুকনো চাদরের জন্য বোধ-হয় হোল্ডঅল্‌টাকে তোলপাড় করলেন তিনি।

মালতী একজন মেয়ে, তার উপরে নার্স। কত লোকের কত বিছানা সে পেতে দেয়, কত সেবা সে করে, আর আজকে এইটুকু পারবেনা ? এদিকে উঠে এলো দ্রুত পায়ে, অভ্যস্ত হাতে চাদরটা তুলে শুকোতে দিল জানালায় গেড়ো দিয়ে, তোয়ালে চাপা দিল তোষকের ভেজা অংশে, তারপর অন্য চাদর খুঁজে না পেয়ে নিজেরটাই তুলে এনে একটি নির্ভাঁজ লোভনীয় বিছানা পেতে দিল মুহূর্তে। হোল্ডঅলটা গুছিয়ে দিল, ফেলে রাখা কোটটা পর্যন্ত হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিতে ভুললো না।

ভদ্রলোক ছেলেমানুষের মতো খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু প্রতিবাদও করলেন, 'আহা, আপনার চাদরখানা দিলেন কেন ?'

'ওটা ধোপের। আমি ব্যবহার করিনি।'

'ব্যবহৃত হ'লেও আমার আপত্তি ছিলো না, সে-কথা নয়।'

'তবে আর আপত্তি কিসের ?'

'আপনি শোবেন না ?'

'আমার তো বেডকভারটাই রয়েছে '

'গায়ে দেবেন না ?'

আশ্বিনের রাত্রি, ট্রেনের শিরশিরে হাওয়ায় একটু শীত শীত করে বইকি। মালতী বললো, 'ও হবে খন।'

কোটের পকেট থেকে একটা চাবি বার ক'রে ছুঁড়ে দিলেন ভদ্রলোক, 'তার চেয়ে আপনি দয়া ক'রে আমার স্যুটকেসটা খুলুন, ওখানে ভাঁজ-টাজ করা সব অনেক কিছু আছে, আপনিও নিন, আমাকেও দিন।'

কিছু না ব'লে, চুপ ক'রে ছোট্ট চাবির রিংটা অনেকক্ষণ হাতের মুঠোয় নিয়ে ব'সে রইলো মলতী, তার সাতাশ বছরের বঞ্চিত ব্যথিত জীবন যেন হাহাকারে ভরে উঠলো সহসা, ট্রেনের এই নির্জন কামরার ক্ষণিক সংসার দহন করলো তাকে। একটু পরে সে উঠ্‌লো, খুললো স্যুটকেসটা, পাট করা চাদরও বার করলো দু'খানা কিন্তু তার সঙ্গে আরো একটা জিনিষ বেরিয়ে আসতে দেখেই আর হাত পা নড়লো না আর। ডালা খোলা স্যুটকেসটা তেমনি হাঁ ক'রে রইলো, চাবিটা তেমনি ঝুলে রইলো গর্তে, চাদর দু'খানা হাতে ধরে মালতী দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হ'য়ে। বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিলেন ভদ্রলোক, দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ রেখেই বললেন, 'পাচ্ছেন না বুঝি?'

'পেয়েছি।'

'তবে আর কী।' তাকালেন তিনি, 'আমি ভাবছিলাম অন্যের ফরমায়েশি জিনিষ ঢুকোতে গিয়ে নিজেরটাই হয়তো বাদ পড়ে গেছে।'

'ছবিটা কার? ও, এটাও ঢুকে গেছে বাক্‌সে? ভালো।' স্মিতহাস্যে মালতীর চোখের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে ফটোখানা তিনি নিজের চোখের তলায় রাখলেন। 'সরমা। আমার—'

'বুঝতে পেরেছি।' নিজের পদমর্যাদা ভুলে, বয়োসোচিত গাম্ভীর্য ভুলে, একদিন যে সে নিজেই এই লোকটির স্বামীত্ব সগর্বে পরিহার ক'রে চলে এসেছিলো সেই সবকথা ভুলে একটা দুরন্ত অধিকারের দাবিতে ক্ষুব্ধ গলায় বলে উঠলো, 'ঠিক এমনি ক'রে আমাকেও একদিন চিনতে তুমি।'

'আপনাকে?' ভদ্রলোকের দুইচোখে অপার বিস্ময়।

'হ্যাঁ, আমাকে। আমাকে। আমার নাম মালতী। মালতী সেন।'

ভুরু কুঁচকে মনের মধ্যে খুঁজলেন ভদ্রলোক তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'নামটি খুব সুন্দর। চিনতে পারলে সুখী হতুম।'

'আমি—আমি তো ভুলিনি,' থরথর করলো মলতীর গলা, মালতীর শরীর। ফোটোটা বাক্‌সে ভরে দিয়ে স্যুটকেশটা নিচু হ'য়ে বন্ধ করতে

করতে পিছন ফিরে ভদ্রলোক উদাসভঙ্গিতে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে 'আপনি বোধহয় আর কারো সঙ্গে আমাক ভুল করছেন।'

এবার মালতী থমকে গেল, কানটা আগুন হ'য়ে উঠলো, গোলাপী মুখে রক্তের ঘনতা জমাট বাঁধলো। মরে যেতে ইচ্ছে করলো তার। লাফিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো ট্রেণের জানলা দিয়ে। কাজ সেরে, হাত ঝেড়ে মালতীর হাত থেকে চাদর দু'খানা নিয়ে দু'বিছানায় বণ্টন ক'রে— ভদ্রলোক হাসলেন, 'তাতে অবিশ্যি অবাক হবার কিছু নেই, প্রথমত আমি মানুষটা দেখতে এতো বেশী সাধারণ যে বেশীর ভাগ লোকের চেহারাই ঠিক আমার মতো।' মালতীর পাতা নিভাঁজ বিছানায় আরাম ক'রে এলিয়ে বসলেন, আরাম ক'রে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ ক'রে ধোঁয়া উড়োলেন, 'তা এই ভুলের সূত্র ধরে আপনার সঙ্গে পরিচয়টা যদি আমার একটু ঘনিষ্টই হয়ে ওঠে মন্দ কী?

সে-কথায় কান না দিরে নিজের জায়গায় ফিরে আসতে আসতে মালতী অস্পষ্ট গলায় বললো, 'ক্ষমা করবেন। অত্যন্ত ভুল হয়ে গেছে আমার।'

'অনর্থক কুণ্ঠিত হচ্ছেন,' ভদ্রলোক যেন সত্যি ক্ষমার অবতার হ'লেন গলার ঢিলেঢালা সুরে, 'যে-কোন কারণেই হোক মুহূর্তের ভুলেও আপনি যে আমাকে আপনার একজন কাছের মানুষ বলে ভেবেছেন আমি নিজেকে তাইতেই অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছি।'

মালতী জবাব দিলো না।

'মাথা ধরা কমেছে একটু?' তবু আলাপ ছাড়লেন না ভদ্রলোক।

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লো মালতী।

'অত ঝুঁকে বসবেন না, যা বিচ্ছিরি কয়লার গুড়ো।'

মালতী জানালা থেকে মুখ ভেতরে আনলো।

'বরং চাদরটা চাপা দিন, ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ।' বলে নিজেই হাত বাড়িয়ে খুলে দিলেন চাদরটা।

মালতী একবারে নিঃশব্দ। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে কখন গাড়ী আসানসোল এসে একটু দাঁড়াবে, মালতীকে নেমে যাবার মতো একটুখানি সময় দেবে।

'কতদূর যাবেন?' আবার প্রশ্ন ভদ্রলোকের। মালতীকে এবার জবাব দিতেই হ'লো, 'দিল্লী।'

'আমি এলাহাবাদ। ওখানেই উনি, মানে যার ছবি দেখলেন, তিনি আছেন কিনা ?' নিজেই নিজের খবর দিলেন ভদ্রলোক, যেন এ খবরের জন্য মালতীর আর উৎকণ্ঠার শেষ ছিলো না।

মালতী দাঁতে দাঁত চাপলো।

'কিন্তু এককাপ চা না হ'লে তো আর চলছে না। বর্দ্ধমানটা যে কখন গেল। আসানসোলে এখন চা আর ডিনার দু'টোই একসঙ্গে নিতে হবে দেখছি।

শব্দ নেই মালতীর।

'তা এসে পড়েছি প্রায়, কী বলেন ?'

মালতী না শোনার ভান ক'রে তেমনি তাকিয়ে রইলো বাইরে, অন্ধকারের আড়ালে।

গাড়ি এসে স্টেশনে থামতেই সাত তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক এসে দরজা জুড়ে দাঁড়ালেন, 'এই ব্যেরা, চা। চা লেয়াও, দু' আদমিকা। হাঁ, আউর ডিনার ভি দু' আদমিকা।'

'একটু সরবেন ? এই, এই কুলি—' ত্রস্ত গলা মালতীর।

অবাক হ'য়ে ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়েই পিছন ফিরলেন, 'ওকি। কুলি ডাকছেন কেন ?'

'আমি নামবো।'

'নামবেন ?'

'হাঁ, আমার দরকার আছে এখানে।'

'আপনি তো দিল্লী যাচ্ছেন।'

'সে যখন যাবো তখন। ইধার আও, এই কুলি'

কুলি ঝুলে রইলো জানালা ধরে, ভদ্রলোক দরজা না ছাড়াতে সে ঢুকতে পারছিলো না। ভদ্রলোকের সহাস্য দৃষ্টিতে যেন কৌতুক বিচ্ছুরিত হ'লো, বিনীত হ'য়ে দুটি হাত যুক্ত ক'রে তিনি বুকে ঠেকালেন, 'আমার অপ্রিয় সঙ্গ বর্জনই যদি আপনার নেমে যাবার একমাত্র কারণ হ'য়ে থাকে তা হ'লে আদেশ করুন, আমিই নেমে যাচ্ছি।

'নিজেকে একটু বেশি সম্মান দিচ্ছেন' ধনুকের মতো বাঁকা ঠোঁটে এবার

হাসলো মালতী। এতক্ষণে নিজেকে ফিরে পেয়েছে সে, তার স্বভাবের সেই মরণান্ত জেদ আর অভিমান মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ঈষৎ রূঢ় গলায় বললো, 'আপনার কথা এখানে উঠছেই না, আপনাকে আমি খেয়ালও করিনি এতক্ষণে—'

'এটা কিন্তু আপনি ঠিক বললেন না' হাসিতে যেন বিগলিত হ'য়ে গেলেন ভদ্রলোক, 'আমার মতো একটা সামান্য মানুষকে এরচেয়ে আর কত বেশি খেয়াল করবেন? আমার নিজের স্ত্রী-ই—'

'স্ত্রীর কথা থাক। কারো ব্যক্তিগত কথা শোনবার সময় নেই আমার।'

'সেটাইতো ভদ্রতা। কিন্তু কথাটা কী হচ্ছে জানেন, এই ট্রেনে উঠে থেকে অনেকবার তাঁর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, তাই অসাবধানে কখন বেরিয়ে গেল।'

'দয়া ক'রে দরজাটা ছেড়ে দাঁড়াবেন?'

'নিশ্চয়ই। দরজা কি একলা আমার নাকি। এ দরজায় সব যাত্রীরই সমান অধিকার।'

'আপনাকে দেখে অন্তত তা মনে হচ্ছে না।'

'কী ক'রে হবে? আমার জন্য যে আপনি কষ্ট পাবেন সেটা তো আমি চাই না। যাবেন দিল্লী, নামবেন বর্ধমানে, কেন? আমি আছি বলেই তো?'

এদের রকম সকম দেখে 'ধুত্তোর' বলে কুলিটা এ জানালা ছেড়ে অন্য জানালায় গিয়ে ঝুলতে লাগলো। দরজা ঠেলে ভদ্রলোকের পিঠের কাছে দিয়ে চা আর খাবার নিয়ে কখন বেয়ারা দু'জনেও ঢুকলো। গাড়িরও জল খাওয়া শেষ ক'রে ছাড়বার সময় হলো। চঞ্চল হ'য়ে মালতী জিনিসপত্র নিয়ে এবার প্রায় গা ঘেঁষেই নেমে যেতে উদ্যত হ'লো। ভদ্রলোক দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালেন, চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলেন একটু তারপর আর কিছু না বলে সরে এলেন এদিকে। তবুও নামা হলো না মালতীর। গাড়ি ছেড়ে দিল। বাক্স বিছানা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো পুতুলের মতো।

চিনতে পেরেছে বৈকি শৈলেন। প্রথমটা অবিশ্যি ঠিক বুঝতে পারেনি

কিন্তু সেটা মাত্রই কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই মনের অবচেতন সমুদ্র তোলপাড় ক'রে ভেসে উঠেছে ছবি। কবে কোন বিস্মৃতির স্বপ্নলোকে একদিন সকলে মিলে ভুল ক'রে এই মুখখানার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলো সে কথা তার মনে নেই, কেমন ক'রে একটা নির্বোধ মন নিয়ে অন্ধ আবেগে এই মুখখানাকেই সে প্রাণতুল্য ভালবেসেছিলো সে কথাও তার মনে রাখবার কথা নয়, আর কবেই বা এই নিষ্ঠুর মেয়েটি পাগল বলে তাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিলো তাও মনের মধ্যে লেখা নেই কোথাও। সব ভুলে গেছে।. কিন্তু তবু এ কথা সে জানে, বহুবার শুনেছে, এই মুখশ্রী-মায়াতেই একদিন তার সমস্ত হৃদয় মন আচ্ছন্ন ছিলো। এর জন্যেই দিন আর রাত একদিন তার অসহ্যবেদনায় একাকার হ'য়ে গিয়েছিলো। একটা বুদ্ধিহীন জড়চেতনা নিয়ে সে কেঁদেছে, খুঁজেছে, মত্ত হাতির মতো ভেঙেচুরে তচনচ্ ক'রে দিয়েছে সব। বিচ্ছেদের তীব্র যন্ত্রণা অবিরত হুল ফুটিয়েছে মাথার মধ্যে, সেই সময়কার উন্মাদ অবস্থা তার মর্মান্তিক।

শেষে মা-ই একদিন কী ভেবে ডুবতে ডুবতে কুটোগাছা ধরার মতো একখানা ছবি দিলেন হাতে, বললেন, 'এই তো সে। বসে বসে ছাখ।'

কপালে চন্দন, গায়ে ফুলের গয়না, মাথার ঘনচুলের ঢেউয়ের উপরে ঈষৎ আঁচল তোলা এই মুখেরই নববধূরূপ।

সাপের মাথায় ধুলোপড়ার মতো তৎক্ষণাৎ শান্ত হ'য়ে গেলো সে, মা-র কথামতো অপলকে তাকিয়ে রইলো সেই ছবিখানার দিকে, তারপর সে পেলো। বুক ভরে পেলো। প্রাণ ভরে পেলো। বরং সেই সজীব মানুষটার চাইতে এই নির্জীব ছবিই তার কাছে বেশী হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে যেমন ক'রে রাত ভোর হ'য়ে আসে, যেমন ক'রে অন্ধকার কেটে কেটে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে, তার মনের নিবিড় তিমির হ'তেও তারপর একদিন সমস্ত অন্ধকার ধুয়ে মুছে তেমনি ক'রেই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো আলো। মৃত কাগজের মূর্তিটিই তাকে হাতে ধরে নিয়ে এলো জ্ঞানের জগতে। কিসে থেকে কী হয় কেউ জানে না, হৃদয় ফুলের মতো পাপড়ি মেললো ধীরে ধীরে। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য শিকড়ের মতো ছড়িয়ে গিয়ে ভালোবাসার আঘাতে আঘাতে এই ফটোর মানুষটিই একদিন ঘুম ভাঙলো তার।

কৌতূহল ছিল বৈ কি দেখবার। যার সম্বন্ধে এইসব কথা সে শুনেছে, নিজে ভেবেছে, যার নাম বাড়িতে একট রহস্যের মতো জড়িয়ে আছে সকলের মনে, একটা পরিবারের উন্নত মাথাকে যে মেয়ে তুড়ি মেরে মিশিয়ে দিয়েছে পথের ধুলোয়। তবু যাকে কেউ দোষ দেয় না, এই সেদিন পর্যন্তও যার ছবিখানা চোখে পড়লে ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত একটা নাম না জানা যন্ত্রণা অনুভব করেছে সে, নিজের মধ্যে তার বিষয়ে যদি কৌতূহল না থাকে তো থাকবে কিসে! প্রকিতিস্থ অবস্থায় রক্তে মাংসে জড়ানো এই মানুষটাকে তার সত্যি একবার দেখতে ভারি সাধ ছিলো, কিন্তু• সে সাধ যে এইভাবে এই উপায়ে আর এ রকম সময়ে পূর্ণ হবে সেটা ভেবে অবাক না হ'য়ে পারলো না, যখন সে মনস্থির করছে আর একটি মেয়ের উপর। যাচ্ছে তার সঙ্গেই দেখা করতে।

প্রেম না হোক, বিয়ে স্থির হবার পরে এই মেয়েটির কথা মনে মনে ভাবতে শৈলেনের ভালো লেগেছে বৈ কি। অপরিচিত নয়, কলেজ-জীবনের সহপাঠিনী ছিলো, তাছাড়া সরমার মা তার মা-র লতায় জড়ানো কুটুম্ব। অবিশ্যি সরমার সঙ্গে দেখা করা ছাড়াও এলাহাবাদে তার অন্য কাজ আছে, আর বাড়ির সকলের কাছে সে এই এলাহাবাদ আসার উপলক্ষ্যটাকে কাজের চেহারাতেই রেখেছে কিন্তু নিজের মনে তো জানে আসল উদ্দেশ্য তার এই সুযোগে একবার অন্য চোখে সরমাকে দেখা? আজকে মালতীকে দেখে বিধাতার পরিহাস ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না তার। সর্বজনকথিত দুধে আলতা-ডোবানো রং, কাজল ডোবানো চোখ, এই বয়সেও অমন ছিপছিপে বেতের মত নমনীয় শরীর পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মনটা দুলে উঠালো জোরে, অচেতন স্মৃতি মথিত হলো বুকের তলায়। অতীতের কোন জড়বুদ্ধি নির্বোধ যুবক যে এই রূপসাগরেই ডুব দিয়ে মরেছিলো সে বিষয়ে কেনে সন্দেহ রইলো না কোনো। কিন্তু রাগের মাথায়, জেদের বশে সেই সময়ে সেই যুবকটিকে ত্যাগ করতে পারলেও আজকের মেয়েটি যে এই ভদ্রলোককে দেখে দুর্বল হয়েছে এটা বুঝতে পেরে ঠোঁটের ভাঁজে ভাঁজে অদ্ভুত একটা হাসি ছাড়িয়ে দিল শৈলেন।

'বসুন।'

অনেক পরে বললো সে। তারপর পেয়ালাতে চা ঢেলে এগিয়ে দিলো।

'ধন্যবাদ। আমি চা খাবো না।' স্যুটকেশটা হাত থেকে প্রায় ফেলে দিয়ে, বিছানাটা গদির উপর ছুঁড়ে দিয়ে দরজা ঘেঁষে বসলো মালতী।

'তা কখনো হয়?' যেন কতকাল ধরে একসঙ্গে খেয়ে এসেছে ওরা, শৈলেনের কথার ভঙ্গি ঠিক সেই রকম, 'চা কি কেউ একা খেতে পারে? নাকি সেটা ভাল দেখায়।'

মালতী আকাশের তারা গুণলো।

'রুটিটায় মাখন লাগিয়ে দিন না দয়া ক'রে।'

জানালার বাইরে হাত বাড়িয়ে এবার বোধ হয় মালতী বাতাসের বেগ পরীক্ষা করলো।

'রাগ করলেন নাকি?'

রাগ! কী আস্পর্দ্ধা লোকটার। ওর ওপর আবার রাগ।

'চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।'

মালতীর হাবে-ভাবে মনে হ'লো না এই কামরায় আর কোন লোকের অস্তিত্ব এতটুকুও অনুভব করছে সে।

এর পরে আর একা একা কত কথা বলা যায়। আর একটু রাগ হ'তেই বা বাধা কী? শৈলেন চুপ করলো। এক চুমুকে চায়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করে শুয়ে পড়লো চাদর চাপা দিয়ে।

রাত বাড়তে লাগলো হু হু ক'রে, সময় দ্রুতবেগে মুহুর্মুহু গুঁড়িয়ে যেতে লাগলো ট্রেণের চাকার তলায়, অল্প রাত্তিরের ঘন অন্ধকার ভেদ ক'রে এক ফালি চাঁদ উঠ্‌লো আকাশে, লগ্ন বয়ে যেতে লাগলো, সেই তালে তালে এই নির্জন রাত্তিরের নির্জন কামরার মধ্যে নির্ঘুম দু'টি মানুষের বুকের স্পন্দনও বেড়ে উঠ্‌লো উত্তাল বেগে। তবু কেউ কারো কাছে ধরা দিল না, হার মানলো না। ঘুমের ভান ধ'রে পড়ে রইলো মুখ ঢেকে। শৈলেন মনে করলো আমার গরজ কিসের? নেহাৎ বিবাহিতা স্ত্রী, নেহাৎ আমি ভদ্রলোক, যতোই অপরাধ করুক, একটা কর্ত্তব্য আমার আছেই, তাই হাতে পায়ে ধরলে হয়তো বা ক্ষমা ক'রে ফেলতাম। তা যখন হ'লো না ভালোই হ'লো। কথা দিয়ে কথা ফেরাবার লজ্জা ভোগ করতে হ'লো না সরমার বাবার কাছে। মালতী ভাবলো যা গেছে তা যাক। লোভীর মতো, কাঙালের মতো আর আমি হাত পাততে পারবো না এই বয়সে। তা ছাড়া যে ভদ্রলোক নিজেকে

বিবাহিত জেনেও অন্য মেয়ের পানিগ্রহণ ক'রে সে কি একটা মানুষ? সরমা। আহা কি নাম। থাক সরমাকে নিয়েই থাক। সরমার স্বামীতে আমার কোন দরকার নেই।

রাত কেটে গেল। সুন্দর একটি ভোর কুয়াসায় গা মুড়ে এলাহাবাদ স্টেশনে এসে ধরা দিল। এলাহাবাদ! ধ্বক ক'রে উঠলো মালতীর বুকটা। এলাহাবাদ। বুকটা যেন বন্ধ হ'য়ে গেল শৈলেনের। যেন কিছুই নয় এমন আয়াসে শোয়া থেকে উঠে বসে স্টেশনটার দিকে মালতী তাকালো। জিনিষপত্র গুছিয়ে হ্যাঙ্গারে টাঙানো কোটটা হাতে নিয়ে সহজভাবে বিদায় নিল শৈলেন, 'তবে আসি?' গলাটা ভারি শোনালো, বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে। মালতী ঢোঁক গিললো, তাকাতে পারলো না মুখ তুলে। 'কিছু যদি অপরাধ করে থাকি আশা করি ভুলে যাবেন।'

মালতীর ঠোঁট কাঁপলো, চোখের পাতা কাঁপলো, দৃষ্টি নিবদ্ধ রইলো মাটিতে।

'আর এও আশা করি, বাকী রাস্তাটা আপনি এবার শান্তিতে যেতে পারবেন। আমার জন্য মিছিমিছি কষ্ট পেলেন।'

মালতী কি বোবা হ'য়ে গেছে? এই শেষ মুহূর্তটিতেও কি একটা কথা সে বলবে না? শৈলেন পা বাড়ালো উল্টোদিকের দরজায়। শিশির ভেজা ঘাসের মতো নরম কান্নায় ভেসে গেলো এবার সিস্টার মালতী সেনের গোলাপি গাল। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে উঠলো।

'কী হ'লো? কয়লার গুঁড়ো গেল নাকি চোখে?' বিদ্যুৎ বেগে শৈলেন পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মুখ নিচু করলো দেখতে। তারপর সহসা নিবিড় উত্তাপে কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'এ রকম করলে কি কেউ যেতে পারে?'

দারুণ ধুমধড়াক্কা ক'রে বাজি বন্দুক ফুটিয়ে নেহাৎ অল্প বয়সেই ছেলের বিয়ে দিলেন তালুকদার রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী। প্রথমটায় মণ্টু হাত-পা নেড়েছিলো আপত্তি জানিয়ে। চেঁচামেচি করেছিলো মায়ের কাছে এসে। তারপর বাবার দুই ধমকে ঠাণ্ডা হ'য়ে গোঁজমুখে বসে রইলো ঘরের কোণে। একবার মনে হ'লো বিষ খায়, একবার মনে হ'লো গভীর রাত্রে গলায় কলসী বেঁধে বাঁধানো পুকুরে ডুবে মরে, আরেকবার আফিংটাই মৃত্যুর সবচেয়ে সহজ পন্থা বলে ভাবলো। কিন্তু কোনোটাই কার্যকরী হ'লো না। কেবল সদ্য-পরিচিত সহপাঠিনী প্রণতি ঘটকের মুখখানাই মনে পড়তে লাগলো বারে বারে।

জন্ম থেকে ষোলো সতেরো বছর বয়েস পর্যন্ত এই গ্রামেই কেটেছে মণ্টুর, এখানেই সে বড়ো হয়েছে। নৌকো বেয়েছে, মাছ ধরেছে—দুর্গাপূজার সময় কুমোরদের সঙ্গে লেগে থেকেছে আঠার মতো, কাদের প্রতিমা কত সুন্দর খুনোখুনি করেছে তাই নিয়ে, বিসর্জনের সময় লাফিয়ে পড়েছে খালে, মোড়লি করেছে বন্ধুদের সঙ্গে, বুকডন বৈঠকে বুকের ছাতি চওড়া করেছে, তারপর ম্যাট্রিক পাশ ক'রে পড়তে গিয়েছে কলকাতা। সেই প্রথম। আর সেখানে গিয়েই বুঝতে পেরেছে নিজের বর্বরতা। প্রথম বছরটায় অবিশ্যি মন টেকেনি, দাঁড়িপাল্লার ওজনে, টানটা গাঁয়ের দিকেই ছিলো বেশী কিন্তু দ্বিতীয় বছরে পা দিয়েই পাখা গজালো। সহরের ফুরফুরে হাওয়া লাগলো গায়ে, সচেতন হ'য়ে নিজেকে সে আবিষ্কার করলো। আর আবিষ্কার করা মাত্রই জমে উঠলো জীবন, স্বপ্ন রঙিন হয়ে উঠলো, সরল গ্রাম্য বালক দেখতে দেখতে এক লাফে উঠে গেল স্মার্টনেসের মগডালে। ভাব হ'লো মেয়েদের সঙ্গে, গলার আওয়াজ নরম হ'লো, চোখের ভাবে ঘুম নামলো, ধুতি ছেড়ে প্যাণ্ট আর ব্যুশসার্টে শোভা পেল শরীর, দুম-দাম চলা বন্ধ হ'লো, আরো কতো কী যে হলো তার ঠিক নেই। আর এরি মধ্যে কিনা এই? বিয়ে? এইটুকু বয়সে? এর চেয়ে বাবা তাকে ফাঁসির হুকুম কেন দিলেন না? তা-ও যদি স্ত্রী নামক পদার্থটি পদে থাকতো। না জানে লেখাপড়া, না দেখেছে সহর, এই গ্রামেরই একটা নাক টিপলে দুধ গলে এঁচড়ে-পাকা মেয়ের সঙ্গে—ছিঃ! বন্ধুদের কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন করে? আর প্রণতিই কি ক্ষমা করবে তার এই

অপরাধ ? এতো বড়ো একটা আঘাতের পরে সে প্রাণ রাখবে কি না তাই তো সন্দেহ। লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে, দীর্ঘশ্বাসে বুক ভারি হ'য়ে উঠলো। শেষে টিকতে না পেরে এক সমবয়সী পিসতুতো ভাইয়ের কাছে চোখের জলে ভেসে গিয়ে বলে ফেললো সব মনের কথা। শুনে পিসতুতো ভাই গুম হ'য়ে থেকে হঠাৎ গর্জন ক'রে বললো, 'অন্যায়। অন্যায়। আমি বলবো হৃদয়ের উপর কারো হাত নেই, সেখানে এই অত্যাচার রীতিমতো অন্যায়। সে তোমার বাঘের মতো বাবাই হোন আর যেই হোন। যদি আমি হ'তাম—' একটা ঘুঁষি মারলো সে টেবিলের উপর, সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কার ফটাফট বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজ পাওয়া গেল আর মুহূর্তে পিসতুতো ভাই সিংহ-বিক্রম থেকে একেবারে ইঁদুরের গর্তে নেমে এলো, বিকট ভঙ্গিতে শরীরের আধখানা টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'মামা।' জানালার তাকে উদাসভাবে বসে থাকা মণ্টু এদিকে এসে গা-ঢাকা হ'য়ে বললে, 'ইস্। বাবা তো নয় বাব্‌বা।'

এইজন্যেই তো সে আজকাল আর ছুটিতে আসতে চায় না। এই সমস্ত লোকের সঙ্গে কখনো থাকা যায় ? জঘন্য। এ সব ডিক্টেটর-সীপের জায়গা যে আর নেই পৃথিবীতে এ কথাটা একদিন আচ্ছা ক'রে বুঝিয়ে দিতে হয় রাঘববাবুকে। পানা পুকুরের গন্ধ, বাঁশ ঝাড়ের মশার কামড়, যতো সব ইডিয়েট মার্কা মানুষদের সঙ্গে রাতদিন মেলামেশা, আর কতো হবে এর চেয়ে ? কখনো গিয়েছে কলকাতা সহরে ? থেকেছে গিয়ে ? খড়ম পায়ে, হেঁটো ধুতি পরেই তো জীবন গেলো। আর কেবল জবরদস্তি। বিশ্রি। বিশ্রি। অথচ এই ছুটির সময়ের জন্য মণ্টু কতো ভালো ভালো কথা ভেবে রেখেছিলো। ভেবেছিলো সে, অরুণ আর প্রণব তিন বন্ধুতে মিলে রোজ বিকেলে লেকের ধারে গিয়ে বসে থাকবে, মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবে, কখনো কখনো গড়ের মাঠে গিয়েও সন্ধ্যাবেলাটা ফুচকা খেয়ে কাটাতে পারে। তারপর সাহস ক'রে একদিন প্রণতিদের বাড়ি গিয়ে তাকেও বেড়াতে নিয়ে আসবে (একদিন কেন, ভাব হ'লে রোজই আসবে) লেকে এসে আইসক্রীম আর মসলা-মুড়ি, নয়তো আউটরাম ঘাটে গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে হাতে হাত রেখে।

হ'লো। সবই হ'লো। শুধু লিখেছিলো, 'দেশে গেলে পড়াশুনোর ক্ষতি হয়, তাই ভাবছি এবারটা এখানে হস্টেলে থেকে পড়াশুনোই করবো। সামনে পরীক্ষা।' অমনি বাবা চিঠির মধ্যে কানমলা মুড়ে পাঠিয়ে চোখ লাল ক'রে নিয়ে এলেন। মুখ গরম ক'রে বললেন, 'ইঃ, ছুটিতে আসবেন না বাবু। কী রে আমার পড়ুয়া। সহরের তুক লেগেছে বুঝি? আগেই বলেছিলাম সুবোধকে (শ্যালক) আরে বাবা গাঁয়ের ছেলে গাঁয়েই থাকুক, সবডিভিসনের কলেজ এখান থেকে এক পা, সেখানে পড়ুক। তা নয়, কলকাতা! তা-ও আবার বিশ্বেশ্বরীদের সঙ্গে। যততো সব।' আর তার পরেই বলে, 'তোর বিয়ে।'

কী গ্রাম্য। ছি ছি! কথাটা শুনে বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড়টা তেরচা ক'রে দাঁড়িয়েছিলো মণ্টু, বাবা অমনি চুলের ছাঁটটা দেখে যেন তপ্ত তেলে জলের মতো চিড়বিড়িয়ে ছিটকে উঠলেন, 'ছাখো, ছাখো, ঘাড় চাঁছা বাবুকে ছাখো তোমরা।' বলেই কালো নাপিতকে ডাকতে পাঠিয়ে দিলেন। কী যে ইচ্ছে করছিলো তখন। রাস্টিক। বুনো। নেহাৎই বাবা। তা' নৈলে —গায়েতো আর মণ্টুর কম জোর নেই? তাইতো প্রণতি বলে, 'আপনার স্বাস্থ্য দেখলে সত্যি হিংসে হয় মলয়বাবু।' কী মিষ্টি কথা। হিংসে বিষয়ে এ রকম মিষ্টি কথা বাবা কি শুনেছে কোনোদিন। মণ্টুও অবিশ্যি খুব চমৎকার জবাব দিয়েছিলো একটি, 'মলয় তো বাতাস, সে কি কখনো বাবু হয়? মলয়কে মলয় বলাই কি ভালো নয়?' তাই শুনে অসম্ভব সুন্দর ক'রে হেসেছিলো প্রণতি।

মণ্টু উন্মনা হ'য়ে গেল, উদাস হ'য়ে গেলো। জাগতিক সুখ দুঃখে আর যেন তার কোনো প্রয়োজন রইলো না। ঘুরে বেড়াতে লাগলো এখানে ওখানে। বনে-জঙ্গলে, ঝোপে-ঝাড়ে গাছের বাকলে লিখে রাখলো শুধু সেই নাম, সেই তিনটে অক্ষর। আর লিখলো, 'আমি তোমারি, তোমারি! জনমে মরণে শুধু তোমারি।' রাত্রিবেলাও ঘুম রইলো না তার। লজিকের খাতার পাতা ভ'রে কবিতা লিখলো। নাম দিলো 'যে নদী মরু পথে।' আর কবিতাটা হ'লো এই :

'হে আমার প্রেয়সী
হৃদয়ের পূর্ণশশী।

তোমার বিহনে মোর
কত রাত কত ভোর
চোখের অথৈ জলে
পাষাণ যে যায় গলে
জীবনের সব সুখ সাধ
এক বাক্যে হ'লো কুপোকাৎ'

শেষের এই সুখ সাধের সঙ্গে কুপোকাৎ মিলাতে ভীষণ খাটতে হ'লো তাকে। কত যে পায়চারি করতে হ'লো, কতোবার যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হ'লো, তার ইয়ত্তা নেই। তারপর নিজের যোগ্যতায়, মিল দেবার আশ্চর্য দক্ষতায় নিজেই স্তব্ধ হ'য়ে রইলো খানিকক্ষণের জন্য। মনটা হাল্কাও হ'লো অনেক।

এদিকে ঘনিয়ে এলো বিয়ের দিন। বিষাদভরা মন নিয়ে মণ্টু আরো বেশী থাকতে লাগলো বাড়ির বাইরে, খাওয়া কমিয়ে দিল, জীবনের প্রতি বীতরাগে সন্ন্যাসী হ'য়েই বেরিয়ে যাবে কিনা সে কথাও চিন্তা করতে লাগলো গুরুতরোভাবে। বিয়ের আগের দিন রাত্তিরে সারারাত ভেবে, সারারাত জেগে, শেষে একখানা প্রেমপত্রই লিখলো প্রণতিকে। চিঠির মধ্যে টপটপ্ কয়েক ফোটা চোখের জলও দিয়ে দিল। ভোর রাত্রে দধিমঙ্গল। রাত জেগে চিঠি লিখে ক্ষিদে পেয়েছিলো, অত মন খারপ সত্ত্বেও দই-চিড়েটা নেহাৎ মন্দ লাগলো না।

হ'য়ে গেল বিয়ে। বিয়ের রাত্রে মণ্টু ঘোঁমটার পুঁটুলিটির দিকে তাকাতেই পারলো না। বাসি বিয়ের দিন কালরাত্রি, দেখা হ'লো না বেঁচে গেল, ফুলশয্যার দিন ঘর নীরব হ'তেই বয়স্ক ভদ্রলোকের মতো গম্ভীরভাবে বললো, 'শোনো খুকি—'

খুকি স্থির।

'আমার কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

খুকি তবুও চুপ।

'দ্যাখো, এই যে আমাদের এই বিবাহ-বন্ধন, এটা নেহাৎই গুরুজনদের

একটা অবিমৃষ্যকারিতার কুফল। তাঁরা পুতুল খেলেছেন আমাদের জীবন নিয়ে—'

ঘোমটার আড়াল থেকে দুটি অপাপবিদ্ধ কাজল-কালো বালিকা চোখ এবার উঁকি মারলো।

'জানতো, এ জীবন পদ্মপত্রে জলের মতোন। (এখানে মণ্টুর প্রচণ্ড এক দীর্ঘশ্বাস) বেঁচে থেকেই বা কী লাভ, আর মরে গেলেই বা কী ক্ষতি? সুখ-দুঃখ আজ সব সমান। সব এক।'

ঘোমটা এবার নাকের ডগা থেকে চোখের পাতায় উঠলো।

'তাই বলছি, গুরুজনরা আমাকে হাজার বার বিয়ে দিলেও আমি তারই। তাকে আমি ভুলবো না। কোনোদিন ভুলবো না। আমার মনের তিমির আকাশ আলো ক'রে সে থাকবে চিরদিন ধ্রুবজ্যোতি হ'য়ে। আর তুমি, তুমি হবে আমার (এখানে কম্পিত কণ্ঠস্বর) এক বোন।'

'বোন!' ঘোমটা খসে দুই চোখের চকিততারায় বিদ্যুৎ খেলে গেল, 'এ মা! কী রে লোকটা। বর হ'য়ে বৌকে বলে বোন। দাঁড়াও বলে আসি রাঘব জ্যাঠাকে'—লজ্জা-টজ্জা নিমেষে উধাও। বেনারসীর আঁচল লুটিয়ে সে অমনি উঠে দাঁড়ালো।

একই গ্রামের মেয়ে, না চেনবার কথা নয় মণ্টুর। ঠাকুর-বাড়ির গোলাপী। ছেলেবেলায় দেখেছে দু'চারবার। তারপর দশ না পুরতেই হারেমে পুরেছেন অভিভাবকরা। তেরো বছরের দুরন্ত মেয়ে, গ্রামের খোলা জলবায়ুর গুণে ডাঁসা পেয়ারার মতো সতেজ। পাকার মতো সোনার চিরুণী দিয়ে, লাল ফিতে জড়িয়ে খোঁপা বেঁধেছে, সিঁদুর দিয়েছে সিঁথি কপাল লেপ্টে, আলতা-পরা পায়ে ঝুমঝুম তোড়া, ছুটলো সে দরজার দিকে। খপ্ ক'রে ধ'রে ফেল্‌লো মণ্টু, 'কোথায় যাও? ঠ্যাং ভেঙে দেবো।'

'ইঃ, ঠ্যাং অমনি ভাঙলেই হ'লো? আমার আর হাত নেই।'

'অসম্মান ক'রে কথা বলবে না। জান আমি তোমার গুরুজন?'

'জানি জানি, ওরকম গুরুজন আমার ঢের দেখা আছে। সেবার যাওনি আমাদের পাড়ায় আম চুরি করতে, ঠ্যাঙা খাওনি শীতলদাদুর কাছে?'

সব সম্মান ডকে উঠলো। তবু মণ্টু গাম্ভীর্য ছাড়লো না। বললো, 'আমি কলকাতার কলেজে পড়ি। আমার নাম মলয়কুমার। সেখানে

আমাকে সবাই চেনে। আর তুমি? লেখাপড়া জান? নাকি আমার সমানবয়সী?'

ঠাকুর-বাড়ির গোলাপী, শুধু গোলাপী রংয়ের জন্যই বিখ্যাত নয়, পাৎলা ছোটো জিবখানাও তার খুরের মতো ধারালো। বিয়ের আগে মা, কাকীমা, ঠাকুমার হাজারো নিষেধ উপদেশ সব ভুলে গিয়ে নব বিবাহিত স্বামীকে সে দাঁত দেখিয়ে ভেংচি কাটলো। মুখ নেড়ে বললো—'কলকাতায় থাক তো হয়েছে কী? লেখপড়া সকলেই করে, ভারি মাথা কিনেছো। আমিও গদাই পণ্ডিতের ইস্কুলের পাঠ শেষ করেছি। কেবল বিধবা হ'য়ে যাবো বলেই—ঠাকুমা বড়ো ইস্কুলে দেননি, নইলে দেখতাম। আর বয়স তোমার কত শুনি?'

'বাইশ। গম্ভীরমুখে মিথ্যে কথাটা বলে পা নাচাতে লাগলো মণ্টু।

'আমারও এই সতেরো পুন্যো আঠারো।' স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোটো হ'তে হয় এটা বোধহয় জানা ছিলো গোলাপীর, তা নৈলে কী আর পঁচিশ না বলে ছাড়তো?

মণ্টু বললো, 'মিথ্যুক।'

গোলাপী বললো, 'তুমি মিথ্যুক।'

মণ্টু বললো, 'প্রণতি বলে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে পড়ে, তুমি তার পায়েব যোগ্য নও।'

গোলাপী বললো, 'আমাদের দক্ষিণের বাড়ির পদা, চু-কাপাটি খেলায় ফার্স্ট হয় তুমিও তার পায়ের যোগ্য নও।'

'আমি প্রণতিকেই ভালোবাসি, বিয়ে না করলেও সেই আমার স্ত্রী।

'আমিও পদাকে ভালোবাসি।'

'চুপ করো।' প্রভুত্বের সুরে ধমকে উঠলো মণ্টু, 'নিজের বিয়ে করা স্বামীর মুখের কাছে বসে অন্য ছেলেকে ভালোবাসার গল্প বলো, ভয় নেই তোমার?'

'তোমার ভয় নেই? তুমিও তো সেই পাজী মেয়েটাকে ভালোবাসো।'

'স্বামীরা সব করতে পারে।'

'আহা রে, এই একটু আগে বললেন, 'তুমি আমার বোন' এখন আবার সুবিধে বুঝে স্বামী। কীরে আমার।'

'আমি তোমাকে ত্যাগ করবো।'

এ কথায় ঝগড়া ভুলে হাসি ফুটলো গোলাপীর মুখে, চকচকে চোখে বললো, 'করবে ?'

'হ্যাঁ।'

'লক্ষ্মীটি এখুনি করো না। আমার বড়ো মন কেমন করছে মা-বাবার জন্য। ঠাকুমার জন্য। আর জানো, আমার যে পুঁচকে ভাইটা সবে দু'টো দাঁত উঠেছে সামনে, সে আমি ছাড়া আর কারো কোলে থাকতে চায় না।'

একটু চুপ ক'রে থেকে মণ্টু বললো, 'ত্যাগ করার অর্থ জানো ?'

'কেন জানবো না ? রামহরি কাকার মেয়ে, সেই যে পুনিদি, তাকে তো ত্যাগ করেছে তার বর। কেমন মা-বাবার কাছে থাকে, কোনোদিন শ্বশুর-বাড়ি যেতে হয় না। লক্ষ্মীটি—' অনুনয়ে সনির্বন্ধ হ'লো গোলাপী। দেয়ালে প্রদীপের কম্পিত ছায়াটার দিকে তাকিয়ে মণ্টু কেমন চুপসে গেল। স্তিমিত গলায় বললো, 'আর তারপর আমি যদি আবার বিয়ে করি ?'

'কাকে ? সেই মেয়েটাকে ?'

'তাকে ছাড়া আর কাকে ?'

এইবার গোলাপী চোখ কুঁচকে নখ কামড়ে ভাবলো একটু, কিন্তু পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্য বিচ্ছেদটাই তাকে পীড়া 'দিচ্ছিলো' বেশী। সে কোনোদিন নাটক পড়েনি, নভেল পড়েনি, কেবল দায়ে পড়ে, রামায়ণ পড়ে শুনিয়েছে ঠাকুমাকে আর বৃহস্পতিবার উপাচার সাজিয়ে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়েছে প্রদীপের সামনে বসে দুলে দুলে। প্রেমের চাইতে মন তার স্নেহেরই কাঙাল বেশী। কাজেই মণ্টুর পুনর্বিবাহেও তার আপত্তি হ'লো না। ঘাড় নেড়ে বললো, 'তবে তাই করো।'

হঠাৎ মণ্টুর যে কেন মত পরিবর্তন হ'লো কে জানে, ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে উঠলো, 'না, তা হয় না!'

'কেন হয় না ?'

'নারায়ণ সাক্ষী ক'রে একবার যাকে পত্নীরূপে বরণ করেছি তাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না।'

গাল ফুলিয়ে গোলাপী ভ্রূকুটি করলো, 'তবে এতোক্ষণ আশা দিলে কেন ?'

'তোমার মন পরীক্ষা করছিলাম।'

'ছাই।' রাগ ক'রে বিছানায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো গোলাপী, 'কেবল বাজে কথা।'

'এই বাজে লোকটা এখন মরে গেলেই তুমি রক্ষে পাও না ?'

'মরা যেন চাট্টিখানি কথা।'

'ও, তা হ'লে মরছি না বলে ভারি দুঃখ তোমার ?'

'তুমি তো আর ঠাকুর নও যে ইচ্ছেমরণ হবে ? আমার দুঃখ হোক চাই না হোক যতোদিন বাঁচবার ততোদিন ঠিক বাঁচবেই তুমি।'

'তবে বাজী ধরবে ?'

'কিসের ?'

'আমি মরতে পারি কি পারি না ?'

জবাব দিতে সামান্য দ্বিধা করলো গোলাপী, তারপর ঘাড় হেলিয়ে বললো, 'হ্যাঁ-এ-এ।'

ঢোঁক গিললো মন্টু, 'পটাসিয়াম সাইনাইডের নাম শুনেছ ?

'সে আবার কী ?

'মাত্র এক সেকেণ্ড। তারপর সব শান্তি। আমি তাই খাবো'

'খেলে কী হবে ?

'তুমি মুক্তি পাবে। আমি মরে গিয়ে মুক্তি দেবো তোমাকে।' সিনেমার নায়কের মতো ভাব দিয়ে সে জানালায় এসে বেঁকে দাঁড়ালো, 'আর কোনো-দিন তবে তোমাকে থাকতে হবে না এ বাড়িতে, আর কোনোদিন আমাকে দেখতে হবে না।'

'বারে, আমি বুঝি তাই বললাম ?' গোলাপীর গলায় এবার ভয়।

'আমার জন্যই তো তোমার যত দুঃখ।'

'মোটেও না।'

'তা নৈলে পদাকে বিয়ে ক'রে কতো সুখী হতে পারতে।'

'ঘেন্না ঘেন্না।' গোলাপী তার খোঁপাভরা মাথাটা ঝাঁকড়ে উঠে বললো, 'পদাটা আবার একটা মানুষ! সে কি তোমার মতো কলকাতায় পড়ে!'

জানালায় দাঁড়িয়ে, মশার কামড় খেয়ে, লেবু ঝোপের আড়ালে গভীর অন্ধকারে জোনাকীর আলো দেখতে দেখতে মুখের খুশি লুকোলো মন্টু, 'তাহ'লে আমাকে ছেড়ে যেতে চাও কেন ?'

'তুমিই তো আমাকে ত্যাগ ক'রে সেই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাও।'

'কক্ষণো না।'

'নির্ঘাৎ।'

'আমার কি না খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই; নিজের বিয়ে-করা বৌ ফেলে তাকে বিয়ে করবো।'

'তাই তো তোমার ইচ্ছে।'

খাটের কাছে এগিয়ে এসে মণ্টু বললে, 'কেন ইচ্ছে হবে? সে কি তোমার মতো সুন্দরী?'

'আমি তো বিচ্ছিরি।' গোলাপীর মুখে অভিমানের গাঢ় ছায়া।

'সে কি তোমার মতো মিষ্টি?'

'মিষ্টি না হাতি।'

পরম বন্ধুতায় গলে নিয়ে উনিশ বছরের সদ্য যুবক এবার মুগ্ধ আবেগে নিজের হাতের মধ্যে গোলাপীর দু'খানা হাত তুলে নিয়ে নিবিড় হ'য়ে বললো, 'না কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি ভালোবাসতে পারি?'

তেরো বছরের সদ্য কিশোরী, লজ্জায় ভেঙে গিয়ে আরক্ত মুখে এবার কোলে মুখ লুকিয়ে অস্ফুটে বললো, 'ধ্যেৎ।'